চৈতন্যদেব

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

চৈতন্যদেব

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

আমার ভগবতী জননী কুন্তলা-দেবীর প্রতি—
তাঁর শরীর-শোষী সন্তানের
প্রণামান্ত নিবেদন

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অয়মারম্ভঃ

যা আমার প্রথম জীবন থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত ভাবা উচিত ছিল, তা এইরকম খণ্ডিতভাবে ভাবলাম বলে অশেষ দুঃখ পাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কী, আমি মাতৃগর্ভ থেকে হরিনাম শুনছি; হরিনাম আর ভাগবত-পাঠ শুনতে-শুনতেই আমার জাগতিক বিদ্যা-জীবন তৈরী হয়েছে। আমার পিতাঠাকুর এবং এখনও জীবিত আমার আশি-বছর-বয়সী মেজো দাদা অজিত কুমার-এর হাত ধরে এমন-এমন বিদ্বান দার্শনিক মহাপুরুষের সঙ্গ-লাভ করেছি আমি, যেটাকে অহো ভাগ্য বললে কম বলা হয়। ছোটবেলা থেকে 'দুই ভাগবত সঙ্গে' যেভাবে আমার সাক্ষাৎকার ঘটেছিল, তাতে চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে আমার লেখার কথা ছিল আরও অনেক বিস্তৃতভাবে। তিনি আমার ঘরের ঠাকুর বলেই নয়, আমার অনন্ত 'অবিদ্যা'র আধুনিক আলোকে চৈতন্যের মানস প্রকাশ করার অবশ্যম্ভাবী দায় আমারই ছিল। কিন্তু এটা বুঝি, ভাল করে বুঝি আমি—এখনও তিনি আমাকে কৃপা করেননি, এখনও আমার অনন্ত 'অন্যাভিলাষ' আছে, অনন্ত আবরণ আছে জ্ঞান এবং কর্মের, যশ-প্রতিষ্ঠার শূকরী-বিষ্ঠায় এখনও দিগ্ধ আমার মনোবুদ্ধি-চিত্ত। তাই এখনও কৃপা হয়নি মহাপ্রভুর, তিনি সম্পূর্ণ স্ফুরিত হননি আমার লেখনীতে তাঁর সম্পূর্ণতা নিয়ে—সাঙ্গোপাঙ্গ-সপার্ষদে।

তবু এরই মধ্যে এইটুকু যে লিখেছিলাম—সেটা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও সেটা মম্ভাবিত চৈতন্যের পূর্বাভাস-মাত্র। এই লেখা আমার প্রকাশ করার কোনও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমার এক মান্য বন্ধু—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক দীপক কুমার ঘোষ এমন সহৃদয়তায় এই লেখাটি একবার প্রকাশ করেছিলেন যে, আমার 'না' বলার উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে এমন এক বিচিত্রকর্মা পুরুষ যে, আরও হাজার কর্মন্যাসের মধ্যে প্রকাশনার এই করন্যাস সমাপতিত হতে পারেনি, ফলে নিজে বুঝেই তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুকে আরও বহুর কাছে পৌঁছে দেবার সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রকাশের নতুন আবরণ, নতুন প্রকার এবং নতুন আকার সৃষ্টি করে 'পত্রলেখা'-র কর্ণধার আমার স্ফুরিত-চৈতন্যের রূপ দিয়েছে অন্যতর। তাতে অনুজ বন্ধু কৃষ্ণেন্দু

চাকীর প্রচ্ছদ অলংকার হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের প্রুফ দেখেছে আমার ছাত্রকল্প বন্ধু সীমান্ত গুহঠাকুরতা, তার প্রতি ভালবাসা রইল। আমার ছাত্রীকল্পা অধ্যাপিকা তাপসী মুখার্জী অনুলিখনে সাহায্য করেছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল। আমার স্ত্রী, পুত্র পুত্রবধূ এবং নাতি সকলের অনুপ্রেরণা এই গ্রন্থ প্রকাশের পথে পাথেয় ছিল। যাঁদেরই নাম করলাম এখানে এবং যাঁদের নাম করলাম না, তাঁদের সবার ওপর আমার চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-করুণা বর্ষিত হোক। তিনি আমাকেও কৃপা করুন, যাতে অন্তকালের আগে তাঁকে আধুনিক ভাবনায় প্রকাশ করতে পারি।

২৫.০৮.২০১২

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

গৌরচন্দ্রিকা

মহাপ্রভুর জন্মলীলা পাঁচশো বছর পূর্তি হয়ে গেছে এবং সেই উপলক্ষ্যে উৎসব, পদযাত্রা, স্মৃতিসভা যথারীতি চলেওছে। আমরা জানি বঙ্গদেশের চৌহদ্দির মধ্যে ভগবান বলেই তাঁর প্রতিষ্ঠা বেশি। চৈতন্যপন্থীদের ভক্তিমিশ্রিত আদর্শে তাঁর রূপ—রাই-কানু একীভূত—'রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।' আজ চৈতন্যজন্মের পাঁচশো বছর পরে একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় বসে উৎসব-স্মৃতিসভার ধূপের ধোঁয়ায় সত্যি করে তাঁর চরণ ছোঁয়ার সময় পাই না, যেখানেই যাই, কেবলই সেই বহিরঙ্গ অনুভূতি, তাঁর বিচিত্র ধর্মজীবনের উপরিকাঠামো নিয়ে উচ্চগ্রাম প্রশস্তি, কিন্তু এসব কিছুর মধ্য থেকে আসল মানুষটিকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠা করার সময় কি এখনও আসেনি? তিনি যে কত বড়ো মানুষ ছিলেন তার প্রমাণ সামান্য জগাই-মাধাই, আর চাপাল-গোপাল উদ্ধার কাহিনিতে নয়, কিংবা নয় তাঁর ঐশীশক্তিতে, যাতে করে ঝারিখণ্ডের পথে তাঁর কৃষ্ণনামের ধ্বনিতে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল।' ভক্ত বৈষ্ণব সম্মেলনে এসব কথা শুনি, আবার এক প্রস্থ বৈদগ্ধ্যের প্রলেপ-মাখানো বাণী শুনতে পাই বুদ্ধিজীবীদের সভায়, যেখানে মহপ্রভুর গায়ে লাগে সাম্যবাদের ফুরফুরে হাওয়া। কেমন করে সমগ্র ভক্তসঙ্গে মিছিলে শামিল করে কাজিদলন করেছিলেন প্রভু, কেমন করেই বা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ডেকে এনেছিলেন তাঁর নামসংকীর্তনের ছত্রছায়াতলে।

এ সবকিছুই সত্যি, কিন্তু এই ছোটো ছোটো সত্যের তলায় চৈতন্যসত্তার আসল স্বরূপটি গেছে হারিয়ে, যা পাঁচশো বছরের নিকষে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল। চৈতন্যদেবের প্রধান পরিচয়—তিনি একটি বিশেষ ধর্মের প্রবক্তা এবং সেই ধর্মের সাহসের পরিচয় যেখানে দিতে হয়েছিল—সেখানে তিনি একা। মানুষ হিসেবে চৈতন্যদেব কত বড়ো কিংবা তাঁর ব্যক্তিত্ব কত অসামান্য—তা যদি খুঁজে বার করতেই হয়, তবে তা দেখতে হবে তাঁর ধর্মীয় মতবাদের মধ্যেই, কেননা প্রধানত তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ, তারপরে অন্যকিছু। মনে রাখা দরকার—অন্যান্য ধর্মীয় প্রবক্তাদের মতো বেদ-বেদান্তের অবলম্বন খোঁজার জন্য প্রথমেই তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেননি। এটি তার দুঃসাহস। চৈতন্যপন্থীরা যতই বলুন যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতই তাঁর কাছে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের মতো, কিন্তু এ কোনো অজুহাত নয়, আসল কথা

চৈতন্যদেব এমনই বড়ো মাপের পুরুষ, এমনই তাঁর ব্যক্তিত্ব যে, তিনি যা বিশ্বাস করেন না, তার ওপরে তিনি ভাষ্য লিখতে যাবেন কেন?

দুঃখের বিষয়, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য কেন, চৈতন্যদেব কিছুই লিখে যাননি। সারা জীবন ভাবে বিভোর, তিনি তাঁর অনুগামীদের দিয়ে গেছেন তাঁর চিরবিশ্বস্ত তত্ত্বপ্রচারের উত্তরাধিকার; কাজেই তাঁর একান্ত অনুগামীদের ধারণাতেই প্রভুকে খুঁজে পেতে হবে। চৈতন্যের সমকালীন তথ্য পরবর্তী সাহিত্যে এবং ইতিহাসে চৈতন্যদেবকে আমরা পাই এক উদার ধর্মের প্রবক্তা হিসেবে। তাঁর ধর্মমতের ওপর বেদ-বেদান্ত-পুরাণ কোন্‌টির প্রভাব বেশি, সেটা আমাদের বিচার্য বিষয় হলেও এ সত্য অনস্বীকার্য যে, চৈতন্যদেবের ধর্মমত একান্তভাবেই তাঁরই। তাঁর ধর্মীয় মতবাদের বিষয়গুলো অন্য জায়গা থেকে সংকলিত হলেও, সেগুলোকে আত্মসাৎ করে একটি নবরূপ দান করা—এটি চৈতন্যদেব না হলে হত না।

একথা বলতে অসুবিধা নেই যে, প্রাচীনকাল থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যত অস্তিবাদী ধর্মমত আমাদের দেশে চালু আছে, তাদের প্রত্যেকটিই বেদ এবং উপনিষদকে মেনে নিয়েছে মৌলিক ভিত্তিতে। এই ধর্মগুলোর প্রভাবে আমাদের দর্শন এবং ধর্মের মধ্যে প্রভেদ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। যুগে যুগে যখনই কোনো মহাত্মা পুরুষ নতুন কোনো ধর্মমত প্রচার করতে চেয়েছেন তখনই তিনি বলেছেন তাঁর ধর্ম বেদানুগ, অন্যথায় জনাসাধারণ—যাঁরা কোনোকালেই বেদবেদান্তের বেশি খবর রাখেন না—তাঁকে মেনে নিত না। ফলে বেদ-বেদান্তকে শিখণ্ডীর মতো ব্যবহার করা হয়েছে বার বার, প্রতিপক্ষের ভীষণ আক্রমণ রোধ করার জন্য। বেদ এবং উপনিষদের ব্যাখ্যা হয়েছে নব নবতর, শুধু তাই নয় কখনওবা বিকৃত। চরম ব্যাখ্যানের এমন একটা পদ্ধতি প্রত্যেকেই বেছে নিয়েছেন, যাতে আসলটি হারিয়ে গেছে। একথা যেমন শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বলা চলে, তেমনি চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধেও। যেরকম আমরা জানি উপনিষদের মধ্যেও নির্গুণ নির্বিশেষে ব্রহ্মের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে স্বগুণ সবিশেষ ব্রহ্মের কথাও। শঙ্করাচার্য নিজেও একথা স্বীকার করেছেন—সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ —এইসব কথা বলে। তা সত্ত্বেও কিন্তু প্রকৃতস্থলে যখন স্পষ্ট নির্দিষ্ট সবিশেষ ব্রহ্মের টীকা করবার সময় এসেছে, তখন হয় তিনি এড়িয়ে গেছেন, অথবা খুব সাবলীল হতে পারেননি তিনি। ঠিক এসব দুর্বল জায়গাগুলোতেই তাঁকে চেপে ধরেছেন প্রতিপক্ষ দার্শনিকেরা। অন্যদিকে একেবারে আধুনিক দৃষ্টান্তে আসি, আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারকগ্রন্থে (পৃ. ৫-১৫) শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত মহাশয় 'বেদে ব্রজকথা' বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। বেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সুরটি ধরবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন লেখক এবং লেখাটির মধ্যে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য

থাকলেও তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বেদের মধ্যে পরব্রহ্মস্বরূপ নরলীলা কৃষ্ণকে আবিষ্কার করা এখনও সম্ভব হবে কি? বৈদিক সাহিত্যের কিছু বিখ্যাত স্থানে কতগুলি গোরু চরতে দেখা গেছে বলেই এবং সেইসব গোরুর বেদে উল্লেখ আছে বলেই গোকুল-বৃন্দাবনের স্মরণ হওয়াটা অতি-ভাবালুতা মনে হয় আমার।

আমাদের মনে হয়—বেদ এবং উপনিষদের আক্ষরিক এবং নিজস্ব অর্থের একটি ধারা আছে নিশ্চয়ই, যা একান্তভাবে বেদের কিংবা উপনিষদের। কিন্তু টীকা-টীপ্পনির অন্তরালে সেগুলো হারিয়ে গেল, ক্ষুরধার পাণ্ডিত্যের সূক্ষ্ম প্রলেপে স্থান করে নিলেন শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য ইত্যাদি, যার শেষে আছেন বলদেব বিদ্যাভূষণ, যিনি ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করলেন চৈতন্য-ধারায়। আমি বলছি না যে, টীকা ভাষ্যের প্রয়োজন নেই, কিন্তু মূল অর্থসঙ্গতির প্রয়োজন বোধহয় তার থেকেও বেশি। শঙ্করাচার্য প্রভৃতি প্রত্যেকেই মহাপণ্ডিত, যাঁদের নিজস্ব দর্শনও পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অনর্থক কষ্টকল্পনা যেখানে, সেখানে বেদ-উপনিষদের সোজাসুজি অর্থটা ধরলে ক্ষতি কী?

চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ একজায়গায় বলেছেন—'বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক বেদ মুখে মানে', অর্থাৎ অনেক ধর্মতত্ত্বই নিজের সুবিধার জন্য বেদকে ব্যবহার করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অতি পণ্ডিত গ্রন্থকার, তিনি নিজেও যে এ তথ্যটি জানতেন, তাতে আমাদের সুবিধেই হল। তাত্ত্বিক দিক থেকে বেদ-বেদান্তের সঙ্গে কোনো ধর্মীয় মতবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কি না তা বোঝা যাবে সেই বিশেষ মতবাদের মৌলিক বিষয়গুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে।

জীবগোস্বামী—যাঁকে চৈতন্যদর্শন-শাখায় এক স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়—তিনি তাঁর তত্ত্বসন্দর্ভে প্রথমেই বেদকে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতিহাস (রামায়ণ-মহাভারত) এবং পুরাণগুলোকে তিনি বেদের সমমর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এমনকি তিনি এ কথাও বলেছেন যে, বেদের মতো ইতিহাস-পুরাণগুলোও পুরুষরচিত নয় অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। মহাভারতের কথা উদ্ধৃত করে জীব বললেন—ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বারা বেদের অর্থ পরিপূরণ করতে হবে। অর্থাৎ ইতিহাস-পুরাণই হল বেদোপনিষদের ভাষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের কথাও উদ্ধৃত করেছেন জীবগোস্বামী। এখানে নারদের জবানীতে বলা হয়েছে—আমি ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ এবং ইতিহাস-পুরাণ নামক পঞ্চম বেদও পড়েছি। এই প্রমাণবলে জীব বললেন, ইতিহাস-পুরাণ তা হলে বেদ বটেই।

জীবগোস্বামী যেসব যুক্তি দিয়েছেন, সম্প্রদায়গত কারণে তার প্রয়োজন ছিল হয়তো, কিন্তু এইসব যুক্তিতে ইতিহাস-পুরাণকে বেদের সমমর্যাদায় স্থাপন করা যাবে কি? প্রথমত বেদের পয়লা নম্বর দেবতা যাঁরা—সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র—এঁদের সঙ্গে

শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণবমতে সমান আসনে বসানো যাবে কি? চৈতন্য-দর্শনে এবং ধর্মে কৃষ্ণের তুলনা কৃষ্ণ নিজেই। সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি তাঁর আজ্ঞাবাহী কিঙ্করমাত্র। তা ছাড়া চৈতন্যদেবের মনোভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকে যে চেহারায় আমরা পাই বেদের মধ্যে তার কোনো আভাস পাই না। ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণের নাম করা হয়েছে বটে, কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক কৃষ্ণ। যাঁকে আমরা বাসুদেব কৃষ্ণ বলে জানি, পরবর্তীকালে তিনিই মহাভারতের সূত্রধার।

চৈতন্যদেবের মানসপটে কৃষ্ণের যে ছবি ছিল, তাতে শাস্ত্রবচনের পটভূমিতে মিশেছিল তাঁর আপন মনের মাধুরী। চৈতন্যধর্মের কৃষ্ণ নিজের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য নেমে এসেছেন জগতে, ভূ-ভার-হরণ ইত্যাদি তাঁর আনুষঙ্গিক কাজ। তিনি নন্দ-যশোদার স্নেহের বাঁধনে বাঁধা, গোপবালকের খেলার সাথী এবং তাঁর সব থেকে বড়ো পরিচয় তিনি গোপীচিত্তচোর। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপের সঙ্গে বৈদিক দেবতার কোনো ছবিই মেলে না। উপনিষদের ব্রহ্ম চৈতন্যমতাবলম্বীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিমাত্র। ("যদ্ অদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভাঃ—*চৈতন্যচরিতামৃত* ১.১.৩ "যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তাং"—জীবগোস্বামিকৃত তত্ত্বসন্দর্ভ) বিশেষ করে গীতার মধ্যে "ব্রহ্ম আমাতেই (কৃষ্ণে মধ্যে) প্রতিষ্ঠিত"—এইসব কথায় গীতার মহিমা উপনিষদের থেকেও গ্রাহ্য হয়েছে বেশি। কেউ কেউ বলেন বৈদিক বিষ্ণুই হলেন কৃষ্ণের আদিরূপ। সত্যি কথা বলতে কি, বিষ্ণুর ক্ষমতা, গুণাবলি এবং বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্মের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিল ছিল বোধহয় সবচেয়ে বেশি, কিন্তু তবু তো গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বৈদিক বিষ্ণু স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। বিষ্ণু সেখানে স্থিতিকর্তা মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি। তাঁর কাজ অসুর সংহার ইত্যাদি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করার সময় বিষ্ণু তাঁর শরীরে আশ্রয় নিয়েছিলেন পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য। (*চৈতন্যচরিতামৃত*, ১.৪.১৩) কাজেই দেখা যাচ্ছে, বৈদিক বিষ্ণু কিংবা অন্যান্য দেবতা, ঔপনিষদিক ব্রহ্ম—কেউ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ওপরে নন। স্বাভাবিক কারণেই বেদ-উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে পুরাণগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়ের মৌলিক পার্থক্য আছে। পুরাণগুলিকে সে অবস্থায় বেদের সমভূমিতে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। সময়ের হিসেব ধরলেও তা একেবারেই অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত গ্রন্থকে মূল গ্রন্থের পরিপূরক ভাষ্য হিসেবে মনে করা যায়, তাদের কি মূলের সমমর্যাদা দেওয়া যাবে? অথচ "ইতিহাস-পুরাণের দ্বারা বেদের অর্থ পরিপূরণ করবে"— মহাভারতের এই কথাটির ওপর ভরসা করে জীব গোস্বামী ইতিহাস-পুরাণকেই বেদ বলে মেনে নিলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা—নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা'র সমতুল্য কি অন্যকৃত পরিপূরক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলোকে দেওয়া যাবে?

তৃতীয়ত, আমরা জানি—বেদ ছাড়া আর যা কিছু মানুষের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তাকেই পঞ্চম বেদ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে আমাদের দেশে। যেমন নাট্যশাস্ত্র (নাটকং পঞ্চমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্—ভরতকৃত *নাট্যশাস্ত্র* ১.১৫) আয়ুর্বেদ ইত্যাদি। তার মানে এই নয় যে, নাট্যশাস্ত্রকে আমরা বদে বলে মনে করব, যেমন আমরা পুরাণগুলিকে তা মনে করব না। বেদ-উপনিষদের পরবর্তী যুগে ইতিহাস-পুরাণের জনপ্রিয়তা বোধহয় তাদের দার্শনিক মূলাধার বেদ-উপনিষদকেও অতিক্রম করেছিল। ইতিহাস-পুরাণের মর্যাদা সেইটুকুই, কিন্তু তবুও এগুলো বেদ-উপনিষদ নয়।

চতুর্থত, যেসব যুক্তিতে প্রাচীনপন্থীরা বেদকে অপৌরুষেয় বলেছেন (সায়নাচার্যের ঋগ্‌ভাষ্যোপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য) সেইসব যুক্তিতে কখনোই ইতিহাস-পুরাণকে বেদ বলে মানা যায় না। বিশেষ করে পুরাণগুলোর মধ্যে অনেক জায়গায়ই পুরাণকর্তাদের নাম আছে। বেদের মন্ত্রের ক্ষেত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে পাওয়া যাবে, কিন্তু মন্ত্রকর্তা পাওয়া যাবে না।

পরিশেষে বলি, ইতিহাস-পুরাণকে বেদ বলে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না জীব গোস্বামীর। পুরাণগুলোকে প্রায় বেদের মর্যাদা দেওয়ার রেওয়াজ আরম্ভ হয়েছে যামুনাচার্য, রামানুজের সময় থেকেই। রামানুজের লেখার মধ্যে ভূরিভূরি পাওয়া যাবে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ। পরবর্তীকালে জীব গোস্বামী সম্পূর্ণ বৈদিক মর্যাদায় স্থাপন করেছেন ভাগবত পুরাণকে, কারণ ভাগবতের মধ্যে চৈতন্যপ্রবর্তিত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। চৈতন্যদেব বুঝেছিলেন—পুরাণগুলোকে দিয়েই লীলাময় এবং মধুর রসের রসিক কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। চৈতন্যদেবের যেহেতু কোনো 'প্রিটেনশন' ছিল না, তাই সনাতন শিক্ষায় তাঁর নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী দিয়েছেন সোজাসুজি—"সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন" (*চৈতন্যচরিতামৃত* ২.২৪.২৫৬)। কৃষ্ণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পুরাণগুলি যত সুবিধেজনকই হোক না কেন, কোনো মতের প্রামাণিকতা স্থাপনের জন্য উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তি না হলে কোনো ধর্মেরই চলেনি—তাই বৈষ্ণবমতাবলম্বী পণ্ডিতেরাও চেষ্টা করেছেন সেই মর্মে এবং এইখানেই বোঝা যাবে বেদ-বেদান্তের সঙ্গে চৈতন্যধর্মের আত্মিক যোগাযোগ কতটা।

কৃষ্ণতত্ত্বের কথা, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যাই হোক না কেন দার্শনিক দিক থেকে তার একটা প্রতিষ্ঠা চাই—যা খুব ভালোভাবে ধরা হয়েছে ভাগবতের একটি শ্লোক (১.২.১১) তত্ত্ববিদেরা তত্ত্ব বলেন তাকেই যা দ্বিতীয় জ্ঞানের সূচনা করে না অর্থাৎ যেটি অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বলেন তাকেই ঔপনিষদিকেরা বলেছেন ব্রহ্ম, যোগমার্গের উপাসকেররা বলেন পরমাত্মা, ভক্তেরা বলেন ভগবান", (১.২.১১ শ্লোকে শ্রীধরস্বামীর

টীকা দ্রষ্টব্য) ভাগবতের মূল শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় একই তত্ত্বকে তিনটি পৃথক নামে ডাকা হয়েছে মাত্র। শ্লোকটি উল্লেখ করার কারণ হল—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—এঁরা একই তত্ত্বে পর্য্যবসিত হলেও শ্লোকটির মূল এবং সাধারণ অর্থের অপেক্ষা করেননি বৈষ্ণব দার্শনিকেরা, (ব্যাকরণে যাঁদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে তাঁরা এই শ্লোকে তিনবার পৃথকভাবে 'ইতি' অব্যয়টির ব্যবহার খেয়াল করবেন) যার ফলশ্রুতি হিসেবে স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দনাথ মহাশয়ের লেখায় পাই—"এই শ্লোকে ইহাও জানা গেল—নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং জীবান্তর্যামী পরমাত্মা জিজ্ঞাস্য তত্ত্ব নহেন। কেননা নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং জীবান্তর্যামী পরমাত্মা চরম এবং পরম তত্ত্ব নহেন।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেক আলোচনা এবং প্রবন্ধে 'ব্রহ্ম' শব্দটির ব্যাপারে একটা অহেতুক আতঙ্ক প্রকট হয়ে ওঠে। এই শব্দটির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্যের নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁদের মন জুড়ে বসে। কিন্তু উপনিষদের নিজস্ব দর্শন আর শঙ্করাচার্যের দর্শন তো এক নয়। ভাগবতের শ্লোকটির মধ্যে কোথাও কি এঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়েছে? শুধু বলা হয়েছে একে ব্রহ্ম বলে ডাকা হয়, ব্রহ্মেতি...শব্দ্যতে। সে ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলে ব্যাখ্যা করা এবং উপনিষদের পরম তত্ত্বকে 'জিজ্ঞাস্য তত্ত্ব' নহেন' এমন কথা বলা সঙ্গত নয়। আসল কথা ভাগবত পুরাণের মধ্যেও ব্রহ্মতত্ত্বের যতখানি সঙ্গতি ছিল চৈতন্যপররর্তীযুগে তার থেকে দূরে সরে এসেছেন বৈষ্ণব দার্শনিকেরা; অথচ উপনিষদের ব্রহ্ম থেকেই ভগবৎ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা এবং এই ভগবৎতত্ত্ব থেকেই কৃষ্ণের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা। এবিষয়ে তাঁদের আনুক্রমিক পদ্ধতিটি এইরকম—

প্রথমেই শঙ্করের নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মকে ধূলিসাৎ করে, তাঁকে সবিশেষ, নির্মল—গুণযুক্ত, অশেষ শক্তিমান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ব্যাপারে উপনিষদের সেই শ্লোকগুলোই বেছে নেওয়া হয় প্রমাণ বলে, যেগুলো ব্রহ্মের রূপ, গুণ, শক্তি ইত্যাদির কথা বলেছে।

জীবগোস্বামী তাঁর ভগবৎসন্দর্ভের প্রথমেই ব্রহ্মকে ভগবান বলা যায় কিনা সেইটে চেষ্টা করেছেন। এই বিচারে উপনিষদের সাহায্য পাওয়া মুশকিল তাই প্রমাণগুলো প্রধানতঃ এসেছে পুরাণ থেকে। বাস্তবিকপক্ষে পুরাণের মধ্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানকে সমপর্যায়ে নিয়ে আশা হয়েছে। এখানেই ব্রহ্মের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, শক্তিমত্তা শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছে ভগবানে। ভগবান বলতে আমরা একটা ব্যৈক্তিক রূপ (personalised form) বুঝি যাঁর অসীম শক্তি, অনন্ত লীলা এবং বিচিত্র মহিমা। কিন্তু ভগবানকে ব্রহ্মের সঙ্গে এক করে ফেলার ব্যাপারটা উপনিষদ-পরবর্তী গ্রন্থগুলোতে, বিশেষতঃ পুরাণগুলোতে যে রকম আছে তেমনটি

কোথাও নেই, যদিও অহির্বুধ্ন্যসংহিতা ইত্যাদি পঞ্চরাত্র-সাহিত্যও আর একটি বড় উপাদান।

উপনিষদের মধ্যে যেসব জায়গায় ব্রহ্মাকে পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ইত্যাদি বলা হয়েছে সেইসব জায়গাগুলোর ব্যৈক্তিক রূপ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সুবিধে দিয়েছে বেশী। কোন কোন বৈষ্ণব মহাজনেরা আবার ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব, শক্তিবিকাশ বৈচিত্র্য, রসবৈচিত্র্য—এসব বিষয়ে উপনিষদের যত প্রমাণ আছে তার সব কিছুরই পর্য্যবসান করেরছেন লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে। এতে আপত্তিরও কিছু আছে বলে মনে হয় না। কেননা ব্রহ্মের সবিশেষ, সগুণ, সশক্তিক রূপটির সঙ্গে ভগবানের ব্যৈক্তিক রূপের খুব একটা পার্থক্য নেই, যেমন পার্থক্য নেই কৃষ্ণের সঙ্গেও। কিন্তু অদ্ভুত লাগে তখনই, যখন দেখি উপনিষদের যে সমস্ত ব্রহ্মসম্বন্ধী শ্লোকগুলি দিয়ে কৃষ্ণের মর্যাদা প্রতিস্থাপিত করা হল সেই ব্রহ্মই কৃষ্ণের অঙ্গকান্তিতে পরিণত হলেন। এ যেন ডাল বেয়ে গাছের মগডালে উঠে ডাল কাটতে কাটতে নামা। বিশেষ করে ভাগবতের যে শ্লোকটিতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানের সমত্ব দেখানো হয়েছে সেখানে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা—এই দুটি তত্ত্বের লঘুত্ব দেখানো মূল শ্লোকের অর্থহানি করে। জীব গোস্বামী তাঁর দার্শনিক নিপুণতা দিয়ে ভগবৎসন্দর্ভে ব্রহ্মাকে ভগবান বলা যায় কি না সেই নিয়ে নিপুণ বিচার করার পর কৃষ্ণসন্দর্ভে এসে বললেন—যিনি ভগবান তিনি যে কৃষ্ণ হয়েছেন তা নয়। যদি ভগবান কৃষ্ণ হয়েছেন এমন বলা হয়, তবে কৃষ্ণের অবতারী মূলস্বরূপ প্রমাণ করার জন্য অন্য ভগবান কল্পনা করতে হয়, কিন্তু তা হতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একটি নিরপেক্ষতত্ত্ব; কাজেই ভগবানের তত্ত্ব থেকেই কৃষ্ণের তত্ত্ব প্রতিপাদন করা যেতে পারে না, বরং কৃষ্ণের থেকেই ভগবানের তত্ত্ব প্রতিপাদন করা যেতে পারে—কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্মঃ সাধ্যতে, ন তু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম্। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এর প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—

যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাঁহাতেই সত্তা।

জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কিংবা আজকের ড. রাধাগোবিন্দ নাথ যা করেছেন বা যতটুকু করেছেন তার পদ্ধতিটি কিছু নতুন নয়, তবে নতুন এইটুকু যে কৃষ্ণের সার্বিক প্রতিষ্ঠার পর দার্শনিক পরম তত্ত্ব হিসেবে ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মা, এমনকি ভগবানও তাঁর পূর্বস্বীকৃত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছেন। অপ্রিয় সত্য হলেও বলতে হয়—বেদ-বেদান্তের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিপাদিত ভগবৎ-তত্ত্বের কোনো মৌলিক যোগ নেই, যোগ যতটুকু আছে তা পুরাণের সঙ্গে। যেমন বিষ্ণুপুরাণে অব্যক্ত, অজড়, অচিন্ত্য, অব্যয়, অনির্দেশ্য, ব্রহ্মের কথা (যা নাকি শুনতে অনেকটা

অদ্বৈতবাদী শঙ্করের ব্রহ্মের মতো) বলতে বলতে হঠাৎ বলা হল—এই ব্রহ্মই হলেন 'তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদ্‌ম' অর্থাৎ একটা ব্যক্তিক (Personalised) রূপের স্পষ্ট আভাস পেয়ে গেলাম আমরা। ঠিক তারপরই বিষ্ণুপুরাণ বললেন—এই কথাগুলো 'ভগবান' শব্দের দ্বারাই বোঝানো সম্ভব অর্থাৎ অব্যক্ত অজড়, ব্রহ্ম এবং 'তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'—এগুলো ভগবৎ শব্দবাচ্য। তারপর বললেন, এটিই হল পরমাত্মার স্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান—এদের সমভূমিতে নিয়ে আসা হলেও ভগবানের গুরুত্ব বেশি থাকল, কেননা 'ভগবান' এই মহাশব্দটি পরমব্রহ্মভূত বাসুদেবের ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য, অন্যত্র কোথাও নয় (বিষ্ণুপুরাণ ৫. ৬. ৬৭-৭৬)। তা ছাড়া স্বয়ং ব্রহ্ম কৃষ্ণের রূপ ধারণ করেছেন—'ইচ্ছা গৃহীতো ভিমতোরুদেহঃ' কিংবা সোজাসুজি 'কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম পরাকৃতিঃ' এসব কথা প্রাচীন বিষ্ণুপুরাণেই আছে, ভাগবতের কথা তো ছেড়েই দিলাম—কারণ সেখানে কৃষ্ণই প্রথম এবং শেষ কথা। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—এগুলো ভাগবতের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে মাত্র।'

কৃষ্ণের মতো চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের আরেকটি মূল বিষয় হল ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ভক্তি কথাটি যথেষ্ট পুরোনো। পাণিনির সূত্রে কিংবা পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'ভক্তি' শব্দ পাই বটে এবং বাসুদেবভক্তের প্রসঙ্গটিও সেখানে অনিবার্য কারণে এসেছে বটে, কিন্তু তবুও সেই ভক্তির সঙ্গে চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের আকাশ-পাতাল তফাত আছে। উপনিষদগুলির মধ্যে ভক্তির কথা পাই একমাত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ৬.১৮ শ্লোকে এবং তাও রুদ্রশিব এবং গুরুভক্তির প্রসঙ্গে। চৈতন্যদেব যে শ্রদ্ধাভক্তির পুনরুজ্জীবন করেছেন, গীতা এবং পুরাণগুলির মাধ্যমে বহুপূর্বেই তা শুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছেছিল। তার আগে এটি অশুদ্ধ ছিল তা নয়, তবে জ্ঞান, যোগ, কর্ম এগুলোর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল।

চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পূর্বযুগ পর্যন্ত ভক্তিকে ব্যবহার করা হত মুক্তির সাধক হিসেবে। এমনকি গীতা, যে গীতাকে আমরা ভক্তিধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর বলে মনে করি—তার মধ্যেও অনেক জায়গাতেই মনে হয় ভক্তি যেন মুক্তির অন্যতম সাধন (১৪-২৬)। আর এই মুক্তির সঙ্গেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সম্পর্ক কিছু তিক্তরসাশ্রিত। মুক্তি ছাড়াও ভক্তিকে যে বিভিন্ন বৈষয়িক প্রয়োজনেও ব্যবহার করা হত তার প্রমাণ আমরা ভাগবত পুরাণেই পাই। স্বার্থসিদ্ধি, যশ, শক্তি অথবা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি—এইসব নানা কারণে ভক্তির সহায়তা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ভক্তির নাম সগুণাভক্তি, অর্থাৎ এটি শুদ্ধা ভক্তি নয়। ভক্তি নিজে ভগবানের স্বরূপাশক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে সব সময়েই শুদ্ধা বা গুণাতীত, তবু যে একে সগুণা বলা হচ্ছে তার কারণ জীবজগতের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইত্যাদি মায়িক গুণের সংস্পর্শে ভক্তির এই

আপাত রূপান্তর। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—যে মুক্তির জন্য উপনিষদের ঋষিরা বহু তপস্যা করেছেন, সেই মুক্তির জন্য ভক্তিকে যদি ব্যবহার করা হয় তবে তাও কিন্তু জীব গোস্বামীর মতে সগুণা ভক্তি। খুব বেশি হলে সেটি সত্ত্বগুণজাত। কাজেই ভক্তি শব্দটি প্রাচীন হলেও চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের সঙ্গে ঔপনিষদিক ভক্তিধর্মের মৌলিক পার্থক্য আছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগের অব্যবহিত পূর্বযুগে রামানুজ প্রভৃতি অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও মুক্তির সাধক হিসাবেই ভক্তিকে বেছে নিয়েছে। রামানুজ তাঁর শ্রীভাষ্যে ব্রহ্মবিজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হলেই মোক্ষ হতে পারে—এ ব্যাপারে শঙ্করাচার্যের সঙ্গে একমত হয়েছেন, কিন্তু কীভাবে সেটা হতে পারে, অর্থাৎ সাধনের ব্যাপারে তিনি বলেছেন উপাসনার কথা, যে উপাসনা অবশ্য ভক্তি বা 'ধ্রুবানুস্মৃতির' একটি নামান্তর মাত্র (উপাসনা-পর্যায়ত্বাৎ ভক্তিশব্দস্য)। আমাদের মনে হয় মুক্তিকে এই সম্প্রদায়গুলো তবুও কিছু যোগসূত্র রাখার চেষ্টা করেছে, যেমন মধ্বাচার্যের কথাও বলা যায়। মধ্বাচার্যের দর্শনের সঙ্গে চৈতন্যদর্শনের মিল আছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু তিনিও অনেক জায়গাতেই ভক্তিকে ব্যবহার করেছেন মুক্তির জন্য, তা ছাড়া মুক্তিকে পরম পুরুষার্থ হিসেবেও বেছে নিয়েছেন মধ্বাচার্য।

মুক্তি পরম পুরুষার্থ—একথা চৈতন্যপন্থীরা কখনোই বলবেন না, অথচ উপনিষদের প্রতিপাদ্য ছিল তাই। অন্যদিকে মুক্তিকামীর ভক্তি সগুণা—একথা আবার উপনিষদ বলবে না, কেননা গুণাতীত অবস্থা না হলে ব্রহ্মজ্ঞানও হতে পারে না, মুক্তিও হতে পারে না, অন্তত উপনিষদ কিংবা বেদান্তের অভিমত তাই, সে-অবস্থায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বেদ-বেদাঙ্গের যোগ কতটুকু?

একথা অনস্বীকার্য, মুক্তির ওপরে চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের একটা অসাধারণ বিরক্তি আছে। এ যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে লক্ষ করা যায়, তেমনি লক্ষ করা যায় আধুনিক অনেক বৈষ্ণবের মুখে মুখে। আমি অনেক বৈষ্ণবকে (যে বৈষ্ণবদের বেদ বেদান্ত, উপনিষদ, এমনকি নিজস্ব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থগুলোও ভালো অধিগত নয়) শুধুমাত্র গুরুমুখোদ্‌গীর্ণবাণী সহায় করে বলতে শুনেছি—"ও তো ব্রহ্মবাদী, মুক্তিকামী" কিংবা "ব্রহ্মবাদীরা এমন কথা বলে"—যেন ধর্মতত্ত্বে ব্রহ্মবাদীর মতো অকুলীন, বোকা আর কোথাও নেই। তবে একথা সত্য, মুক্ত কিংবা পরিষ্কার করে বলাই ভালো যে, ব্রহ্মের ব্যাপারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের যে এই অদ্ভুত অসহযোগ দেখা যায়, তার মূল কিন্তু চৈতন্যযুগেই নয়, এর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে পুরাণগুলির যোগাযোগই প্রধান, বেদবেদান্তের ওপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকদের শ্রদ্ধা অনেকটাই পরম্পরাগত দার্শনিক প্রয়োজনে আচরিত।

আমরা জানি গীতার মধ্যে কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি—এই তিন ধারার ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে। কর্মের মধ্যে সকাম কর্ম বাসনার পরিপূর্তি করে বলে দার্শনিকদের মন স্পর্শ করে না; আর নিষ্কাম কর্মের অবসান যেহেতু জ্ঞানে (*গীতা* ৪.৩৩), তাই সাধন হিসাবে আমাদের পথ দুটি —জ্ঞান এবং ভক্তি। সাধারণ মতে জ্ঞানের ফল ব্রহ্মদর্শন, মুক্তি, ভক্তির ফল ভগবানের সেবা লাভ করা। গীতার মধ্যে জ্ঞান এবং ভক্তি—এই শব্দ দুটি অনেক জায়গায় এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে সেখানে এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি গীতাকারের অভিপ্রেত তা বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে। অবশ্য বোঝানোর জন্য যুক্তিনিষ্ঠ টীকাকারেরা আছেন, তাঁরা যেমন বোঝান মনের সঙ্গে মিলে গেলে আমরাও তেমনি বুঝি, একটি পক্ষ নিয়ে নিই।

বাস্তবিকপক্ষে গীতার মধ্যে ভক্তির ওপর দুর্বলতা কিছু বেশি আছে একথা অনস্বীকার্য। কেননা গীতা বললেন "বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর জ্ঞানবান ব্যক্তি আত্মাকে (কৃষ্ণকে) আশ্রয় করে (৭.১১)—এক কথায় জ্ঞানমার্গের খানিকটা প্রমাণিত হয় বইকি। ঠিক তারপরেই 'এমন মহাত্মা দুর্লভ, যিনি মনে করেন ভগবান বাসুদেবই সব' গীতার এই শ্লোকে কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্য সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া এমন শ্লোকও রয়েছে যাতে করে বোঝা যায়—ভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে ভক্তি অনেক বেশি সুবিধেজনক এবং সর্বজনীনতাও অনেক বেশি। ভক্তির ওপর গীতাকারের একটা সূক্ষ্ম পক্ষপাত যে আছেই, সেকথা অন্য প্রসঙ্গেও আমাদের বলতে হবে, এখন এটুকু বললেই যথেষ্ট যে গীতার ভক্তিমূলক সাধনই পরিণতি লাভ করেছে পুরাণে।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, পুরাণগুলির মধ্যে ভক্তির মাহাত্ম্য যতই পল্লবিত হোক না কেন, উপনিষদ-বেদান্তের মৌলিক প্রতিপাদ্য জ্ঞানমার্গ কিন্তু ভক্তির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে এখানে। আসল কথা উপনিষদ-বেদান্তের বস্তু বলেই হোক অথবা তৎকালীন সমাজের শিরোমণি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের দ্বারা অভ্যস্ত বলেই হোক—জ্ঞানমার্গের অসারতা সোজাসুজি প্রতিপাদন করা সম্ভব হয়নি পুরাণগুলির মধ্যে। বিশেষ করে প্রাচীন পুরাণগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বোধ হয় বিষ্ণুপুরাণ। এই পুরাণের মধ্যেও বাসুদেব-স্মরণ কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর স্মরণ, মনন ইত্যাদি ভক্তির মাহাত্ম্য যেমন কীর্তন করা হয়েছে, তেমনি একই সময়ে পরমবস্তুকে পাবার জন্য জ্ঞানের মহিমাও খ্যাপন করা হয়েছে বারবার। (দ্র. ২, ৬, ৩৯, ৪০, ২, ৬, ৪৫-৪৬) ২, ১২, ৪৩, ৬, ৫, ৮৭)

আমাদের মনে হয়, এইসব সময় জ্ঞান এবং ভক্তির কোনো পরিষ্কার বিভেদরেখা ছিল না, যেমনটি ছিল না ব্রহ্ম এবং ভগবানের মধ্যেও। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, হরি, বাসুদেব—এঁরা একই তত্ত্ব হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন ততদিন এবং এইসব নাম যেহেতু ব্রহ্মের মূর্ত স্বরূপ বলে মনে করা হত, ভক্তি আর জ্ঞানের মধ্যেও তাই

বিরোধ ছিল না কোনো। প্রকৃতপক্ষে জনপ্রিয়তার প্রথম অবস্থায় ভক্তিকে জ্ঞানের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হয়েছিল, কেননা তখন পর্যন্ত জ্ঞানের আভিজাত্য ছিল অটুট। কিন্তু বেদ বেদান্ত এবং পরোক্ষভাবে জ্ঞানও যেহেতু অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ভক্তির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। সমাজের সুবৃহৎ অংশ, যার মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন না, তাঁরা ধর্মীয় দিক দিয়ে সমাজে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন এই ভক্তিধর্মের মধ্য দিয়ে, কেননা জ্ঞানমার্গ ছিল তাঁদের কাছে অনেক দূরের জিনিস, প্রায় ধারণার অতীত।

পুরাণকারেরা ভক্তির জনপ্রিয়তা লক্ষ করে অতি মহিমান্বিত করেছেন ভক্তির পথ, তবুও প্রথমেই জ্ঞানের পথকে সোজাসুজি নস্যাৎ করেননি তাঁরা। কেননা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাহলে ধর্মীয় আঙ্গিকের মধ্যে ভক্তির অনুপ্রবেশ ঘটতে দিত না। ঠিক এই কারণেই পুরাণকারেরা জ্ঞান ও ভক্তির যুগপৎ প্রশংসা শুরু করলেন। এমনকি ভাগবতপুরাণ, যেটিকে চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের বেদ বলা হয় এবং যার মধ্যে ভক্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট পক্ষপাত দেখা যায়, সেটিও সাধনের প্রথম পর্যায়ে গীতার মতো কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রৈবিধ্য বিধান করেছে (১১.২.৬)। তাছাড়া চিরায়ত জ্ঞানযোগের পথে ভক্তি যে একটি নতুন প্রকল্পও একথা স্বীকার করেছেন ভাগবতই। উদ্ধব সেখানে ভগবানকে বলেছেন, "আমি বহু পুরাতন জ্ঞানমার্গের কথা শুনেছি, এখন আপনি মহাত্মাদের জিজ্ঞাস্য ভক্তিযোগের কথা বলুন।" অন্যত্র এই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুরাণটির মধ্যে জ্ঞানযোগের সঙ্গে সইয়ে সইয়ে সুকৌশলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ভক্তিযোগকে, যেমন—জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ (১১.১৯.৫), আরেক জায়গায় পরমপ্রাপ্তি হিসেবে জ্ঞান ও ভক্তির বৈকল্পিক প্রাধান্য দেখতে পাই—জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্‌ভক্তিং বা যদৃচ্ছায়া (১১.২০.১১)।

ভাগবতের মধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজের চক্ষু ধৌত করবার জন্য জ্ঞানের কথা যত নিপুণভাবেই বলা হোক না কেন, ঐতিহাসিক বিচারে তার কিছু মূল্য থাকলেও সেটা ভাগবতের মর্মার্থ নয়, কেননা ভাগবতকার প্রধানত জ্ঞানের অসারতার কথা বারবার বলেছেন, আরও বলেছেন ভক্তিমার্গের সুবিধের কথা। কর্ম, তপস্যা, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম এগুলোর যা ফল, ভক্তি তা সবই দিতে পারে। তাছাড়া জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি, যা নাকি এককালে সাধনের অন্যতম উপায় ছিল, তা ভগবানকে তুষ্ট করতে পারে না, আর তুষ্ট না হলে (ভাগবতের মতে) বৃথা পরিশ্রমে ধান ভেঙে চালের বদলে তুষ পাওয়ার মতো শুধু পরিশ্রমই সার (৭.৯.৯)। জ্ঞান বৈরাগ্য ভাগবত পুরাণে শেষপর্যন্ত ভক্তিরই by product হিসেবে পরিগণিত হয়েছে; জ্ঞান সম্পর্কে নির্ভর করতে হয়েছে ভক্তির ওপর। জ্ঞানের ফল হিসেবে মুক্তির অবস্থাও হয়েছে উঠে করুণ। ভাগবতের

সবচেয়ে প্রাচীন টীকাকার শ্রীধরস্বামী তো ভাগবতের প্রারম্ভিক শ্লোকগুলির মধ্যে বলে দিলেন যে, ভাগবতে এমন একটি ধর্মের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে মুক্তির কোনও 'অভিসন্ধান' নেই। রূপ গোস্বামী, যিনি চৈতন্যদেবের কথা জানতেন বলে ধরা হয়, তিনি তো মুক্তির নামকরণ করলেন 'পিশাচী'। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরও একধাপ এগিয়ে বললেন—অজ্ঞানই হচ্ছে অন্ধকার, একে এককথায় বলে 'কৈতব'। সাধকের সাধনপথে যত 'কৈতব' আছে "তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান"। জানি না এর পরেও বলা যায় কি না—বেদ-উপনিষদের সঙ্গে চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের কোনো সংযোগ আছে।

আমাদের বক্তব্য হল চৈতন্যদেবের ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে বেদ-বেদান্তের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেই তবে সেটা ধর্ম হবে, না হলে সেটা ধর্ম হবে না—এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। চৈতন্যের এই বিরাট ধর্মান্দোলনের মধ্যে যেখানে 'পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান'—সেই নির্বিচার ভালোবাসা, যা নাকি 'স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সবারে ডুবায়', সেখানে প্রথাগত সংরক্ষণশীলতা এবং নবদ্বীপের তৎকালীন বেদান্ত-ন্যায়াধ্যুষিত পরিমণ্ডল—ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, পড়ুয়া—এঁরা মহাপ্রভুর সংগৃহীত এই 'হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন'কে গ্রহণ করতে পারছিলেন না ভালো মনে। অথচ চৈতন্যের কারণেই বঙ্গদেশে ধর্মের যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল, তা চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল সাধারণ মানুষের সমাগ্রহে, কিন্তু তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য এবং বিদ্যাভিজাত্যের প্রতিস্রোতে।

কী ভীষণ এবং কঠিন ছিল এই প্রতিপক্ষতা, যা নৈয়ায়িক-কুলের চেয়েও বেশি অদ্বৈত বেদান্তীদের কাছ থেকে এসেছিল। সেই প্রতিপক্ষতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য মহাপ্রভুর একমাত্র উপজীব্য ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সর্বসাধারণ বঞ্চিত মানুষের জন্য তাঁর ভাবনা। একজন 'কালচারাল স্পেশালিস্ট' বা 'কালাচারাল মিডিয়েটর'-এর যে দায়িত্ব থাকে—সেই 'গ্রেট্ ট্র্যাডিশন এবং 'লিট্‌ল ট্র্যাডিশন'-কে মিলিয়ে দেওয়া—চৈতন্যদেবের দায়িত্ব ছিল তার চেয়েও বেশি। দার্শনিক জগতে তিনি যেমন বুদ্ধিমানের সাধন জ্ঞানমার্গকে ভক্তিমার্গের অধীনে টেনে এনেছিলেন, তেমনই ধর্মসাধনের ক্ষেত্রেও পরম জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্মের পরিবর্তে অখিলরসামৃতমূর্তি কৃষ্ণের আরাধ্যতা প্রতিষ্ঠা করে ধর্মকে এমন একটা 'ডোমিস্টিসিটি'-র মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, যাতে সাধারণ মানুষ তার নিত্যকর্মের মধ্যে ভগবানকে নিয়ে আসতে পেরেছে। ভগবানের সর্বত্রতার ভূমিকাটা তাতে গৌণ হয়ে নিত্যদিন ভালোবাসার জায়গায় এসে পৌঁছেছে। চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য এইখানেই। তাঁর জয় হোক—জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

১

যে পারে সে ওমনি পারে, কিন্তু সবাই পারে না। বৃহৎ ব্যক্তিত্ব এবং সেই ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য এমনই এক বস্তু যে, তিনি একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় ধারার মধ্যে থেকেও নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারেন। না, আমি মহামতি চৈতন্যের কথা বলছিই না। চৈতন্যের আর্বিভাব ঘটেছে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি। তাঁর জন্মের অন্তত দেড়শো-দুশো বছর আগে থেকে এমনই একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন তৈরি হয়েছিল—যেখানে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেও এক-একজন ব্যক্তি তাঁর বৈধ সম্প্রদায়ের আবরণ ভঙ্গ করে আপন চিদাকাশটুকু উপহার দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়।

আমি তখন সদ্য এম এ পাশ করে নবদ্বীপের বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াতে ঢুকেছি। কিছুদিনের মধ্যে কলেজে একটি বিদ্বৎসভা আয়োজন করার ভার পড়ল আমার ওপর। প্রস্তাবিত হল—তৎকালীন দিনের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যকে কলেজে নিয়ে আসতে হবে বক্তৃতা দেবার জন্যে। বিষ্ণুবাবু প্রথিতযশা মানুষ, অলংকার এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে ধুরন্ধর পণ্ডিত। আমি যেহেতু দীর্ঘদিন বিষ্ণুবাবুর ছাত্র ছিলাম এবং কলেজেও যেহেতু সদ্য-অধ্যাপক, অতএব তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা থেকে আরম্ভ করে তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ঠিক করা এবং নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে কলকাতা থেকে নবদ্বীপ কলেজে নিয়ে আসার সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপর চেপে গেল। কাজটার মধ্যে আমার নিরানন্দ ছিল না, কেননা বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে যে এক ঘণ্টা বসবে, সে যদি সাময়িকভাবে সহনশীল হয় এবং তাঁর প্রাথমিক ধাতানিটুকু মেনে নিতে পারে, তাহলে ওই এক ঘণ্টার মধ্যেই সে অনেক কিছু নতুন শিখবে।

মনে আছে, তখন গরমের দিন। আমি এবং বিষ্ণুবাবু পাশাপাশি সালার-প্যাসেঞ্জারে বসে নবদ্বীপ রওনা হয়েছি। বিষ্ণুবাবু পড়া ছাড়া বসে থাকতে পারতেন না। তিনি কী একটা পড়ছেন এবং আমার সঙ্গে অবান্তর কথা বলার জন্য এতটুকু ভ্রূকুটিও নষ্ট করছেন না। আমি তখন চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী ভক্তি-আন্দোলনের ধারা নিয়ে গবেষণা-টবেষণা করার চেষ্টা করছি। ভাবলুম—একটু জিজ্ঞাসা করি

এবং একই সঙ্গে তাঁর তিরস্কার হজম করার জন্য প্রস্তুত হলাম। তাঁর গ্রন্থের ওপর চেতন নিবিষ্টতা ভেদ করে জিজ্ঞাসা করলাম—স্যর। আমি তো চৈতন্যদেব, তথা তাঁর পূর্ববর্তী ভক্তি-আন্দোলনের ধারা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছি অনেকদিন, কিন্তু চৈতন্য যেমন সরস ভক্তির কথা বলেন, যার মধ্যে অনুরাগের সম্বন্ধটাই বেশি, তেমনটা কি তাঁর পূর্বেও কিছু ছিল? আরও পরিষ্কার করে বলি—যেমন ধরুন, রূপ গোস্বামী যেমন তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে ভক্তিকে রস হিসেবে গ্রহণ করে তার গভীর বিচার করেছেন, তেমনটি কি প্রাচীন আলংকারিকরাও ভেবেছিলেন একটুও? প্রশ্নটা করে আমি চুপ করে রইলাম।

প্রথমত, বিষ্ণুবাবু তাকালেনই না, ভ্রূক্ষেপও করলেন না। পূর্বতন অভিজ্ঞতায় বুঝলাম— এবার আমায় সইতে হবে, তাঁর প্রাথমিক ক্ষণভগ্ন শব্দতেজ সইতে হবে এবার। কেননা তিনি চুপ করে আছেন মানেই তিনি সব শুনছেন এবং ভিতরে ভিতরে তাঁর উত্তর তৈরি হয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে ছাত্রের মূর্খতা প্রমাণের অধিক্ষেপটুকুও। প্রথমে ঠান্ডা মাথায় কথঞ্চিৎ অপাঙ্গ-কুঞ্চিৎ চক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে বিষ্ণুবাবু বললেন—মম্মট ভট্টের কাব্যপ্রকাশ পড়েছ? আমি বললুম—হ্যাঁ স্যর! সে তো এম এ ক্লাসেই ছিল, আর আপনিই তো পড়িয়েছিলেন। শেষ কথাটায় তিনি হঠাৎই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং আমি জানি, কারণ না থাকলেও এই ক্রোধ হবারই ছিল। বললেন—পড়েছ তো মোটে দুটি উল্লাস। ব্যস্! কাব্যপ্রকাশ পড়া হয়ে গেল। আমি তো-তো করছি দেখে আরও রেগে গিয়ে ঈষৎ সানুনাসিক স্বরে বললেন—তা হ্যাঁ, হে কলেজে পড়াচ্ছ। তোমার ঘটেও ইউনিভার্সিটির সিলেবাস, ছাত্রের ঘটেও ইউনিভার্সিটির সিলেবাস, তা কেমন পড়ানো হবে? কাব্যপ্রকাশ-এ দশটা উল্লাস (অধ্যায়) আছে, এখনও পর্যন্ত উল্টেপাল্টে দেখার সময় পাওনি, আবার বুদ্ধি ফলিয়ে প্রশ্ন করছ?

আমি জানতুম—এই প্রাথমিক কটূক্তি-প্রবাহের পর তিনি প্রসন্ন হবেন, কিন্তু প্রশ্নের মীমাংসা করবেন সেই কটূক্তির আভাস বজায় রেখেই। বিষ্ণুবাবু বললেন—কাব্যপ্রকাশ-এর দশম উল্লাসে জনৈক শিবভক্তের খেদোক্তি আছে। ভগবান শিব তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তি পেয়ে ভগবান শিবের সঙ্গে একাত্মতা লাভের আশঙ্কায় সে কষ্ট পাচ্ছে। অদ্বৈতবাদী 'সো'হম্' অর্থাৎ 'আমিই সেই ব্রহ্ম'—এই উপাসনার মাধ্যমে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন, জীবাত্মা-পরমাত্মা একাকার হয়ে যায়। দ্বৈতবাদী এমন মুক্তি পছন্দ করে না। সে ভগবানের সেবাসুখ

পেতে চায়। কিন্তু সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের মুক্তি-মোক্ষ নিয়ে এত হই-চই, বিশেষত শঙ্করাচার্য আসার পর থেকে মুক্তির প্রাধান্যবাদ এমন চরমে উঠেছিল যে ভক্তি-ভালোবাসায় ভগবানকে লাভ করার ব্যাপারটা একেবারে গৌণ স্থানে গিয়ে পৌঁছল।

নবদ্বীপগামী সালার প্যাসেঞ্জার তখন নৈহাটি-ব্যাণ্ডেল হয়ে বাঁশবেড়িয়া ত্রিবেণী অতিক্রম করছে। তখনকার কালে নবদ্বীপের ট্রেনে দারুণ মিষ্টি পাওয়া যেত। একজন চেনা মিষ্টিওয়ালা আমাকে নিয়মিত মিষ্টি খাওয়ায়। আজকে আমাকে এক প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত দেখেও সে তার প্রাত্যহিক অভ্যাস ত্যাগ করল না এবং বারংবার শব্দনাদেও আমাকে অব্যাকুল দেখে সে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বণিকোচিত দন্তবিকাশ করে বলল—মিষ্টি খাবেন না, স্যার! কাঁচাগোল্লা, রসকদম! আমি এতদ্বারা প্ররোচিত হয়ে বিষ্ণুবাবু এবং মিষ্টিওয়ালা—উভয়কেই তৃপ্ত করায় জন্য বিষ্ণুবাবুকে বললাম—মিষ্টি খাবেন, স্যার? গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বিষ্ণুবাবু পূর্বের চেয়েও অধিক সানুনাসিকতায় আমাকে বললেন—তুমি খাও! হ্যাঁ তুমি খাও। কাব্যপ্রকাশ-এর দুই উল্লাস পড়ে তুমি এখন মিষ্টিওয়ালাদের 'স্যার' হয়েছ, তুমি খাও। আমি সঙ্গে সঙ্গে—এমনভাবে যেন মিষ্টিওয়ালাদের কোনোদিন দেখিইনি এইভাবে বললাম—এই যাও, যাও, দেখছ স্যারের সঙ্গে একটু কথা বলছি। হ্যাঁ স্যার! আপনি বলছিলেন —দ্বৈতবাদীরা নির্বাণ-মুক্তি পছন্দ করেন না।

বিষ্ণুবাবু প্রীতাপ্রীত-চক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—পড়াশুনো করো হে! এই তো সময় সবকিছু পড়ে নেবার। সপ্তদ্বীপা বসুমতী, তার রহস্য জানতে গেলে পড়তে হবে। তোমাকে দ্বৈতবাদীর কথা বলছিলুম অলংকার গ্রন্থের উদাহরণ থেকে। এই যে মিষ্টিওয়ালা মিষ্টি নিয়ে এসেছিল, কেন এসেছিল? তুমি মিষ্টির রসাস্বাদন করবে বলে। তা এখন ভাবো—তুমি যদি নিজেই মিষ্টি হয়ে যাও, তবে মিষ্টির স্বাদ বুঝবে কী করে! দ্বৈতবাদী আর অদ্বৈতবাদীর এই তফাত। অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মসাযুজ্যের মাধ্যমে নিজেই ব্রহ্মভূত হয়ে যায়, আর দ্বৈতবাদী পরব্রহ্মের রসকল্প আস্বাদন করতে চায়। কথাটা রামপ্রসাদ খুব সহজে বলেছিলেন—মাগো! নির্বাণে কী আছে ফল/জলেতে মিশায় জল/চিনি হওয়া ভালো নয় মন চিনি খেতে ভালোবাসি। এবার বাড়ি গিয়ে কাব্যপ্রকাশ-এর দশম উল্লাস খুলে দেখো; সব কিছুই মুখে মুখে হয় না। একটু পড়ো, কষ্ট করো, সপ্তদ্বীপা সেতিহাসা বসুমতী।

বুঝলাম—বিষ্ণুবাবুকে দিয়ে আর কথা বলানো যাবে না। নবদ্বীপের বিদ্বৎসভা সেরে বাড়ি ফিরলাম পরের দিন। ঘাঁটতে আরম্ভ করলাম কাব্যপ্রকাশ-এর দশম উল্লাস। পেয়ে গেলাম বিষ্ণুবাবুর উচ্চারিত উদাহরণ শ্লোক। বিষ্ণুবাবু বলেছিলেন—প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে মম্মটচার্য ভক্তিকে নয়-নয়টা রসের মধ্যে স্থান দেননি, কিন্তু এই শ্লোক দেখলে বোঝা যায় ঈশ্বরের জন্য দ্বৈতবাদীর ভক্তি-ভালোবাসা কাকে বলে! শ্লোক পড়ে মন জুড়িয়ে গেল। শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাবে বোঝা যাচ্ছে—এক শিবভক্তের প্রতি করুণা করে ভগবান শিব তাঁকে সর্বজনকাম্য মোক্ষ-বর দিয়ে দিয়েছেন। সে শিবভক্ত ছিল, এবার সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে শিবত্ব লাভ করেছে। এ-অবস্থা তার ভালো লাগছে না, শ্লোকের মধ্যে তার আর্তি ভেসে আসছে।

শিবভক্ত বলছে—বেশ তো ছিলাম এই শিবমন্দিরে পুজো-আচ্চা নিয়ে। গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা পড়তাম, শিবনাম জপ করতাম রুদ্রাক্ষের গুটিকায়। আজ থেকে আর মালাও পরতে হবে না, জপও করতে হবে না। আমার নাকি মুক্তি হয়েছে। আর এই আমার শিবমন্দিরের শ্বেতশুভ্র সোপানগুলি, যাতে পায়ে পায়ে পৌঁছে যাওয়া যায় গিরিজা-গৌরীর প্রাণপ্রিয় শিবমূর্তির কাছে, এই সোপানগুলি আমি প্রতিদিন ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে রাখতাম, শিবভক্তেরা সেই পরিমার্জিত সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতেন শিবমূর্তির সামনে। হায়! আজ থেকে আমায় আর কিছুই করতে হবে না—হা সোপান-পরম্পরাং গিরিসুতা-কান্তালয়ালংকৃতিম্—আমার সেবা-আরধনায় তুষ্ট হয়ে বিভু শিব আমাকে তাঁর সেবা-সুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন। মোক্ষ বলে এক মহামোহ আছে কত-শত মানুষের, তাতে এই জগতের সত্তা বোধটাই লুপ্ত হয়ে যায়—বিভু শিব আমাকে সেই মোহের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছেন। হায় ভগবান! আমি কি এই চেয়েছিলাম!

শ্লোক পড়ার পরে আমার ভিতরে এক অসাধারণ অনুভূতির সৃষ্টি হল। আমি তো আশৈশব এই পরিবেশের মধ্যেই বড়ো হয়েছি—যেখানে অন্যান্য বহুতর ধর্মসম্প্রদায়ের কাম্য মোক্ষ, মুক্তি, নির্বাণ একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে। আরও আশ্চর্য হলাম এই কারণে যে, মহামতি চৈতন্য নন, তাঁর অনেক পূর্বকাল থেকেই তাঁর পরম রসায়ন ভক্তিবাদের জমি তৈরি হচ্ছিল তাহলে। গবেষণায় তো এ-কথা ভালোভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে ভারতবর্ষের সমস্ত দার্শনিক এবং ধর্মীয় তত্ত্ব একেবারে আমূল আলোড়িত হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের

মাটিতে তখন গিরি, পুরী, ভারতী, স্বামী, সরস্বতীরা একচ্ছত্র দার্শনিক অধিকার ভোগ করছেন। এমনকী শঙ্কর মতের বিরুদ্ধে রামানুজ-নিম্বার্ক-মধ্বাচার্যেরা যে দ্বৈতবাদী মত প্রচার করলেন, তাঁরা বিষ্ণু-নারায়ণের মতো ভাবধারী ভগবানের প্রতিষ্ঠা জাগিয়ে তুললেন বটে, কিন্তু মুক্তির ভাবনাটা তাঁদের মন থেকে গেল না। ভগবৎ-সাধনের পরম উপায় হিসেবে ভক্তিকেও তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ভক্তিকে তাঁরা ব্যবহার করেছেন মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে, ভক্তি তাঁদের কাছে সেবাবৃত্তির ভাবনায় রসায়িত হয়ে উঠল না কোনওদিন।

বিষ্ণুবাবুর মুখে উচ্চারিত কাব্যপ্রকাশ-এর শ্লোক আস্বাদন করে আমার গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলে গেল। বুঝলাম—চৈতন্যদেবের পুণ্যজন্মের অনেক আগে থেকেই তাঁর ভক্তিরসবাদ কিছু কিছু মানুষের অন্তর্গত হয়েছে। প্রথমেই বলেছিলাম—যে পারে সে ওমনি পারে, সবাই পারে না। অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্যের ভাবনা-ভাবিত দশনামী সম্প্রদায়ের তখন এমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ যে, সন্ন্যাসী হতে গেলে গিরি পুরী ভারতী না হলে, তাঁদের সন্ন্যাসী বলেই কেউ মানত না। কিন্তু শঙ্কর মতের সন্ন্যাসী হয়েও—কেননা গুরুর উপাধি পুরী-ভারতী বহিরঙ্গে ধারণ করেও অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের পরিবর্তে জ্যোতিষ্মান ঈশ্বরের মনুষ্যকল্প লালন করে যাবার জন্য গুরুর চেয়েও বৃহত্তর বিভূতিময় এক মহাসত্ত্বের প্রয়োজন হয়; গুরুর মর্যাদা রেখেও নিজমত প্রকাশের জন্য অধিকতর এক স্বাতন্ত্র্যও লাগে। চৈতন্য জন্মের পূর্বে একশো/দুশো বছরের মধ্যে এইরকম দু-চারজন বিভূতিময় সত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁদের একজনের কথা না বললে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন-সাধনাটাই বোঝা যাবে না। শুধু তাই নয়, এই মানুষটার জন্য তৎকালীন ভারতের অন্যতর অংশের সংস্কৃতি এই বাংলার হৃদয়ের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল—যার ফলশ্রুতি স্বয়ং চৈতন্যদেব।

কেউ বলতে পারে না, তিনি কোন্ দেশের লোক। গবেষণা তাঁকে বাঙালি করে তুলতে পারেনি, আবার তাঁকে দক্ষিণ-ভারতীয়ও করে তুলতে পারেনি, আবার তিনি যে মুম্বই অঞ্চলের মানুষ তাও বলা যায় না। তবে শেষ জায়গাটা থেকেই আমাদের অন্বেষণ আরম্ভ করতে হবে। মুম্বই প্রদেশে ভীমা নদীর তীরে শোলাপুর জায়গাটা এখনও বেশ পরিচিত। সেন্ট্রাল রেলওয়েতে বোম্বে-পুণা-কুরদ-ওয়াদিরাইচুর লাইন থেকে ব্রাঞ্চ লাইনে পড়বে পানঢারপুর (পান্ডারপুর) স্টেশন। এখানেই বিট্ঠলনাথজির মন্দির। বিট্ঠলনাথজির মন্দির বিগ্রহের ডাকনাম বিঠোবা। এই

মন্দিরে একবার আমরা লক্ষ্মীপতি পুরী নামে এক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়েছি। তবে এই মন্দিরেই যে তিনি সেদিন ছিলেন, তা নয়। সন্ন্যাসী মানুষ, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান। এমন হতেই পারে, তিনি তখন দক্ষিণ ভারতের কোনো মন্দিরে ভগবান কৃষ্ণের অন্য কোনো মূর্তি দেখে আপ্লুত বোধ করেছিলেন। সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের মানুষ, কিন্তু কৃষ্ণের লীলামাধুরী তাঁর সো'হং-ব্রহ্মবাদকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে রসিক ভক্ত করে তুলেছে।

এমনটা অসম্ভব নয়। ভগবান কৃষ্ণের মধ্যেই সেই মাধুর্য সৌন্দর্য চমৎকারিতা আছে, যাতে শুষ্ক-রুক্ষ মুনির হৃদয়ও আর্দ্র-সিক্ত হয়ে ওঠে। ভাগবতপুরাণ একবার বলেছিল যে, আত্মারাম মুনি যাঁরা, যাঁরা এই জীবনেই নিজের মধ্যে পরব্রহ্মজ্যোতিকে একত্তর করে ফেলেছেন, সেই তাঁরা পর্যন্ত ব্রহ্মাত্মকতা বাদ দিয়ে নিজেকে কৃষ্ণের ভক্তিকৌতুকে মোহিত হয়ে পড়েন—কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থংভূতগুণো হরিঃ। লক্ষ্মীপতি পুরী গোঁসাইও সেইরকম। শঙ্করমতে দীক্ষালাভ করেও তিনি বিভিন্ন কৃষ্ণ-মন্দিরে ঘুরে বেড়ান, কৃষ্ণের লীলারসে তিনি মগ্ন। এই লক্ষ্মীপতির সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল এক বৃদ্ধপ্রায় মানুষের। মনে মনে তাঁর সন্ন্যাস হয়ে গেছে বহুকাল, কিন্তু এখনও গুরুর কাছে দীক্ষা হয়নি। হয়তো বা মনের মতো গুরুও খুঁজে পাননি, যিনি তাঁকে পরম আনন্দের পথে নিয়ে যাবেন। দশনামী গুরুদেব সো'হংবাদ তাঁর মনের সঙ্গে পড়ে না, অথচ তাঁরা ছাড়া ত্যাগ-বৈরাগ্যপ্রধান গুরুও তেমন নেই। কাজেই এই বৃদ্ধপ্রায় ব্যক্তিটির সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়নি এখনও। লক্ষ্মীপতি পুরীর সঙ্গে দেখা হবার পর সেদিন তাঁর জীবনটাই পালটে গেল।

লক্ষ্মীপতি পুরী শঙ্কর প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য হলেও ভগবান কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা তাকে উদ্‌বেল করে তোলে। কিন্তু অদ্বৈতবাদের বীজ তাঁর মনে প্রোথিত থাকায় এখনও তিনি কৃষ্ণকে তাঁর আপন স্বরূপে আবিষ্কার করতে পারেন না। বৃদ্ধপ্রায় মানুষটি লক্ষ্মীপতির ভাব দেখে ভাবেন—এই যথেষ্ট। এঁর কাছেই তিনি দীক্ষা নেবেন। বাকি যেটুকু থাকবে সেটুকু শিষ্যের কাজ। গুরুরা দীক্ষা দেন, শিক্ষা দেন, আরও অনেক কিছু করেন, কিন্তু সুশিষ্যের প্রতি দত্ত বিদ্যা শিষ্যের অন্তর্গত বৈদগ্ধ্যে আরও অধিক স্ফূর্তি লাভ করতে পারে। বৃদ্ধপ্রায় মানুষটি লক্ষ্মীপতি পুরীর কাছে দীক্ষা নিলেন, তাঁর নতুন নাম হল মাধবেন্দ্র পুরী। শঙ্কর-সন্ন্যাসের উপাধি ওই 'পুরী' নামটুকুই অবশিষ্ট রইল, মাধবেন্দ্রের শরীর-মন

জুড়ে রইল কৃষ্ণলীলার মাধুর্য। সংশয়-জড়িত ভাবে পুরী ভাবলেন—আমি কি অন্যায় করছি, ভুল করছি! গুরুর কাছে যেমন দীক্ষা নিলাম, তাতে কি আমারই দোষ হচ্ছে না? পুরীর মনে পড়ে গীতার শ্লোক, কৃষ্ণের নিজের মুখের কথা—সর্বধর্মান্ পারিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম সব ত্যাগ করে তুমি আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমার সব পাপ ধুয়ে দেব।

অন্তর্হৃদয়ে মাধবেন্দ্র উপলব্ধি করেন—কৃষ্ণ তো গুরুরও গুরু, পার্থসারথিরূপে তিনিও তো গুরুর ভূমিকাতেই আছেন, অতএব আর সংশয় নেই। বেদের চরৈবেতি মন্ত্রে পথ চলতে চলতে মাধবেন্দ্র পুরীর মুখে সেই শ্লোক উচ্চারিত হল, যার মর্মকথা আমি সেই শিবভক্তের মুখে শুনেছিলাম অনেককাল আগে মন্মটাচার্যের কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে। বিষ্ণুবাবু স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—সেই শিবভক্ত দুঃখ পাচ্ছিল—তাঁর জপের রুদ্রাক্ষমালা, ভস্মতিলককে বিদায় দিতে হচ্ছে বলে। মাধবেন্দ্রের এই শ্লোক একই সুরে উচ্চারিত, বাচনভঙ্গিও প্রায় এক কিন্তু শ্লোকের মর্মে আছে আত্মনিবেদন, শরণাগতি। চৈতন্যপার্ষদ রূপ সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু এই শ্লোক আছে লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে। হয়তো কৃষ্ণের জন্য বিল্বমঙ্গলের সেই আত্মনিবেদন মাধবেন্দ্র পুরী আত্মসাৎ করেছিলেন বলেই রূপ গোস্বামী মাধবেন্দ্রের নামে এই শ্লোক মহিমান্বিত করেছেন।

শ্লোকের শরণাগতিতে মাধবেন্দ্র ক্ষমা চেয়ে বলেছেন—এতকাল যে ব্রাহ্মণসুলভ আচরণে সকাল-সন্ধ্যায় গায়ত্রী উচ্চারণ করে সন্ধ্যাবন্দনা করতুম, আজ থেকে বিদায় দিলুম তাকে! ব্রাহ্মণত্বের জাগরণে তিন-তিনবার স্নান করে যে শরীর পবিত্র করতুম, আজ থেকে তারও আর দরকার নেই। সন্ধ্যাবন্দনা সুখে থাকুন, স্নান-পবিত্রতাকেও নমস্কার—সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমঃ। মাধবেন্দ্র সমস্ত বৈদিক দেবতা আর পূর্বপ্রেত পিতৃগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন—কর্মযজ্ঞে যাঁদের বার বার আহ্বান করেছি, আমার সেই বৈদিক দেবতারা! প্রতিদিন যাঁদের উদ্দেশে অঞ্জলি তর্পণ করেছি আমার পিতামহ-পিতাঠাকুরেরা! আর আমি কিছুই করতে পারব না, এতদিন যা দিয়েছি, তাতেই তুষ্ট থাক তোমরা, আর আমি কিছুই করতে পারব না। আর পারব না বলে যদি কিছু পাপ ঘটে থাকে তবে সে পাপও ধুয়ে ফেলেছি যাদবোত্তংশ কৃষ্ণের কথা বার বার স্মরণ করে। তাছাড়া একবার যখন তাঁর পায়ে আত্মনিবেদন করেছি, তখন এটাই সার বুঝেছি যে, আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নেই—তদলং মন্যে কিমন্যেন মে।

এটা ঠিক যে, সন্ন্যাসীর জীবনে এমনিতেই ত্রিসন্ধ্যা স্নান অথবা তিন সন্ধ্যায় আহ্নিককৃত্যের শৃঙ্খল থাকে না, থাকে না পিতামাতার প্রতি শ্রাদ্ধতর্পণের ইতিকর্তব্য। মাধবেন্দ্র পুরীর এই শ্লোকোক্তি থেকে এই ভাব মনে আসতে পারে যেন এতকাল এই প্রায়-বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্মের শুষ্করুক্ষ্ম আচার তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। আসলে কিন্তু তা নয়। এই শ্লোক উচ্চারণ করে মাধবেন্দ্র বোঝাতে চাইছেন—যিনি কৃষ্ণের একান্ত শরণাগত, তাই তাঁর বর্ণধর্ম আশ্রমধর্মের বালাই নেই; আরও যেটা তিনি বোঝাতে চাইছেন, সেটা হল—যে সম্প্রদায়ে তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা নিলেন সেই সম্প্রদায়ের আনুক্রমিক আচার অথবা সেই সম্প্রদায়ের তত্ত্বগত আদর্শও তাঁর একান্ত সাধন নয়, বর্ণাশ্রমধর্ম-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্মেরও অতিক্রম ঘটিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—কৃষ্ণ ছাড়া আমার আর কাউকে চাই না, কোনো কিছুরই দরকার নেই আমার—তদলং মন্যে কিমন্যেন মে।

দেখুন, শুধু 'শরণাগতি' শব্দটার মধ্যেও এক ধরনের শুষ্কতা আছে, মাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণের লীলা-মাধুর্যে আপ্লুত—সেই আপ্লুতি তাঁকে একদিকে যেমন ব্রহ্মসাযুজ্যের সো'হংবাদী আদর্শ থেকে সরিয়ে এনেছে, তেমনই তা শুধু এক শরণাগত ভক্তের আত্মনিবেদনের ঐকান্তিকতাটুকুকেও রসায়িত করে তুলেছে। চৈতন্যচরিতামৃত-এর কবি মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধে লিখেছেন—মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্যকথন। মেঘ দেখিলেই তিঁহ হয় অচেতন। আকাশে কালো মেঘ দেখলেই কৃষ্ণের কালো রূপের কথা তাঁর মনে পড়ে। তিনি পাগলের মতো এখানে ওখানে ছুটে বেড়ান—যদি কোথাও কৃষ্ণের দেখা মেলে। মনে মনে ভাবেন—কোথায় সেই অলকা-তিলকা মাখা মুখখানি, কোনো কদমগাছের তলায় কদমফুলের মালা পরে কোথাও হয়তো দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, কোথায় তাঁর দেখা পাব—কদা দ্রক্ষ্যামি নন্দস্য বালকং নীপমালকম্...লসত্তিলক-ভালকম্।

পণ্ডিতেরা বলেছেন—শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে যে দার্শনিকেরা তর্কযুক্তি সহকারে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তাঁরা মূলত বৈষ্ণব। রামানুজ, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী বা মধ্বাচার্য—এঁরাই শঙ্কর-পরবর্তী যুগের চার সম্প্রদায়-প্রবর্তক বৈষ্ণবাচার্য। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাবধারা এঁদের সঙ্গে মেলে না। চৈতন্য মহাপ্রভুর সরসা ভক্তির মূলে আছেন এই মাধবেন্দ্র পুরী—যাঁকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বেদগ্রন্থ বলেছে—তিনি চৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি সূত্রধার—ভক্তি-কল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর। চার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের

সাধ্য-সাধনের সম্পর্কহীন এই রসময়ী ভক্তি মাধবেন্দ্র পুরীই বা কোথা থেকে পেলেন? পণ্ডিতেরা বলেছেন—দক্ষিণ ভারতের আলবর-সাধকেরা এই ভাবের ভাবুক। তাঁদের রসময়ী ভক্তির পরম্পরার সঙ্গে ভাগবত পুরাণ এবং লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত-এর মধুর ভক্তিরস মাধবেন্দ্র পুরী বয়ে এনেছিলেন দাক্ষিণাত্য থেকে। মাধ্যবেন্দ্র পুরীর পর্যটন সূত্রগুলিও এখানে দেখার মতো। সুদুর দাক্ষিণাত্যে দীক্ষা নিয়ে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়ে আস্তানা নিলেন লীলাভূমি বৃন্দাবনে। আর এখানেই তো সেই অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল—যা সাধারণভাবে বললে আজকের মানুষ বিশ্বাসই করবে না।

মাধবেন্দ্র পুরী অযাচকবৃত্তি সন্ন্যাসী। জীবনধারণের জন্য সামান্য খাদ্যটুকুও তিনি কারও কাছে চাইবেন না। কেউ কিছু দিয়ে গেল তো ঠিক আছে, তিনি নিজে কারও কাছে যাচনা করেন না, বরং উপবাসী থাকেন। একদিন এইরকমেই উপোস করে আছেন। বৃন্দাবনবাসীরা কৃষ্ণের গোবর্ধনলীলা স্মরণ করে অনেকেই গোবর্ধন পরিক্রমা করে। মাধবেন্দ্রও সেদিন পরিক্রমা সেরে বসে আছেন গোবিন্দকুণ্ডের তীরে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, মৃদু স্বরে কৃষ্ণনাম করছেন। সারাদিন খাওয়া হয়নি, খাওয়ার জন্য কোনো তাড়নাও নেই। হঠাৎই এক গোপবালক এক ভাঁড় দুধ নিয়ে এসে মাধবেন্দ্র পুরীর সামনে দাঁড়াল। ভাঁড়-ভর্তি দুধ তাঁর হাতে দিয়ে বলল—আমি পরে এসে ভাঁড় নিয়ে যাব। তুমি দুধ খেয়ে ভাঁড় রেখে দিও। আমি এই গ্রামেই থাকি, অযাচকদের আহার জোগাই আমি। তুমি খাও, আমি এই এলাম বলে।

পুরী গোঁসাই দুধ খেয়ে ভাণ্ড ধুয়ে বসে আছেন। মুখে কৃষ্ণনাম চলছে, কিন্তু রাত অন্ধকার হয়ে গেল সে বালক আর আসে না। শেষ রাতে যখন নিদ্রার আবেশে তিনি প্রায়াচ্ছন্ন, তখন ঘুমঘোরে মনোহর সেই বালক এল। পুরী গোঁসাই স্বপ্ন দেখেছেন— বালক তাঁর হাত ধরে এক কুঞ্জে নিয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে বলল—আমি গোবর্ধনের অধিপতি গোপাল। ম্লেচ্ছ আক্রমণের ভয়ে আমার সেবকেরা আমাকে কুঞ্জে রেখে চলে গেছে। রোদ-বৃষ্টি-শীতে আমার বড়ো কষ্ট। এতদিন তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম। তুমি আমাকে কুঞ্জ থেকে বাইরে এনে আমার সেবা প্রতিষ্ঠা করো।

'ম্লেচ্ছ আক্রমণ'। হ্যাঁ, ভারতবর্ষে তখন ইতস্তত মুসলমান রাজাদের আধিপত্য কায়েম হয়েছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, মাধবেন্দ্র পুরী ১৪২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে

১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই ধরাধামে বর্তমান ছিলেন। তিনি যদি একটু বেশি বয়সেও দীক্ষা নিয়ে থাকেন, তবে তাঁর পরিপূর্ণ ভক্তি আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুব খারাপ। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লঙ্ ভারত আক্রমণ করেন, তখন থেকে দিল্লিতে কোনো একছত্রী মুসলমান রাজা ছিলেন না। ১৪৫০ থেকে ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাহ্‌লোল লোদী দিল্লি অধিকার করেন বটে, কিন্তু তাঁর আশেপাশে সমস্ত রাজ্যে তখন মুসলমান শাসনের ডামাডোল চলছে। এ-রাজ্যের সঙ্গে ও-রাজ্যের বিবাদ বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে—যদিও সেসব সংঘর্ষও ছিল ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মুসলমান শাসকদের মধ্যেই নতুন করে ক্ষমতা লাভ করার সংঘর্ষ। ফলে অত্রস্থ মানুষের মনে অন্যধর্মী শাসকের ভয় রীতিমতো চেপে বসেছিল। ভারতীয় মানুষের বিশ্বাস এবং আস্থার জায়গা যে দেবমন্দিরগুলি, সেগুলি সহজেই আক্রান্ত হত মুসলমান উৎপীড়কদের হাতে এবং এখানে রাজা যতখানি উদ্যোগী হতেন, তার চেয়ে বেশি উৎসাহী হতেন পারিষদবর্গ, কেননা বিশ্বাস নষ্ট করার মধ্যে যে ক্রুরতা কাজ করে—সে ক্রুরতা রাজার চেয়ে তার পারিষদবর্গের বেশি থাকে।

মাধবেন্দ্র পুরীর মনে কিন্তু এই ম্লেচ্ছভয় নেই। দিল্লিতে ফিরুজ শাহ আছেন, নাকি বাহ্‌লোল লোদী আছেন—এসব তাঁর ভাবনার মধ্যে আসে না। ভোররাতের স্বপ্নে গোপাল-বালকের স্বপ্ন দেখে তিনি শুধু রাত্রির আঁধার কাটার অপেক্ষায় ছিলেন। সকাল হতেই পুরী গোঁসাই গোবর্ধনবাসী মানুষদের সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে গেলেন—যেখানে তাঁর স্বপ্নে দেখা ঠাকুর আছেন। খানিকক্ষণ খনন চলার পরেই মাটির অন্তরাল দেখে বেরিয়ে এল গোপাল বিগ্রহ। পুরী গোঁসাই সেই বিগ্রহ বুকে করে এনে তাঁর সেবা প্রতিষ্ঠা করলেন গোবর্ধনের ওপরেই। দিনে দিনে সেবার সমারোহ বেড়ে উঠল এবং এখনও সেই গোপালের সেবা-স্মরণের চিহ্ন রয়ে গেছে মাধবেন্দ্র-প্রবর্তিত অন্নকূট মহোৎসবের মধ্যে।

আমি চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বলতে গিয়ে মাধবেন্দ্র পুরীর কথা যে এত বলছি তার কারণ চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তি সাধনার ধান ভাঙতে হলে এই শিবের গীত নিতান্তই জরুরি। আমি ভেবে অবাক হই—এক প্রায়-নূতন ভক্তি আন্দোলনের ধারা প্রবর্তনের জন্য মাধবেন্দ্র পুরী যে ভৌগোলিক পথ নির্বাচন করেছিলেন, মহাপ্রভু চৈতন্যও অনেককাল পরে সেই পথ ধরেই তাঁর ভক্তি-আন্দোলনের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। অবশ্য সে কথা বলতে গেলেও আবার শিবের গীত গাইতে হবে

অর্থাৎ সেখানেও হৃদয়হারী কাহিনি আছে। আপনারা বলতে পারেন—এসব কথা, কাহিনি, উপাখ্যান শোনাচ্ছ কেন? বেশ তো একেবারে আবেগহীন ভাবে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের মতো চৈতন্যের ঐতিহাসিক পটভূমি বিচার করে তাঁর সারস্বত জীবনের কথা বলতে পারতে। আমি বলব—ইতিহাস বিচারের ভাবনা-চিন্তা কিন্তু পাল্টেছে। ঐতিহাসিকেরা আজকাল লোকপ্রচলিত, অথচ প্রায়-সত্য ঘটনাগুলিকে ইতিহাস-অর্থনীতি-সমাজনীতির আলোয় নতুন করে ভাবছেন। নইলে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কাহিনি নিয়ে পার্থ চ্যাটার্জীর প্রিন্সলি ইমপস্টার অথবা গৌতম ভদ্রের জাল প্রতাপচাঁদ নতুন করে ভাবাত না। তাছাড়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের মধ্যে এক ভয়ংকর প্রাণময় আবেগ আছে আর সেই সব আবেগ-অনুভূতি ছড়িয়ে আছে শত শত মহাজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে, শত শত কাহিনির মধ্যে। অতএব কাহিনি না বললে ইতিহাসে যাওয়া সম্ভবই নয়।

মাধবেন্দ্র পুরী মহাসমারোহে তাঁর 'লসত্তিলক-ভালক' গোপালকের সেবা চালাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে আবারও তাঁর স্বপ্নে এলেন সেই মনোহর সুন্দর মূর্তি—গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর। তিনি বললেন—তুমি আমার অনেক সেবা করেছ, গোঁসাই। তবু আমার শরীরের জ্বালা জুড়লো না। এতদিন তো রোদ বৃষ্টিতেই কষ্ট পেয়েছি, শরীরের জ্বালা তাই বড়ো বেশি। তুমি এক কাজ করো। মলয় পর্বতের চন্দন বড়ো শীতল, তুমি সেই চন্দন নিয়ে এসে আমার বিগ্রহ-শরীরে লেপন করো, তাতে আমার জ্বালা যাবে। পুরী বললেন—কোথায় পাব আমি মলয়-চন্দন? তাছাড়া প্রতিদিন গোপালের নিত্যসেবা ছেড়ে আমি যাবই বা কোথায়? স্বপ্নে দেখা বালক বলল—মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে। অর্থাৎ নীলাচল জগন্নাথে গেলেই তোমার চন্দনের জোগাড় হয়ে যাবে। কিন্তু স্বপ্নাদেশে আরও বলা হল—অন্যকে দিয়ে সেই চন্দন আনলে চলবে না। তোমাকে নিজে যেতে হবে—অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে।

জানি, বেশ ভালো জানি যে, যুক্তিবাদী মানুষ বলবে—এসব হল গেঁজেলের কথা। আরে ভগবান হলেন সর্বশক্তিমান। তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তবে তো মুহূর্তের মধ্যে শত বৃক্ষের চন্দন-প্রলেপ তাঁর অঙ্গ জুড়িয়ে দিতে পারে। আমরা বলি—অত দূরে চিন্তা কেন? সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শরীরে তাপ সৃষ্টি হওয়ার প্রসঙ্গই তো আসে না—এমন ভাবলেই তো হয়। আর যদি বা তাপ সৃষ্টি হয়, তবে আবার চন্দনের প্রয়োজন কী, ইচ্ছামাত্রেই তো তিনি শীতোষ্ণ-বাষ্পায়িত হতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের

এই সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস করেও তাঁর এই মনুষ্যসুলভ রসায়ন—এটাই ভাগবত-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। তাঁর অখিল পারিষদকুল এবং ভক্তকুলের কাছে ঈশ্বরের এই সাপেক্ষ ব্যবহার তাঁকে অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপের অনির্বচনীয়তা থেকে নিতান্ত প্রাণময় করে তোলে—তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে তুমি তাই এসেছ নীচে / আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে। এইরকম একটা দর্শনেই মাধবেন্দ্র পুরীর মতো রসিক ভক্তের কাছে অমন স্বপ্নের আবদার ভেসে আসে—অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে।

আসলে এ তো নিছক স্বপ্নাদেশ নয়, এই চন্দন-ভ্রমণের মাধ্যমেই মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেমময় ভক্তির পরম অভ্যুদয় ঘটবে বাংলার বুকে এবং তা যুক্ত হবে ওড়িশা-বৃন্দাবনের বৃত্তে পুনরাবর্তনের মহিমায়। মাধবেন্দ্র পুরী সোজাসুজি নীলাচলে গেলেন না। গোপালের স্বপ্নাদেশে তিনি চন্দন আনতে রওনা দিলেন বটে, কিন্তু পথের সুবিধার জন্যই হোক, কিংবা অন্য কোনো টানে তিনি বৃন্দাবন থেকে পায়ে হেঁটে পৌঁছলেন এই বাংলাদেশে। পণ্ডিতেরা অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন—বৃন্দাবন থেকে পুরী যাওয়া যেত অনেক সহজে, প্রায় বৃদ্ধ পুরীর পক্ষে সেটাই সহজ ছিল, কিন্তু তবু যে তিনি পথ চলতে চলতে চলে এলেন এই শ্যাম বঙ্গদেশে, তার কিছু কারণ থাকবে নিশ্চয়। প্রথম হতে পারে, তিনি বাঙালি ছিলেন। সন্ন্যাসীর পরিব্রাজকতা তাঁকে এখানে-সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ালেও এই শ্যামল-সুন্দর বাংলাদেশ তাঁকে নিজের অন্তর্গত আকর্ষণে টেনে নিয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত হতে পারে—বঙ্গভূমিতে মাধবেন্দ্রের পূর্ব-পরিচিত কিছু মানুষজন ছিলেন—যাঁরা তাঁর পরিব্রাজনের সময় থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন। এতদিনে যখন সময় হল, তখন প্রথম সুযোগেই মাধবেন্দ্র তাঁর অনুরাগময়ী ভক্তির প্রেমস্পর্শ লাগিয়ে দিলেন বঙ্গভূমির গায়ে।

পণ্ডিতেরা বলেন—মাধবেন্দ্র পুরী বাঙালি ছিলেন কিনা সেটা প্রমাণ করবার মতো তথ্যও যেমন আমাদের হাতে নেই, তেমনই সেটা অপ্রমাণ করার মতো তথ্যও আমাদের হাতে নেই। অর্থাৎ তিনি অবাঙালি হতেও পারেন, আবার নাও পারেন। অবশ্য তাতে কিছুই আসে যায় না। কেননা যদি দ্বিতীয়টাও হয়, অর্থাৎ এখানে তাঁর পূর্বপরিচিত কিছু ব্যক্তি ছিলেন, যাঁদের আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারেননি, তাতেও যা ফল হবার, তাই-ই হয়েছে। বস্তুত পূর্বপরিচিত ব্যক্তি না থাকলে বঙ্গভূমিতে তাঁর ভক্তি-দর্শনের ভাবধারা এত সহজে প্রোথিত হত না। আর

এই পূর্বপরিচয় খুব অসম্ভবও নয়। গৌড়বঙ্গে নবদ্বীপ তখন অন্যতম বিদ্যাকেন্দ্র। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পণ্ডিত-সজ্জনের নবদ্বীপে আসাটা তখন মোটেই অসম্ভব ছিল না। সেই কারণে মাধবেন্দ্র যদি অন্য প্রদেশের মানুষও হয়ে থাকেন, তবুও পূর্বে এই বাংলায় তাঁর আনাগোনা হয়ে থাকতে পারে এবং পূর্ব পরিচিত মানুষজনও কিছু থেকে থাকতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা, নিজভাবের ভাবুক যেখানে থাকে সেখানে একটা বিশেষ আকর্ষণ থাকে। বঙ্গভূমি গীতিগোবিন্দ-এর দেশ, এখানে কৃষ্ণলীলার চর্চা চলছে বহুকাল ধরে। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের গীত তখন বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করেছে—এইরকম একটা আবহ যেখানে পূর্বেই তৈরি ছিল, সেখানে মাধবেন্দ্র পুরীর ভাবের ভাবুক অনেকেই থাকার কথা এবং ছিলও।

কথাটা এইজন্য বলছি যে, চৈতন্যচরিতামৃত-এ দেখছি—মাধবেন্দ্র পুরী তাঁর গোপাল-বিগ্রহের আদেশ মাথায় নিয়ে চন্দনের জন্য নীলাচল-জগন্নাথে যাবার পথে আগে গৌড়দেশে এলেন এবং সেখানে তাঁর ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে শান্তিপুরে। অদ্বৈত আচার্যের নিবাস-স্থান। পুরী গোঁসাই অদ্বৈতের ঘরে কেন এসেছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃত এর কবি তা বলেননি। শুধু বলেছিলেন—পুরীর প্রেম দেখি আচার্য আনন্দ অন্তরে। তাঁর ঠাঁই মন্ত্র নিল যতন করিয়া। চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া।।

অদ্বৈত আচার্য চৈতন্য মহাপ্রভুর অনেক আগে জন্মেছিলেন, প্রায় সঠিক বলতে গেলে সেটা ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দ হবে, তার মানে মহাপ্রভুর চেয়ে তিনি অন্তত পঞ্চাশ/বাহান্ন বছরের বড়ো। পণ্ডিতেরা এমন কথা অনেকেই বলেন যে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। শ্রীহট্টের আদিনিবাস লাউরগ্রাম ছেড়ে অদ্বৈত প্রথমে আসেন শান্তিপুরে। অদ্বৈত আচার্যের বিষয়ে লেখা যেসব আকর গ্রন্থ পাওয়া যায় সেগুলি থেকে প্রমাণ হবে যে, পূর্বে তাঁর নাম ছিল কমলাক্ষ ভট্টাচার্য এবং শান্তাচার্য নামে এক ব্যক্তির কাছে তিনি নাকি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন বলে তাঁর আচার্য উপাধি আসে। আমাদের ধারণা অবশ্য অন্য রকম। ধরে নিতে পারি—শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে তাঁর আচার্য উপাধি জুটতে পারে বটে, কিন্তু গৃহী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রথম নামটি বদলে গেল কী করে? আমরা জানি যে, এসব সমস্যা সমাধানের কোনো উপযুক্ত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবু বলি, আমাদের ধারণা— বঙ্গদেশে তখন ন্যায়শাস্ত্র চর্চার সঙ্গে বেদান্তের চর্চাও খুব বেশি হত, শঙ্কর-বেদান্তে অদ্বৈতবাদের প্রভাবও কিছু কম ছিল না। মনে হয়,

সেই অদ্বৈত-বেদান্তের পণ্ডিতজনোচিত কৌতুকেই কমলাক্ষ ভট্টাচার্যের বৈদান্তিক সংস্কার ঘটেছিল প্রথমে, ফলে তাঁর প্রথম নাম পালটে 'অদ্বৈত' হয়ে যায়, আর সন্ন্যাস যাঁরা নিতেন না, তাঁরা আচার্য নামে পরিচিত হতেন বলেই তাঁর পুরো নাম অদ্বৈত আচার্য।

কিন্তু সমসাময়িক এই অদ্বৈতবৈদান্তিক সংস্কার তাঁকে শান্তি দেয়নি। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম তাঁকে অন্য পথে প্রাণিত করে। আমাদের বিশ্বাস—মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে কমলাক্ষ ভট্টাচার্যের পূর্বপরিচয় ছিল এবং মাধবেন্দ্র হয়তো আগেও কয়েকবার এ দেশে এসেছেন। এমনও হতে পারে যে, এ-পরিচয় হয়েছিল সেই নবহট্টে, বা নৈহাটিতে থাকতেই। কেননা দেখুন, মাধবেন্দ্রের আর এক শিষ্য ঈশ্বরপুরী, যিনি ভবিষ্যতে মহাপ্রভু চৈতন্যকে মন্ত্রদীক্ষা দেবেন, তিনি ছিলেন কুমারহট্টের লোক। কুমারহট্ট এবং নবহট্ট পাশাপাশি জায়গা—এখন যেটা হালিশহর এবং নৈহাটি। আমাদের বিশেষ ধারণা—মাধবেন্দ্র পুরী হালিশহর-নৈহাটি অঞ্চলে এসেছেন। ঈশ্বরপুরী এবং অদ্বৈত আচার্যকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন। কৃষ্ণভিত্তিক এবং কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য তখন থেকেই এঁদের অন্তর্গত হয়েছিল। কিন্তু দীক্ষার প্রসঙ্গ আসেনি, কেননা তখনও পর্যন্ত মাধবেন্দ্র পুরীরই দীক্ষা হয়নি হয়তো।

মনে রাখা দরকার—গুরু যেমন শিষ্য চিনে পরীক্ষা করে নেন, তেমনই আগ্রহী শিষ্যও মনের মতো উপযুক্ত গুরু খুঁজে বেড়ান। কোন্ ভাবে ঈশ্বরের সাধনা হবে, কোন্ রূপে ঈশ্বরকে ভক্তের ভালো লাগে, ঈশ্বরের কোন্ গুণ ভক্তকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে, এগুলি একজন রসিক-ভাবুক ভক্তের মনে অনেক আগে থেকেই ক্রিয়া করতে থাকে। গুরুর জন্য, আপন অন্তর্গত ভাবসিদ্ধির জন্য ভক্তের অন্বেষণ তাই চলতেই থাকে বহুদিন ধরে। গুরু শিষ্যকে দেখলেন অথবা শিষ্য গুরুকে দেখলেন, আর অমনই দীক্ষা হয়ে গেল—এমন কৃপা-করুণার উদাহরণ অবশ্যই আছে, কিন্তু বহুতর ক্ষেত্রেই মন্ত্রদীক্ষার পূর্বে এক ধরনের একাত্মতার অন্বেষণ চলে। আমাদের তাই ধারণা অদ্বৈত আচার্য এবং ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মাধবেন্দ্রের পরিচয় ছিল পূর্ব থেকেই। ঈশ্বর পুরীর দীক্ষা অদ্বৈত-প্রভুর আগে হয়েছে না পরে হয়েছে, সে তর্কের প্রয়োজন নেই। কিন্তু কমলাক্ষ ভট্টাচার্য যখন শান্তিপুরে-আসা মাধবেন্দ্র পুরীর ভাব দেখলেন, যখন দেখলেন এক বৃদ্ধপ্রায় সন্ন্যাসী সেই সুদূর বৃন্দাবন থেকে ওড়িশায় যাচ্ছেন প্রিয় বিগ্রহের চন্দন-সেবার জন্য, তখনই কমলাক্ষ বুঝেছিলেন—এই প্রেম তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মাধবেন্দ্র পুরীর

কাছে দীক্ষা নিতে তাঁর এতটুকু সময়ও লাগল না, এতটুকু দ্বিধাও হল না—পুরীর প্রেম দেখি আচার্য আনন্দ অন্তরে। তাঁর ঠাঁই মন্ত্র নিল যতন করিয়া। আমাদের ধারণা—দীক্ষা দানের সময় পুরী গোঁসাইয়ের দশনামী সম্প্রদায়ের নামাচরণটুকু বোধহয় রয়েই গেল এবং সেই সঙ্গে গৃহী অবস্থার জন্য কমলাক্ষ ভট্টাচার্য অদ্বৈত আচার্য নামে পরিচিত হলেন। বৃন্দাবনের ব্রজপ্রেম, দাক্ষিণাত্য আলবরদের প্রেমভক্তি-পরম্পরা গৌড়বঙ্গে প্রোথিত হয়ে গেল অদ্বৈত আচার্যের ঘরে।

মাধবেন্দ্র পুরী অদ্বৈত আচার্যকে দীক্ষা দিয়ে কবেই নীলাচলে চলে গেছেন। মাঝপথে রেমুণায় গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করেছেন, গোপালের জন্য চন্দন-কর্পূর জোগাড় করেছেন এবং হয়তো শেষ পর্যন্ত আর তাঁর বৃন্দাবনে ফেরা হয়নি। সেসব ঘটনার বিস্তারে যাব না, শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে—বৃন্দাবন, গৌড়বঙ্গ এবং নীলাচল-পুরীর মধ্যে যে ত্রিভুজ-সংযোগ ভবিষ্যতে সুদৃঢ় হয়ে উঠবে চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে, সেই প্রেমের পথ কিন্তু পূর্বোৎকীর্ণ হয়ে রইল মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেমযাত্রায়।

২

গবেষকেরা অনুমানে বলেন—মাধবেন্দ্র পুরী যখন গৌড়বঙ্গে এসেছিলেন, তখন নেহাতই শিশু ছিলেন চৈতন্যদেব। চরিতামৃতের কবি চৈতন্যদেবের অবতার-স্বরূপ বর্ণনায় চৈতন্যের পিতা-মাতা এবং পিতৃস্থানীয়দের জন্মসূত্র রচনা করবার কালে চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবীর সঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বরপুরী এবং অদ্বৈত আচার্যকে একত্র স্থান দিয়েছেন। বলেছেন—এঁরা সব একসঙ্গে এই ধরাধামে এসেছিলেন— মাধব-ঈশ্বরপুরী শচী-জগন্নাথ। অদ্বৈত আচার্য প্রকট হইলা সেই সাথ।। বস্তুত মাধবেন্দ্র পুরী চৈতন্যের প্রপিতামহের বয়সি, ঈশ্বরপুরী এবং অদ্বৈত আচার্যের চেয়েও তিনি বয়সে অনেক বড়ো। মাধবেন্দ্র পুরী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন অনেক বুড়ো বয়সে এবং অদ্বৈত আচার্যও তাঁর কাছে যখন দীক্ষিত হয়েছিলেন, তখন তিনি নিজেই বয়সে প্রবীণ। ফলে চৈতন্য মাধবেন্দ্র পুরীকে দেখেছিলেন একেবারেই শিশুকালে, অথবা দেখেনইনি।

চৈতন্যদেবের শৈশব এবং বালক-বয়সের ক্রিয়াকর্মগুলি চরিতকারেরা যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে ভবিষ্যতের চৈতন্যপ্রভুর কোনো আভাস ছিল না। অধিকাংশ দুষ্ট প্রকৃতির বালক যেভাবে উচ্ছন্নে যাবার সম্ভাবনা নিয়ে দিন কাটায়, বালক বয়সে চৈতন্যেরও দিন কেটেছে সেইভাবে। অবশ্য তখন তাঁর নাম চৈতন্য ছিল না। পিতা-মাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন বিশ্বম্ভর, ডাক নাম নিমাই। বালক-বয়সের যত দুষ্টুমি এবং অসভ্যতা হতে পারে, তা সবই চরিতকারেরা বিশেষত 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করেছেন দ্বিধাহীন ভাবে। এই বর্ণনার সত্যাসত্য বিচার করার দায় আমার নেই, কিন্তু গবেষক-জনের ভাবনা থেকে বলা যায় যে, এই বর্ণনার মধ্যে চরিতকারের কতগুলি অভিপ্রায় কাজ করে। অবশ্য চৈতন্যপ্রভুর বাল্যলীলা-সূত্রগুলি একটুও উচ্চারণ না করে সেই অভিপ্রায় বোঝানো খুব মুশকিল।

চৈতন্যের শৈশব-ক্রীড়ার বর্ণনা যেমনটি চৈতন্য-ভাগবত-এ আছে, তাতে চরিতকারের কতকগুলি অভিপ্রায় প্রকট হয়। প্রথমত জানিয়ে রাখা ভালো যে, চৈতন্য-ভাগবত-এর স্রষ্টা বৃন্দাবন দাস স্বচক্ষে চৈতন্যমহাপ্রভুকে দেখেননি। তাঁর

মা নারায়ণী দেবী চৈতন্যের অতি প্রিয় পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাই কিংবা দাদা নলিন পণ্ডিতের মেয়ে। নারায়ণীর গর্ভাবস্থাতেই তাঁর স্বামী মারা যান, কিন্তু নারায়ণী স্বচক্ষে চৈতন্য মহাপ্রভুর দেখা পেয়েছিলেন এবং সেটা চরিতকার বৃন্দাবন দাসের কাছে গর্বের বস্তু ছিল। বৃন্দাবন দাস অবশ্য চৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার সহচর নিত্যানন্দপ্রভুর সাক্ষাৎ-কৃপা পেয়েছিলেন। সেই পরম্পরা তথা শ্রীবাস পণ্ডিতের কুলপরম্পরার কারণে তিনি অনেকটাই শুনে এবং অনেকটাই দেখে চৈতন্যের বাল্যলীলার গান করেছেন। এটা অবশ্যই মানতে হবে যে, চৈতন্যের মতো অবতার-প্রমাণ পুরুষের পরম অভ্যুদয় যখন ঘটে, তখন তাঁর জীবন-বর্ণনার মধ্যে অলৌকিক বিভূতির কথা কিছু থাকবেই। সেগুলি বিশ্বাস করলে চৈতন্যের অভ্যুদয় কোনো বাড়তি গৌরব লাভ করে না, আবার অবিশ্বাস করলেও সে অভ্যুদয় কিছুমাত্র খণ্ডিত হয় না।

চৈতন্যের শৈশব এবং বাল্য জীবন বর্ণনায় বৃন্দাবন দাস দুটি অভিপ্রায় সফল করেছেন। প্রথম কাহিনিতে এক পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি বালগোপাল সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন, গোপালের সেবা করেন। তখন এরকমই ছিল, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বাড়িতে এলে গৃহস্থ তাঁকে রান্নার সজ্জা করে দিতেন। রান্না করতেন সন্ন্যাসী নিজেই। মিশ্র জগন্নাথ চাল-ডাল, কাঁচা তরকারি সজ্জা করে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ রান্না করে ভোগ লাগিয়েছেন গোপালের, শিশু নিমাই সেই ভোগনিবেদন শেষ হতে দেননি, তিনি নিজে খেয়ে উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছেন অন্নব্যঞ্জন। পরিব্রাজক হায়-হায় করে উঠেছেন। মিশ্র জগন্নাথ আবারও রান্নার ব্যবস্থা করেছেন। কড়া পাহারা সত্ত্বেও আবারও একই ঘটনা ঘটল এবং শিশু নিমাইকে জিজ্ঞাসা করলে, সে উত্তর দিচ্ছিল—আমার কি দোষ বিপ্র ডাকিলা আপনে। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী তিন-তিন বার রান্না করেছিলেন এবং প্রত্যেকবারই বালগোপালের ভোগমন্ত্র স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের দিগম্বর শিশু-মূর্তির আর্বিভাব ঘটেছে ব্রাহ্মণের সামনে। অবশেষে রাত্রি দ্বিপ্রহরে আবারও যখন ভোগ লাগল, তখন তাঁর করুণাঘন বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে একান্তে—মোর মন্ত্র জপ মোরে করহ আহ্বান। রহিতে না পারি আমি আসি তোমা স্থান।।

অবতার-স্বরূপের এই যে বিপরিবর্তন, বালগোপাল-মূর্তির সঙ্গে গৌরগোপাল-মূর্তির বিপরিবর্তন—ধুলাময় সর্ব অঙ্গ মূর্তি দিগম্বর। অরুণ-নয়ন কর-চরণ সুন্দর।।— এইখানেই চৈতন্যচরিতকার তাঁর প্রথম অভিপ্রায় সিদ্ধ করে নিয়েছেন।

অর্থাৎ এর পরে যতই ঘটনা ঘটুক, চৈতন্যের জীবনে যতই মনুষ্যত্বের অভিসন্ধি রচিত হোক, বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-স্বরূপ বর্ণনা করছেন কৃষ্ণের বাল্যলীলার স্বরূপে। সেখানে তাঁর বাল্য-জীবনের কাহিনিগুলি এমনই, যা এই বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থানে ঘটতেই পারে। এখানে মহাকাব্যিক কাল কোনও দূরত্ব তৈরী করে না, মহাভারতের মতো বিরাট গম্ভীর কোনও পরিবেশও এখানে বাল্যলীলার রসহানি ঘটায় না। নবদ্বীপের সমাজ এবং নিতান্ত লোকস্তরে যা ঘটতে পারে চৈতন্যের বাল্যজীবনে সেগুলির মধ্যেই মিশে গেছে কৃষ্ণের বাল্যলীলার সূত্রগুলি। বৃন্দাবন দাস সংস্কৃতে *ভাগবত পুরাণ* লিখছেন না, তিনি 'অ্যাড্রেস' করছেন পঞ্চদশ/ষোড়শ খ্রিস্টাব্দের আপামর সাধারণ মানুষকে। ফলত ভাগবত পুরাণ-এ বর্ণিত কৃষ্ণের বাল্যলীলা গৌড়বঙ্গের সমাজ এবং সংস্কারের মধ্যে বিপরিবর্তিত হয়েছে। নবদ্বীপে সাপের ভয় ছিল প্রচুর এবং সেই সাপের কামড়ে এক সময়ে বিশ্বম্ভর-নিমাইয়ের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া মৃত্যু বরণ করবেন, কিন্তু চৈতন্যের বাল্যলীলায় তিনি কুণ্ডলীকৃত ফণীন্দ্রের ওপর বসে থাকেন নির্ভয়ে। চরিতকার পরিষ্কার করে বলেন না, কিন্তু এই মুহূর্তে অনন্তশায়ী বিষ্ণুর কথা আমাদের মনে আসে। মনে আসে কালীয়-দমন লীলাও। বুঝতে পারি— চৈতন্যচরিতকার চৈতন্যকে কৃষ্ণের আদলে গড়তে চাইছেন।

এই গড়ে তোলার মধ্যে চরিতকারের অভিনবত্বও আছে। শিশু নিমাই কেঁদে সারা হলে সমবেত রমণীকুলের মুখে হরিধ্বনি শুনলে কাঁদা বন্ধ করেন অথবা তাঁর চূড়াকরণ—হাতেখড়ি হতেই দুই-তিন দিনের মধ্যে তিনি সমস্ত বর্ণমালা, যুক্তাক্ষর সহ লিখে ফেলছেন—এইসব সংবাদের মধ্যে আমি তাঁর মহামহিম ক্ষমতা কিছু দেখতে পাই না। কেন না ঈশ্বরপ্রকৃতিক অভ্যুদয় প্রমাণের জন্য এগুলি কোনো নতুন সংবাদ নয়। এমনকী দুই চোর স্বর্ণালংকারের লোভে শিশু নিমাইকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে নিজেদের পথ ভুলে গেল এবং দিশা হারিয়ে আবারও ফিরে এল মিশ্র জগন্নাথের ঠিকানায়—এই সংবাদের মধ্যে মহাপ্রভুর অলৌকিকতার চেয়েও আমাদের কাছে যেটা আরও বেশি কৌতুকপ্রদ লাগে, সেটা হল—সেই সময়ের নবদ্বীপেও ছেলেধরা ছিল এবং সম্পন্ন ঘর থেকে শিশু-অপহরণের ঘটনাও ঘটত। চৈতন্যের বাল্যজীবনের মধ্যে চরম দুষ্টামির ঘটনাগুলি বৃন্দাবন দাস লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সেখানেও হয়তো নবনীত-চৌর কৃষ্ণের বাল্যলীলা চাপল্যের সমস্ত সূত্রগুলি খেটে যাবে, কিন্তু তবু এখানে চরিতকারের মুনশিয়ানা আছে।

পঞ্চদশ/ষোড়শ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপের মতো বর্ধিষ্ণু গ্রাম-শহরে অনেকগুলি গঙ্গার ঘাট ছিল। সেই ঘাটগুলিতে অল্পবয়সী দামাল ছেলেরা যে অসীম দুষ্টামি করে বেড়াত, বৃন্দাবন দাস সেই দুষ্টামির চেহারা দেখেছেন বালক বিশ্বম্ভরের মধ্যে।

কিছু দৃশ্যের বাস্তব পট-পরিবর্তন ঘটেছে। যমুনা-পুলিন নেই, স্থান নিয়েছে সুরধনী গঙ্গা। এখানে শ্রীদাম-সুদামের মতো সখারাও নেই, বিশ্বম্ভর নিমাইয়ের সখারা তেমন নির্দিষ্ট কেউ নন, গঙ্গার ঘাটে বাচ্চা ছেলেরা এক জায়গায় হলে যে দুষ্টুমি শুরু হয়, তার সূচনা করার জন্য বৃন্দাবন দাসকে লিখতে হয়েছে—সংহতি-চপল যত দ্বিজের কোঙর—অর্থাৎ এক জায়গায় মিললেই তারা অন্যের যন্ত্রণা তৈরি করে। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের বালচাপল্যের যে নমুনা দিয়েছেন, সে চপলতা বড়োই ভূমিজ অর্থাৎ চরিতকার নিজে তেমনটি স্বচক্ষে দেখেছেন, তার সঙ্গে নিমাইয়ের নাম যুক্ত হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা—এই চপলতার আড়াল থেকেই নবদ্বীপের তৎকালীন সমাজের ছোট্ট ছোট্ট অভ্যাস, ছোট্ট ছোট্ট সংস্কারগুলি এমন বাস্তবভাবে প্রকট হয়ে ওঠে, যাতে পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের উদার আন্দোলন অনেক সপ্রমাণ হয়ে উঠবে।

বৃন্দাবন দাসের বয়ান থেকে বোঝা যায় যে, সেকালের দিনের মানুষের মধ্যে খুব বেশি না হলেও ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক ছিল কিছু। কারণ বিশ্বম্ভর তাঁর স্নানের চাপল্যে মাঝে-মাঝেই স্নান করে ওঠা মানুষকে ছুঁয়ে দিয়ে তাঁদের বারবার স্নান করাতেন, অথবা স্নানরত মানুষের গায়ে কুলকুচি করে জল ফেলতেন—

পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছোঁয় কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান।।

গঙ্গার তীরে কেউ নিবিষ্ট মনে ধ্যান করতে বসলেও নিমাইয়ের হাত থেকে তাঁর রক্ষা নেই। তিনি তাঁর গায়ে জল দিয়ে ধ্যান ভাঙাবেন। যাঁরা মৃন্ময় শিবলিঙ্গ তৈরি করে শিবনেত্রে শিবের কথা চিন্তা করছেন, তাঁদের শিবলিঙ্গ চুরি যেত। চুরি যেত বিষ্ণুপূজার সজ্জা—পুষ্প, দূর্বা, নৈবেদ্য, চন্দন অথবা পাঠ করবার গীতা, পুজার নৈবেদ্য খেয়ে ফেলা, ব্রাহ্মণের উত্তরীয় বসনখানি ঘাড়ের ওপর থেকে নিয়ে যাওয়া, ডুব সাঁতার কেটে অলক্ষ্যে জলের নীচে পা ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া, তীরে রাখা পূজার ডালি, ধুতি অন্যত্র রেখে দেওয়া, মেয়েদের চুলের মধ্যে ওকড়ার বিচি দিয়ে চুল জড়িয়ে দেওয়া—এসব নিমাইয়ের নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ত। বেলা দুই প্রহরের আগে তিনি জল থেকে উঠতেন না।

এই অনন্ত দুষ্টুমির তালিকা আমাদের কাছে খুব বড়ো কথা নয়, বড়ো নয় এই সংবাদও যে সেইসব দুষ্টুমির জন্য সামাজিক ব্রাহ্মণেরা এবং নবদ্বীপের মেয়েরা পৃথকভাবে মিশ্র জগন্নাথ এবং শচীদেবীর কাছে নালিশ করেছেন। কারণ এই ধরনের নালিশ বৃন্দাবনের নন্দরাজ এবং মাতা যশোমতীও শুনেছেন। যেটা বড়ো কথা, সেটা হল—তখনকার সাধারণ ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে—অবশ্যই প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং তত্ত্বজ্ঞানীদের বাদ দিয়ে কথাটা বলছি— একেবারে সাধারণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে স্মৃতিশাস্ত্রের সাধারণ আচারগুলি দৃঢ় প্রোথিত ছিল। বহুবার যে নিজেই স্নান করছে সেই বালক এক স্নাত ব্রাহ্মণকে ছুঁয়ে দিলে আবারও তাকে স্নান করতে হচ্ছে—এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, কোনো তত্ত্ব নয়, কোনো দর্শন নয়, শুধু স্নানের মহিমায় নিজেকে পৃথক এক শুদ্ধসত্ত্ব বলে প্রমাণ করার একটা স্মার্ত তাড়না তখনও লোকসমাজে কাজ করছে। গঙ্গা স্নানের পুণ্য ছাড়াও শিবপূজা, বিষ্ণুপূজাটা গঙ্গার তীরেই সমাধা হয়ে যাচ্ছে, তাও দেখতে পাচ্ছি। এতে পুজোর ঝামেলাটা বাড়িতে এড়িয়ে যাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য, নাকি গঙ্গাতীরে শিবপূজা, বিষ্ণুপূজার ফল বেশি, সেটা বোঝাও কঠিন হয়ে পড়ে। তবে গবেষণার অন্যান্য সূত্র থেকে এটাও প্রমাণ করা যাবে যে, তৎকালীন বামুন বাড়িতে বিষ্ণু-নারায়ণের নিত্যপূজা হত না—এটা প্রায় অসার কথা—কারণ স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতেই বিষ্ণুপূজার মাহাত্ম্য খুব বেশি মাত্রায় প্রচারিত, কিন্তু এই বিষ্ণুপূজার মধ্যে যে একটা যান্ত্রিকতা কাজ করত, তা এখনও পর্যন্ত জ্ঞাতি-শরিকদের মধ্যে পূজা ভাগ করে নেওয়া বা পূজার পালা সমাধা করার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে অবশ্য জমিজিরেত এবং দেবত্র সম্পত্তির ফলভোগের বিষয়টাও পূজার শর্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং তাতে যান্ত্রিকতার তত্ত্ব আরও বেশি সপ্রমাণ হয়ে ওঠে।

গবেষকেরা যদিও অনেক সময়েই অতিবৃহৎ এবং লোকোত্তর চরিত্রের মনের মর্ম বোঝেন না, তবুও তাঁদের নৈর্ব্যক্তিক এবং নিরপেক্ষ গবেষণার ভাবনাটুকু যেহেতু অসার নয়, তাই চৈতন্যের বাল্যলীলা সূত্রের মধ্যে তাঁদের হস্তাবলেপটুকু মেনে নিতেই হবে। গবেষকের ভাবনা থেকে একথা বলাই যেতে পারে যে, চৈতন্যচরিতকারেরা প্রধানত যেহেতু কবি, অতএব তাঁর এই বাল্যচাপল্যের ব্যাখ্যাও অন্যরকম হতে পারে। বারবার এটা দেখা গেছে যে, বিরাট এবং লোকোত্তর জীবনের বর্ণনায় একটা 'ট্রান্সফর্মেশন'-এর ঘটনা কাজ করে এবং সেখানে ভবিষ্যতের মহত্তম ভাবের প্রতি-তুলনায় তাঁর বাল্যজীবনটুকু এমন ভয়ংকর ছন্নছাড়া

তথা বিপরীত তুচ্ছতায় তৈরি হয়। গঙ্গার ঘাটে বয়োঃজ্যেষ্ঠ মানুষের গায়ে জল ছেটানো, ঠাকুরের নৈবেদ্য খেয়ে নেওয়া বা শিবলিঙ্গ উঠিয়ে নিয়ে যাবার ঘটনা-পরম্পরাকে আমরা কেউ অসভ্যতাও বলতে পারব না, বড়োজোর গ্রাম্য দুষ্টুমি বলতে পারি, কারণ চৈতন্য তখন নিছকই বালক। এমনকী এইসব ঘটনা খানিকটা মনুষ্যোচিতভাবেই বাস্তব হতে পারে, কেননা এই সেদিন স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বজীবনেও আমরা অনুরূপ চাপল্য দেখেছি। অতএব চৈতন্যচরিতকারের সমস্ত বর্ণনাটাই অতিরঞ্জন বলব না। বরঞ্চ বলব—ভবিষ্যতের ভাবগম্ভীর জীবনের ছায়ামাত্র চৈতন্যের পূর্বজীবনে ছিল না এবং 'ট্রান্সফর্মেশন'-এর তত্ত্বটা সেইখানে বেশ ভালোই খেটে যায়।

বাল্য বয়সে চৈতন্যের মধ্যে যে চপলতা এবং দুষ্ট স্বভাব দেখা গেছে, চরিত-গ্রন্থগুলিতে তারই সচেতন বিস্তার ঘটেছে চৈতন্যের যৌবনসন্ধি পর্যন্ত, তাঁর ছাত্র এবং অধ্যাপনার কাল পর্যন্ত। পরবর্তী জীবনে যিনি তৃণাদপি সুনীচ এবং তরুর মতো সহিষ্ণুতার চরম উপদেশ দেবেন, তিনিই কৈশোর-যৌবন অবধি যে অসহিষ্ণুতা এবং অহংকারের পরিচয় দিয়েছেন, সেটাকেও কিন্তু তাঁর ভাবী মহত্তমতার বিপরীত কোটিতে স্থাপন করা যায় এবং হয়তো সেটার মধ্যেও খানিকটা বাস্তবতা আছে। এই জীবনের বৃহদংশ অথবা কিয়দংশ নিশ্চয়ই চরিতকারদের অনুভববেদ্য প্রমাণ, কেননা পূর্ব যৌবনের অহংকার এবং আত্মস্ফীতির বিপরীতে তাঁর উত্তর-যৌবনের দৈন্যবোধ, নম্রতা এবং প্রেমভক্তির ভাবোল্লাস আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বলেই হয়তো চরিত-গ্রন্থগুলিতে এমন বিপ্রতীপ ঘোষণা। চৈতন্য-চরিতামৃত-এর কবির কথামতো যদি একটু 'তটস্থ' হয়ে বিচার করি, তবে এটা বলতেই হবে যে, সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনে বিশ্বম্ভর নিমাইয়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে গেলে তৎকালীন নবদ্বীপের সামগ্রিক বিদ্যাচর্চার বাস্তব প্রবণতাগুলি আগে বুঝতে হবে এবং সেই আলোকে বিশ্বম্ভরের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিদ্যা-বিলাসটুকুও বুঝে নিতে হবে।

বৃন্দাবন দাসের ভণিতা মান্য করে এটা আমরা মেনেই নিয়েছি যে, বিশ্বম্ভর বাল্যকালে অত্যন্ত দুষ্টু ছিলেন এবং সে দুষ্টামি অনেকটাই সভ্যতাবিগর্হিত। একইরকম ভাবে তাঁর অধ্যয়ন-কালটাও যদি বিচার করে দেখি, তবে সেটাও তাঁর দুষ্টুমির মতোই উপভোগ্য বস্তু। আজকেও যে ছেলে স্কুল পালিয়ে ক্রিকেট খেলতে যায়, তার সঙ্গে বালক বিশ্বম্ভরের কোনও পার্থক্য ছিল না। পড়াশোনার সঙ্গে গঙ্গার

ঘাটে দুষ্টুমি যুগপৎ চলছিল। বাবা-মাকে তেমন কিছু ভয় পান না তিনি, শুধু অগ্রজ বিশ্বরূপকে দেখলে তিনি একটু নিয়ন্ত্রিত থাকেন। দাদা বিশ্বরূপের প্রকৃতি কিছু গম্ভীর ছিল। তিনি শাস্ত্রচর্চা নিয়ে থাকতেন এবং সংসারে খানিকটা নির্বিণ্ণ। বিশ্বরূপ অদ্বৈত আচার্যের গৃহে যেতেন এবং গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের ভক্তিপর ব্যাখ্যা শোনাতেন অদ্বৈত-গৃহে সমবেত মানুষজনকে। চৈতন্য সেখানে মাঝে-মাঝে যেতেন দাদাকে ডেকে আনার জন্য। তখন তাঁকে একটু নম্র দেখায়। আচার্য অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের অতুলনীয় চেহারা দেখে মোহিত হতেন, যদিও তখনও তিনি নিতান্তই বালক। অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'শঙ্করারণ্য' নামে পরিচিত হলেন, কিন্তু এই সন্ন্যাসের ফলে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে যে প্রতিক্রিয়া হল, সেটা একদিকে যেমন কুমার বিশ্বম্ভর-নিমাইকেও প্রভাবিত করল, তেমনই তা পিতা জগন্নাথ মিশ্রকেও একইভাবে আকুল করে তুলল।

ঘরের মধ্যে যে ছেলে নিত্য বিচরণ করত, সে সংসার ত্যাগ করে বৈরাগী হয়ে গেছে—এই দুঃখ স্নেহময় পিতা-মাতাকে এতটাই বিমর্ষ করে তুলেছিল যে, অতিচপল অনুজ বিশ্বম্ভর পর্যন্ত সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে ঘরে থাকতে আরম্ভ করলেন। লেখাপড়াতেও যেন তাঁর অধিক মন বসল এবং যতটা পারেন, তিনি তখন জনক-জননীর কাছে থেকে তাঁদের স্নেহপোষণ করেন। দুষ্টতা এবং চাপল্যের পরিবর্ত হিসেবেই লেখাপড়ায় যতটুকু মনোযোগ দিলেন তিনি, তাতেই একদিন মিশ্র জগন্নাথ ভয় পেলেন এবং স্ত্রী শচীদেবীর সামনে স্বামী-জনোচিতভাবে আদেশ জারি করে বললেন—আমি আমার বড়ো ছেলেকেও পড়াশোনা করতে দেখেছি। শাস্ত্রচর্চা তাকে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীতে পরিণত করেছে। শেষে শাস্ত্রচর্চা করে আমার এই ছোটো ছেলেটিও যদি বিবাগি হয়ে যায়, তার চেয়ে এই ভালো—এ ছেলের পড়াশোনা করার কোনো দরকার নেই। মূর্খ হয়ে থাকুক, তবু ঘরে থাকুক এই ছেলে—মূর্খ হই পুত্র মোর রহুমাত্র ঘরে। স্নেহবিদ্ধ পিতা সমাজ, সংস্কার এবং পরম্পরা—কিছুই চিন্তা করলেন না। পুত্র বিশ্বম্ভরকে ডেকে তিনি মানা করে দিলেন—আজ থেকে তোমার পড়াশোনা বন্ধ। ঠিক এইরকম একটা জায়গায় তৎকালীন নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চা তথা সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং সেখানে একটি গৃহবধূ পর্যন্ত কতটা সচেতন ছিলেন, সেকথাটা বলে নিতেই হবে।

একথা তো ছোটোবেলা থেকেই সকলে পড়েছে এবং আমিও পড়েছি। চৈতন্যদেবের কথা, কী মধ্যযুগীয় গৌড়বঙ্গের ইতিহাস উচ্চারিত হলেই সেই এক

কথা—সেকালের নবদ্বীপ বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। ছাত্র এবং শিক্ষক শুধু এইটুকু মাত্র জানে, কিন্তু এই বিদ্যাচর্চার বহর যে কতটা ছিল, সেটা অনেকের ধারণার বাইরে। আমার দুঃখ হয়—বঙ্গদেশের বিদ্যাচর্চার ধারা নিয়ে এখনও পর্যন্ত তেমন গ্রন্থ লেখা হয়নি। বঙ্গদেশের যত প্রাচীন পুঁথি ছিল, সংরক্ষণের অভাবে এবং পণ্ডিত ঘরের মূর্খ ছেলের কল্যাণে সেসব পুঁথির অন্তর্জলি যাত্রাও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে পণ্ডিত-গবেষকেরা—যেমন দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, রাধাকুমুদ মুখার্জিরা—এঁরা যথোচিত চেষ্টা করে গেছেন, তাই দুটো কথা এখনও বলতে পারছি।

বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গৌরাঙ্গের জন্মভূমি নবদ্বীপ চরম জায়গায় ওঠে রঘুনাথ শিরোমণির সময়ে। নব্যনারায়চর্চার ক্ষেত্রে এমন ধুরন্ধর পণ্ডিত তখন দ্বিতীয় ছিলেন না। কিন্তু ঘটনা হল—রঘুনাথ শিরোমণি চৈতন্যদেবের বেশ কিছু আগে জন্মেছেন; বরঞ্চ বলা যায়—রঘুনাথ শিরোমণি যখন মৈথিল পক্ষধরের পক্ষশাতন করে নদিয়ার গুরু-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, তখনও পর্যন্ত চৈতন্যের শৈশবকাল অতিক্রান্ত হয়নি। অনেক মহলে এমন প্রবাদ চালু আছে যে, চৈতন্যদেব, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এবং স্মার্ত রঘুনন্দন তিনজনেই নবদ্বীপের বিখ্যাত অধ্যাপক বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন। এই প্রবাদের প্রধান জনক হলেন বিখ্যাত নুলো পঞ্চানন, যিনি অবশ্য ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী মানুষ নন কোনো ভাবেই। নুলো পঞ্চানন তাঁর বিখ্যাত বাংলা পদ্যে লিখেছেন—'বাসুদেবের তিন শিষ্য চৈয়ে রঘোদ্বয়'। 'চৈয়ে' মানে চৈতন্যদেব, তৎকালীন শতাব্দীর মৌখিকতায় তিনি 'চৈয়ে', আর 'রঘোদ্বয়' হলেন রঘুনাথ শিরোমণি এবং স্মার্ত রঘুনন্দন। সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুক সাহেব আবার এই তিনজনের সঙ্গে তান্ত্রিক-শিরোমণি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকেও বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র হিসেবে কল্পনা করেছেন। বস্তুত এই চারজনের মধ্যে একমাত্র রঘুনাথ শিরোমণি ছাড়া আর কেউই যে বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন না, এ কথা দীনেশ ভট্টাচার্যের গবেষণায় সম্পূর্ণ প্রমাণ হয়ে গেছে।

চৈতন্য যখন নিতান্ত শিশু, তখন রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপের সারস্বত সমাজের সূর্যের মতো কিরণ বিকিরণ করছেন। চৈতন্যের চরিতগ্রন্থকারেরা কেমন করে এই সারস্বত-সাধনার ধারা উপেক্ষা করেই গ্রন্থ শেষ করেছেন—এই তর্ক উঠলে আমার মতো অধমের বারবার একথা মনে হয়—এই অদ্ভুত ক্ষমতা চৈতন্যপন্থীদের আছে—তাঁরা চৈতন্য-কথাতেই এতটা আকুল ছিলেন, যাতে নব্যন্যায়ের কূট

তর্কধারার গৌরব উপেক্ষা করাটা তাঁদের পক্ষে আশ্চর্য নয়। চরিতকারেরা চৈতন্যের ছাত্রভাব বর্ণনা করবার সময় তাঁর বিদ্যাকুশলতার যতই গৌরব করে থাকুন, বালক বিশ্বম্ভরও এই কঠিন কূট বিদ্যাচর্চার মধ্যে প্রবেশ করেননি। তার কারণ নিশ্চয়ই এই নয় যে, এই বিশেষ বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অক্ষমতা ছিল, বরঞ্চ কারণ হয়তো এই যে, অত পড়াশোনা করতে তাঁর ভালো লাগত না। চরিতকারদের বয়ানেও যেমনটি আছে, তাতে ছাত্রাবস্থায় চৈতন্যের বিদ্যাচর্চায় যত অভিনিবেশ দেখা যাচ্ছে, তার চেয়ে কোনো মতে পড়াশোনা শেষ করে গঙ্গার ঘাটে এসে সমবয়সিদের সঙ্গে কোন্দল করাটা অনেক বেশি প্রিয় মনে হচ্ছে—এবং সেটা কার 'মাস্টার' কত ভালো এই বিষয়ের বিবাদ।

প্রথম বয়সে প্রভু স্বভাব চপল।
পড়ুয়াগণের সহ করেন কোন্দল।।
কেহ বোলে তোর গুরু কোন্ বুদ্ধি তার।
কেহ বোলে এই দেখ আমি শিষ্য যার।।
এইমত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি।
তবে জল ফেলাফেলি তবে দেয় বালি।।
তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে।
কর্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহ মারে।।

অথচ নবদ্বীপে পড়াশোনার অবস্থাটা তখন এমন ছিল না মোটেই। একথা সঠিক প্রমাণ দিয়েই বলা যাবে যে, চৈতন্যের আর্বিভাবের একশো বছর আগে থেকে নবদ্বীপে ভীষণ রকমের বিদ্যাচর্চা আরম্ভ হয়েছিল। চৈতন্যের জন্মস্থান থেকে খুব দূরে নয় সেই নবদ্বীপে বিদ্যানগর জায়গাটা এখনও আছে। পোড়ামাতলা পিছনে রেখে বুড়ো শিবতলা ছাড়িয়ে আরও খানিকটা গেলেই বিদ্যানগর গ্রাম এবং সেটা নবদ্বীপের মধ্যেই। এই গ্রামে থাকতেন বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি—তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের ছোটো ভাই। দুই ভাই-ই ন্যায়শাস্ত্রের চরম পণ্ডিত। তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের ওপর টীকা লিখে দুই ভাই-ই তখন ভারত বিখ্যাত। এঁদের মধ্যে বাসুদেব সার্বভৌম চৈতন্যজন্মের আগে অথবা তাঁর শিশু অবস্থায় নীলাচল পুরীতে গিয়ে উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কিন্তু বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি নবদ্বীপে থেকে যান। পণ্ডিতেরা বলেন—চৈতন্যজন্মের পূর্বে, তখনও যখন হুসেন শাহ বাংলার মসনদে বসেননি, সেই

সময়ে হাবসী-অধিকারের ডামাডোল চলছিল। নবদ্বীপে 'রাজভয়' উপস্থিত হওয়ায় বাসুদেব সার্বভৌমের সমস্ত বাড়িটাই গোলেমালে পড়ে যায়। সার্বভৌমের পিতা মহাপণ্ডিত নরহরি বিশারদ নবদ্বীপের আবাস ছেড়ে বৃদ্ধ বয়সে কাশী চলে যান এবং বাসুদেব সার্বভৌম পুরীতে। কিন্তু সার্বভৌমের ছোটো ভাই গৌড়ে থেকে যান এবং নবদ্বীপেই থেকে যান আর দুই ভাই কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিরিঞ্চি এবং চণ্ডীদাস বিদ্যানন্দ। এসব কথার প্রমাণ মিলবে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে।

নবদ্বীপে 'রাজভয়' কথাটা অতীব সত্য, তার প্রমাণ ইতিহাস থেকেই দেওয়া যাবে, কিন্তু অনেক গবেষকই মনে করেন যে, বাসুদেবের অন্য তিন ভাই 'রাজভয়' থাকা সত্ত্বেও নবদ্বীপে থেকে গেলেন, অথচ চার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যাবিত্তম বাসুদেব সার্বভৌম পুরীতে চলে গেলেন কেন? গবেষকদের ধারণা—হুসেন শাহের পূর্বকালে 'রাজভয়' কিছু অসম্ভব বস্তু নয়, কিন্তু সার্বভৌমের পুরী গমনের কারণটা হয়তো তাঁর শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির উত্থান। রঘুনাথ তাঁর শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থে বহু জায়গায় গুরু সার্বভৌমের মত খণ্ডন করেছিলেন এবং এসব খণ্ডন-দূষণ হয়তো মৌখিকভাবে বহুত্রই চলছিল নবদ্বীপের বিদ্যাকেন্দ্রগুলিতে। নিজের গৌরবকালেই হঠাৎ নিজের শিষ্যের সারস্বত উত্থান তাঁকে স্বস্তি দিতে পারেনি, ফলে পুরীধামে গজপতি প্রতাপরুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে সার্বভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করেন।

আমাদের বক্তব্য—নবদ্বীপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির উত্থানে নব্যন্যায়চর্চার ক্ষেত্রে যে জোয়ার এসেছিল, এই জোয়ারও কিন্তু পড়ুয়া চৈতন্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণের পর গৃহের নির্বিঘ্ন পরিবেশে জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে পড়াশোনা করতে দিতে চাননি, এতে অবশ্যই বালক বিশ্বম্ভরের খুব জেদ চেপেছিল—তিনি পড়বেনই এবং নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চার পরিবেশে পড়াশোনার এই আগ্রহও খুব স্বাভাবিক ছিল। বৃন্দাবন দাস ন্যায়চর্চা নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামালেও একথা স্পষ্ট লিখেছেন যে, যত বিদ্বানই হোন না কেন, যিনি নবদ্বীপে পড়েননি, তিনি বিদ্যার সরসতাই বোঝেন না—নবদ্বীপে পড়িলে সেহ বিদ্যারস পায়। পরিবেশটা এমনই ছিল যে, পুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হওয়ায় বিষণ্ণ জগন্নাথ মিশ্র যখন বালক বিশ্বম্ভরের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন, তখন সমান বিধ্বস্তা এক গৃহবধূ হিসেবে জননী শচীমাতা পর্যন্ত প্রতিবাদ করেছিলেন।

তাঁর যুক্তিটা ছিল সাংঘাতিক। তিনি বলেছিলেন—ছেলে যদি মূর্খ হয়, তবে তার বিয়ের জন্য নবদ্বীপে কেউ মেয়ে দেবে না এবং পড়াশোনা না করলে মূর্খ পুত্রের জীবন তো বিড়ম্বনা—শচী বোলে মূর্খ হইলে জীবেক কেমনে। মূর্খেরে তো কন্যাও না দিবে কোন জনে।।

বাংলার ইতিহাসের মধ্যযুগে একজন গ্রাম্য কুলবধূর মুখে এই কথাবার্তা বুঝিয়ে দেয় যে, নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার প্রগতি কতদূর পৌঁছেছিল। শচীমাতার এই আর্ত ক্রন্দন অবশ্য সাময়িকভাবে জগন্নাথ মিশ্রের বিষণ্ণতা প্রশমিত করতে পারেনি। জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্ন্যাসে তিনি এতটাই আঘাত পেয়েছিলেন যে, তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল—অতিরিক্ত পড়াশোনা এবং শাস্ত্রচর্চা আরও একটি সন্ন্যাসের ঘটনা ঘটাবে তাঁর ঘরে। কুমার বিশ্বম্ভর পড়াশোনা যা করেছিলেন, তার মধ্যে অভিনিবেশ কতটা ছিল তা তিনিই জানেন, কিন্তু পিতার আদেশে লেখাপড়া বন্ধ হওয়ায় তাঁর জেদ চেপে গেল। তাঁর দুষ্টুমি এবং অভব্যতা চরমে পৌঁছল—অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারসভঙ্গে। পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু সঙ্গে।। নিজের বাড়িতে এবং পরের বাড়িতে নানান অভব্যতা এবং অপচয় ঘটিয়ে তিনি এর প্রতিবাদ করতে লাগলেন। রাত হয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফেরার নাম করেন না। অতিস্নেহে পিতা-মাতাও তাঁর সমস্ত উপদ্রব সহ্য করে যেতে লাগলেন। কিন্তু সমস্ত কথায়, সমস্ত অপকর্মের মধ্যে বালক বিশ্বম্ভর তাঁর অন্তরের এই জেদটুকু প্রকাশ করতে লাগলেন যে, লেখাপড়া করতে না দেবার কারণেই তাঁর মাথাটি দিনে দিনে শয়তানের কারখানা হয়ে উঠেছে।

সেকালে অনেক বামুন-বাড়িতেই নিত্যদিন মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না হত। একদিনের হাঁড়ি অন্যদিন ব্যবহার হত না এবং ব্যবহৃত হাঁড়িটি উচ্ছিষ্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় নিতান্তই বর্জ্য বলে গণ্য হত। স্মার্ত পণ্ডিতদের তাড়নাই হোক অথবা রাঢ় এবং গৌড়বঙ্গের লোকাচারই হোক, পাক করা ভাতের উচ্ছিষ্টমাখা হাঁড়ি চরম বর্জ্য এবং সেই কারণেই নিতান্ত অস্পৃশ্য বলে গণ্য হত। বিশ্বম্ভর নিমাই একদিন এই বর্জ্য হাঁড়ির স্তূপে গিয়ে জায়গা নিলেন। শচীমাতা তাঁকে বলে কয়ে কিছুই করতে পারলেন না এবং শুদ্ধাশুদ্ধের বিবেকবুদ্ধি জাগানোর চেষ্টা করলে, তাঁর অকাট্য যুক্তি ছিল—তোমরা আমায় পড়াশোনা করতে দিচ্ছ না, আমার এত শুদ্ধাশুদ্ধের জ্ঞান হবে কী করে—প্রভু বোলে তোরা মোরে না দিস পড়িতে। ভদ্রাভদ্র মূর্খ-বিপ্রে জানিবে কেমতে।।

পড়াশোনা করার চরম ফল যে এই ছোঁয়াছুঁয়ির জ্ঞান নয় এবং এটা নিতান্তই প্রসঙ্গত উল্লেখমাত্র, সেটা সেই অসামান্যা গৃহবধূটিও বুঝেছিলেন, যার ফলে স্বামীর কাছে তিনি পুনরায় অনুযোগ করে বলেছিলেন—পড়িতে না পায় পুত্র মনে ভাবে ব্যথা। পাড়াপড়শিরাও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শচীদেবীর পক্ষ নিলেন এবং সর্বকালের চিরন্তন মানসিকতায় বললেন—আমাদের ঘরের ছেলেরা কেউ পড়তেই চায় না, সেখানে 'ভাগ্যে সে বালক চাহে আপনে পড়িতে।' জগন্নাথ মিশ্র ঘরে-বাইরে এই চাপ এড়াতে পারলেন না। তিনি ছেলেকে নিয়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে গেলেন। এর মধ্যে অবশ্য বিশ্বম্ভর নিমাইয়ের পইতে হয়ে গেল এবং উপনয়নের পরেই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ছাত্র হিসেবে দেখা গেল নিমাইকে।

চৈতন্য-ভাগবত-এ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের যতই বহুমানন থাক, নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চার ইতিহাস বিচার করলে দেখা যাবে যে, সেখানে একেবারেই পড়াশোনার প্রাথমিক পাঠ দেওয়া হত। বৃন্দাবন দাসের বয়ান থেকেই বোঝা যায়—এটা ব্যাকরণ পড়ার জায়গা, আর ব্যাকরণ মানেই প্রথম পাঠ। সেকালের বঙ্গদেশে বিদ্যাচর্চার কী বিচিত্র পরিবেশ দেখুন—উত্তর-মধ্য-দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র প্রায় ঐতিহ্যবাহী পাণিনি-ব্যাকরণ পড়ানো হত, কিন্তু সর্ববিষয়েই ব্যতিক্রমী বঙ্গদেশে পাণিনি-পতঞ্জলির তত আমাদের সমাদর ছিল না, এখানে কলাপ-ব্যাকরণ পড়ানো হত। পাণিনির তুলনায় কলাপ-ব্যাকরণ কিছু অন্য ধরনের এবং পাণিনি-ব্যাকরণের পরিবর্ত হিসেবে সৃষ্ট হয়েছিল বলেই এই ব্যাকরণের কূটকাচালি কিছু কম ছিল না এবং নবদ্বীপে এই ব্যাকরণের ভালোই চর্চা হত। নবদ্বীপের তৎকালীন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকেরাও যেমন এই ব্যাকারণের সমাদর করতেন, তেমনই কলাপ-ব্যাকরণের পণ্ডিতেরাও অনেকে নৈয়ায়িকদের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। ফলে ব্যাকরণের চর্চাটা বেশ ভালোই হত। কিন্তু যত ভালোই হোক—ব্যাকরণ হল সমস্ত শাস্ত্রাগমের প্রথম পাঠ। বিশ্বম্ভর নিমাইকে আমরা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে বেশ কিছুদিন ব্যাকারণ পড়তে দেখেছি এবং বৃন্দাবন দাসের বয়ানে তিনি যথেষ্ট মেধাবী ছাত্র ছিলেন। গুরু যা শিক্ষা দিচ্ছেন, বিশ্বম্ভর তা মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলছেন—এই আলোকসামান্য মেধাবিত্বে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, কিন্তু এই মেধাবিত্বও পড়ুয়া বিশ্বম্ভরকে কোনো স্থিরতা দেয়নি, বিদ্যা তাঁকে অনেকটাই অহংকারী করে তুলেছে।

সংস্কৃতের বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠে তর্কযুক্তির একটা জায়গা আছে বরাবর। ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র এবং সাংখ্য-যোগ-বেদান্ত তথা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সর্বত্রই এক

ধরনের বাক্‌বিতণ্ডা চলতে পারে। একজন পণ্ডিত যে ব্যাখ্যা করছেন, তার মধ্যে দোষ বার করে পণ্ডিতকে নিষ্প্রমান করে দিয়ে অন্য যুক্তি দিয়ে নিজের যুক্তি স্থাপন করা অথবা নিজের যুক্তি নিজেই কেটে দিয়ে অন্য যুক্তিতে নিজেকে পুনঃস্থাপন করা—এগুলি শাস্ত্রের বিতণ্ডায় সুবিদিত পন্থা। কিন্তু বিশ্বম্ভর-নিমাইকে দেখছি—তিনি তাঁর গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের প্রতিপক্ষতা করে তর্ক-যুক্তির মাধ্যমে তাঁর মত খণ্ডন করছেন এবং আবারও সেটা পুনঃস্থাপন করছেন। বেশ বোঝা যায়—চৈতন্যচরিতকার ছাত্র বিশ্বম্ভরের অসাধারণ মেধা প্রকট করার জন্য গুরু গঙ্গাদাসকে একটু খাটো করে ফেলেছেন—

গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন।।

কিন্তু চরিতকারের এই ভাবনা কিছু আশ্চর্য নয়। আশ্চর্য হল, বিশ্বম্ভরের চরিত্র। তিনি তাঁর ব্যাকরণের তর্ক-যুক্তি দিয়ে তাঁর সমস্ত সতীর্থকে অস্থির করে তুলেছেন। নিজেকে অপ্রতিরোধ্য প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁর শেষ আশ্রয় কিন্তু সেই গঙ্গার ঘাট। টোলের পড়া শেষ হলেই তিনি গঙ্গার ঘাটে যাবেন। সমবয়সি অন্য গুরুর ছাত্রদের সঙ্গে তিনি তর্ক জুড়বেন এবং যাচ্ছেতাই ভাবে তাঁদের হেনস্থা করবেন। সেই সঙ্গে গঙ্গাস্নানের অসভ্য ব্যবহারটুকুও কিন্তু বাদ যাচ্ছে না। এত হুলাহুলি করে পড়ুয়া সকল। বালি কাদাময় সব হয় গঙ্গাজল।। তাঁর পাণ্ডিত্যের দুষ্টুমিও একটি মাত্র গঙ্গার ঘাটে আবদ্ধ থাকত না। তিনি সাঁতার দিয়ে-দিয়ে বিভিন্ন মধ্যাহ্ন-স্নানের ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং তত্রস্থ স্নানার্থী ছাত্রদের বিদ্যা পরীক্ষা করে দেখতেন, জিজ্ঞাসা করতেন বৃত্তি-পঞ্জী-টীকার শুদ্ধি। না পারলে বলতেন—আমাকেই জিজ্ঞাসা করো—জিজ্ঞাসা করহ বুঝি কার কোন বুদ্ধি! বৃত্তি-পঞ্জী-টীকার কে জানি দেখি শুদ্ধি।।

পয়ারের ওই তিনটি শব্দ—বৃত্তি-পঞ্জী-টীকা—এগুলি সাধারণের জানা থাকার কথা নয়। শ্লোক বা কারিকার আকারে শাস্ত্রবিশেষের সংক্ষিপ্ত বিস্তারকে বলে বৃত্তি। কারিকার পদ ভেঙে আলোচনাকে বলে পঞ্জী বা পঞ্জিকা আর টীকা হল বিস্তারিত আলোচনা— টীকা নিরন্তর ব্যাখ্যা পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা—বলেছেন হেমচন্দ্র। নবদ্বীপে চৈতন্যের সময়ে যে কলাপ-ব্যাকরণের প্রসার হয়েছিল, তা এই শব্দগুলি থেকে আরও প্রমাণ হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বকালেই পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর নামে কলাপ-ব্যাকরণের এক ধুরন্ধর পণ্ডিত নবদ্বীপে বিদ্যাস্থানগুলি উল্লেখ করে দিয়ে

গেছেন; এমনকী বিশারদ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো নৈয়ায়িকের বাড়িতেও কলাপ-ব্যাকরণের ভালোরকম চর্চা ছিল। এই পরম্পরা চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তিনি কলাপ-ব্যাকরণের বৃত্তি-পাঁজি-টীকা ভালোরকম রপ্ত করেছিলেন বলেই মনে করি।

অবশ্য ব্যাকরণের এই বিদ্যাটুকু পড়ুয়া চৈতন্যকে যতটুকু অভিনিবিষ্ট করেছিল তার চেয়ে বেশি তাঁকে চঞ্চল এবং অহংকারী করে তুলেছিল, নইলে চরিতকার বৃন্দাবন দাস একথা বলতেন না যে—সবারে চালেন প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া। 'চালেন' কথাটা এখনকার ভাষায় বলা যায় 'চ্যালেঞ্জ' করা। আর কুমার বিশ্বম্ভর সকলকে 'চ্যালেঞ্জ' করতেন 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করে। এই শব্দটাও সাধারণের অজানা। আমার প্রথম বয়সে যখন এদিকে-ওদিকে প্রচুর সংস্কৃত পুঁথি ঘেঁটেছি এবং তা নবদ্বীপেও প্রচুর ঘেঁটেছি—তখন মাঝে মাঝে এই ধরনের পুঁথি হাতে পড়ত—যার ওপরে কোনও বিশিষ্ট পণ্ডিতের নামে লেখা থাকত—'অমুক দেবশর্মার ফক্কিকা'। পুঁথির অজ্ঞতায় 'ফক্কিকা' দেখেও যখন আনন্দ লাভ করছি, তখন একদিন আমার পুঁথিপাঠের গুরু প্রবাল সেন বললেন—ওসব হল গিয়ে ফাঁকি, এসব পুথির কোনও অভিনবত্ব নেই, মৌলিকতাও নেই। জিজ্ঞাসা করলুম—তাহলে কী এগুলো? যত্ন করে তো এসব পুঁথি ঘরে পুষেছেন পণ্ডিতেরা। তিনি বললেন—এগুলো হল লোকঠকানো প্রশ্ন এবং তার নিজস্ব সমাধান। বাক্-বিতণ্ডায় পরপক্ষকে ধূলিসাৎ করার জন্য অনেক পণ্ডিতই ঘরে বসে নিবিষ্ট মনে 'ফাঁকি' তৈরি করতেন।

'ফাঁকি' শব্দটা অদ্ভুত। ভাবতে অবাক লাগে, এই শব্দের উৎপত্তি হয়েছে চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে। আমাদের তো ধারণা—এই শব্দ বাংলাতেই ছিল মুখেমুখে, সেই শব্দের সংস্কৃতায়ন ঘটানো হয়েছে 'ফক্কিকা' শব্দের প্রয়োগ করে। কে জানে—ফক্কিকা এবং ফক্কর, ফাঁকি এবং ফাঁকের মধ্যে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। পুঁথি ঘাঁটার সময় দেখেছি ন্যায়, ব্যাকরণ, বেদান্ত, এমনকী স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনাতেও প্রতিপক্ষ-শাতনের জন্য 'ফাঁকি' তৈরি হয়েছে পণ্ডিত মহলে। কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বৃত্তি-পঞ্জী-টীকা-রচনার গম্ভীর পথ পরিত্যাগ করে সমবয়সি ছাত্রদের শুধু ঠকিয়ে দেবার জন্য 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করছেন—এটা তাঁর যৌবন-গন্ধী বয়সের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিশ্বম্ভর নিমাইয়ের বালকোচিত দৌরাত্ম্যের সঙ্গে বিদ্যার অহংকার আমাদের কাছে কোনো আশ্চর্যের ঘটনা নয়। এমনকী অধ্যাপনার সময়েও তাঁর যে মূর্তি এবং

স্বরূপ চরিতকারেরা বর্ণনা করেছেন, তাও খুব আশ্চর্য নয়। খুব লৌকিকভাবেও যদি দেখি, তবে এ কথা মানতেই হবে যে, উপনয়ন সংস্কারের পরপরই চৈতন্যের পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং এই পিতৃহীন পুত্রটির সমস্ত অত্যাচার তাঁর জননী শচীদেবী মুখ বুজে সয়েছেন। ঘরের শাসন বিশ্বম্ভর নিমাইয়ের ওপর ক্রিয়া করেনি। অধ্যয়নের সঙ্গে চাঞ্চল্য এবং দৌরাত্ম্যের সমানাধিকরণ ঘটে যাওয়ায় তৎকালীন চতুরতায় অন্যের বিদ্যবত্তার ফাঁকিটুকু তিনি সহজে বুঝতেন, কিন্তু বিদ্যার অভিনিবেশ তাঁকে ব্যাকরণশাস্ত্রের বাইরে নিয়ে আসেনি এবং সমসাময়িক কালের বিদ্যার চরম উৎকর্ষ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন—সে দিকেও তিনি পদসংক্রমণ করলেন না। মাঝে-মাঝে তাঁর গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের মুখে এই উচ্ছ্বাস শুনেছি যে, বিশ্বম্ভর বড়ো ভালো ছাত্র, ইচ্ছে করলেই তিনি 'ভট্টাচার্য' হতে পারেন—

গুরু বোলে বাপ তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি বলিলাঙ দৃঢ়।।

সেকালের নবদ্বীপে ভট্টাচার্য উপাধি লাভ করাটা ন্যায়শাস্ত্রের বিদ্যাবত্তার ওপরেই নির্ভর করত। মহাপ্রভু ন্যায়শাস্ত্র পড়েননি এবং পড়ার আগ্রহও প্রকাশ করেননি কখনও। গুরু গঙ্গাদাস যে উচ্ছ্বাস এবং আক্ষেপ একইসঙ্গে প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর শিষ্যের বুদ্ধিমত্তার ওপর বিশ্বাসটা প্রকাশ পায়, কিন্তু বিশ্বম্ভর সে পথে যাননি। আপন গুরু ছাড়াও অন্য সাধারণ মানুষদেরও বিশ্বম্ভরের ওপর এই আস্থা ছিল যে, তিনি এক সময় ন্যায়শাস্ত্রের দিকপাল পণ্ডিত হবেন, তাঁদের এই আস্থার কথাও বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করেছেন—

কেহ বোলে এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে।
ভট্টাচার্য হয় তবে তখন না নড়ে।।

কিন্তু এত পড়াশোনা, এত কূট তর্কজাল বিশ্বম্ভর-নিমাই পছন্দ করতে পারেননি। এত পড়াশোনা তাঁর ভালো লাগেনি। এর জন্য তাঁকে কথাও শুনতে হয়েছে অনেক। অন্য পণ্ডিতেরা তর্কারম্ভেই তাঁকে এই কথাটা শুনিয়ে নিতেন। ন্যায়-বৈশেষিক, পূর্বোত্তর মীমাংসা দর্শনের তুলনায় ব্যাকরণ যে নেহাতই 'শিশুশাস্ত্র' অথবা 'বাল্যশাস্ত্র'—এ কথা অধ্যাপক বিশ্বম্ভরকে শুনতে হয়েছে বহুবার—

ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম।।

ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ।।

নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক পণ্ডিতের মুখে কলাপী বৈয়াকরণকে যে এসব কথা শুনতে হবে, সেটা তৎকালীন নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চার নিরিখে খুব স্বাভাবিক, কিন্তু বিদ্যাচর্চার এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তাঁর পছন্দ হয়নি। 'ভট্টাচার্য' হয়ে ওঠার মধ্যে পদে পদে যে হেতুবাদিতা কাজ করে, নিরন্তর যে তর্কস্রোত—পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্র—এগুলি তাঁর আবেগস্ফুরিত হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর ন্যায়চর্চা সম্ভাবনা নিয়ে লিখেছেন—'মহাপ্রভুর লৌকিক শিক্ষা ব্যাকরণ শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া যায় নাই এবং তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়েন নাই, বৃন্দাবন দাস স্পষ্টাক্ষরেই তাহা লিখিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস তদানীন্তন অধ্যাপক মণ্ডলীর শীর্ষ স্থানীয় 'ভট্টাচার্য' সম্প্রদায়ের মর্যাদার চিত্র প্রসঙ্গক্রমে যেটুকু অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, তাঁহারা স্বতন্ত্র পথের যাত্রী—তাঁহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিজালাবৃত তর্ককর্কশ চিত্তে মহাপ্রভুর কীর্তনধ্বনি প্রবেশ করে নাই।'

মহাপণ্ডিত দীনেশচন্দ্রের এই বক্তব্যের মধ্যে 'ভট্টাচার্য'-দের প্রতি স্তুতি ব্যক্ত হল, নাকি মহাপ্রভুর স্তুতি ব্যক্ত হল—সেকথা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু স্বতন্ত্র পথের যাত্রী কারা? যেখানে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই ভট্টাচার্য হওয়ার দিকে ঝুঁকছেন, সেখানে প্রখর বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও শুধু কলাপ-ব্যাকারণ পড়ে নির্মোহে বসে থাকাটাই তো স্বতন্ত্রতা। বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের বিদ্যাসমাজের উল্লেখ করতে গিয়ে এই গড্ডালিকার চিত্র এঁকেছেন—

যদ্যপিহ নবদ্বীপে পণ্ডিত সমাজ।
কোট্যর্বুদ অধ্যাপক নানাশাস্ত্ররাজ।।
ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র বা আচার্য।
অধ্যাপনা বিনা কারো আর নাহি কার্য্য।।
যদ্যপিহ সবেই স্বতন্ত্র সবার জয়।
শাস্ত্রচর্চা হৈলে ব্রহ্মারেহ নাহি সয়।।

ভট্টাচার্য-চক্রবর্তীদের এই মহাসমারোহে বিশ্বম্ভর-নিমাই সামিল হননি। তিনি 'শিশুশাস্ত্র' ব্যাকরণ পড়েই যথাসাধ্য পাণ্ডিত্য বিকিরণ করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বুঝেছেন—পাণ্ডিত্যের পথ তাঁর জন্য সৃষ্ট হয়নি। উলটো করে বলতে গেলে—মহাপ্রভুই স্বতন্ত্র পথের যাত্রী। তাঁর হৃদয়ের অনন্ত আনন্দধারার

মধ্যে ভট্টাচার্য-চক্রবর্তীদের তর্ককর্কশ সূক্ষ্ম যুক্তিজাল প্রবেশ লাভ করেনি। তিনি নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র পথে যাত্রা করেছেন। অধ্যাপনা-কালের শেষ পর্বেই তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে গেছে। অধ্যয়নকালে তাঁর মধ্যে যে দৌরাত্ম্য দেখেছি, অধ্যাপনার প্রথম পর্বে সেই দৌরাত্ম্যই বিস্তারিত হয়েছিল। সতীর্থ এবং সমবয়সিদের তিনি তিষ্ঠোতে দেননি। তাঁর ব্যক্তিত্বটাই এমন তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, চেনাশোনা লোকেও তাঁকে দেখলেই প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার ভয়ে পালিয়ে যেতেন। কথায় কথায় এমনভাবেই তাঁদের আটকে রাখতেন, যেন তিনি শুল্কগ্রাহক, যেন অন্যেরা শুল্ক ফাঁকি দেবার দায়ে ধরা পড়েছেন বিশ্বম্ভর-নিমাইয়ের হাতে—

সবেই বোলেন ভাই উহারে দেখিয়া।
ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া।।
কেহ বোলে দেখা হৈলা না দেখ এড়িয়া।
মহাদানী প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া।।

আমাদের মতে এগুলি বিশ্বম্ভর-নিমাইয়ের পূর্বস্থিত বাল্যচাপল্যের যৌবনগর্বী বিস্তার। চাপল্যের সঙ্গে এই গর্বমত্ততার কোনো তফাত নেই, যার জন্য সতীর্থ সমবয়সী, এমনকী অন্যমতবাহকদের সঙ্গে তাঁর সভ্যতা বিগর্হিত আচরণ। তখনও তিনি এতটাই অস্থির যে নিজের পথটি তিনি তখনও খুঁজে পাননি। এই আচরণের একটাই ব্যাখ্যা আছে আমাদের কাছে, যা কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মহামতি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এবং কী আশ্চর্য, সেখানে তিনি কী অদ্ভুত ক্রান্তদর্শিতায় চৈতন্যের কথাও বলেছেন। চারিত্রপূজায় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

'পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন তখন প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে-প্রকার সভ্যতাবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনো করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নেই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালি জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক

আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।'

চরিতকার বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের এই সুবোধ গোপাল ছেলেদের কথা জানতেন না, তা নয়। ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী, আচার্য-মিশ্রদের উচ্চাশার পরিমাণ তাঁর জানা ছিল। জানা ছিল এইসব উপাধির শেষ গম্য স্থান, যার ফলে উচ্চারিত হয়েছে সাধারণের প্রত্যাশিত সেই উচ্চাশী ঘোষণা—তারে বলি সুকৃতি যে দোলা-ঘোড়া চড়ে অথবা যিনি পণ্ডিত, তাঁর উপাঙ্গ সজ্জা—

হস্তী ঘোড়া দোলা লোক অনেক সংহতি।
সম্প্রতি আসিয়া হৈলা নবদ্বীপে স্থিতি।।

বিশ্বম্ভর-নিমাই এপথে হাঁটলেন না। তৎকালীন নবদ্বীপের চূড়ান্ত বিদ্যাগুলি তিনি হেলায় পরিহার করে গেলেন। পড়লেন না বেদান্ত, পড়লেন না ন্যায়, শুধু 'শিশুশাস্ত্র' ব্যাকরণ পড়ে লোকের পরিবাদ গ্রহণ করে গেলেন। আধুনিক গবেষকেরাও এমন পরিবাদ দেন—তিনি ন্যায়-বেদান্ত পড়েননি, কেন না তাঁর পড়বার ক্ষমতা ছিল না। আমরা বলতে পারব না, তাঁর ক্ষমতা কতটুকু ছিল অথবা ছিল না, কিন্তু এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি চৈতন্যদেব ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী হলে বড়োজোর আর একটা রঘুনাথ শিরোমণি কিংবা সার্বভৌম ভট্টাচার্য তৈরি হতেন, কিন্তু যে মানুষটার জন্য সংস্কৃত-বাংলার সাহিত্যে নবজাগরণ সৃষ্টি হল, যে মানুষটার জন্য বাংলার জাতি-বর্ণ-দীর্ণ সমাজ কয়েকশো বছরের আগাম সংস্কার লাভ করেছিল, তিনি ভট্টাচার্য-চক্রবর্তীদের মাথায় বসে গেছেন—পণ্ডিত থেকে আপামর জনসাধারণ তাঁকে মনে রেখেছে, ভট্টাচার্য-চক্রবর্তীরা পড়ে আছেন কালজীর্ণ পুস্তকের পাতায়, অস্মরণে অমননে।

৩

শতাব্দীর ঊর্ধ্বে উঠে যারা কাজ করেন, তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, প্রতিভা এবং আবেগ তো অবশ্যই অনুমানযোগ্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খুব লৌকিকভাবেই একথা মনে রাখতে হবে যে, চৈতন্য মহাপ্রভু কোনো 'আপস্টার্ট' ভুঁইফোঁড় মানুষ নন, বঙ্গদেশের ইতিহাস তাঁর জন্ম দিয়েছে। বঙ্গের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি এবং সমাজ তাঁর উৎপত্তি ঘটিয়েছে আপন প্রয়োজনে, কিন্তু সেই পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের যে আমূল রূপান্তর ঘটেছিল, সেইখানে কাজ করেছে চৈতন্যের ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র। একথা একবারও বলছি না যে, চৈতন্য মহাপ্রভুই প্রথম বঙ্গদেশে হরিভক্তির সর্বাশ্লেষী মহিমার কথা বলেছেন। একথা বলছি না, কারণ নানান বিচিত্র গবেষণা তা বলে না। আমরা একথা বলতে পারি না যে, চৈতন্যই বঙ্গীয় সমাজটাকে একা হাতে সংস্কার করে দিলেন, কেন না সেই সংস্কারের উপযুক্ত বীজগুলি বিপ্রতীপভাবে এই সমাজের মধ্যেই উপ্ত ছিল। কিন্তু চৈতন্যের ক্ষমতাটা কোথায়—তিনি তাঁর সমাজের আভ্যন্তর যন্ত্রণাগুলি নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার প্রশমন ঘটিয়েছেন শাস্ত্রপ্রবর্তিত পরিধির মধ্যে থেকেই, তাঁকে বাইরে থেকে কিছু আমদানি করতে হয়নি। রাষ্ট্রের কথাটাই আগে বলি।

চৈতন্যদেব যে সময় নবদ্বীপে জন্মেছিলেন (১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে) সে সময় বাংলায় মুসলমান রাজত্ব চলছে। বঙ্গদেশে স্বাধীন হিন্দু রাজাদের রাজত্ব লক্ষ্মণ সেনের আমলেই শেষ হয়ে যায়। লক্ষ্মণ সেনের সামরিক শক্তি যে খুব অকিঞ্চিৎকর ছিল, সে কথা অনেক পণ্ডিতই মনে করেন না, কিন্তু সে শক্তি উৎখাত করতে বিজেতা পাঠান বক্তিয়ার খিলজির সময় লাগেনি। সমসাময়িক মুসলমান গ্রন্থগুলি অনুসারে গৌড়ের রাজধানীর ওপর বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণ ছিল এতটাই অতর্কিত যে, অন্দরমহলে খেতে বসা লক্ষ্মণ সেনকে খালি পায়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল মহলের পিছনের দরজা দিয়ে। মুসলমান আকর গ্রন্থগুলিতে লক্ষ্মণ সেনের এই কাপুরুষতার বর্ণনায় আধুনিক কিছু গবেষক অবশ্য অতিরঞ্জনের গন্ধ পেয়েছেন, সেইসব গবেষণায় লক্ষ্মণ সেনের কাপুরুষতার দায় হয়তো কিছু কম হবে, কিন্তু আশ্চর্য হল—এই বাবদে তৎকালীন অভিজাত হিন্দুসমাজের প্রতিক্রিয়া।

বস্তুত প্রতিক্রিয়া কিছু নেই। অথবা প্রতিক্রিয়া জানাতে তাঁরা ভয় পেয়েছেন। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, রাজনৈতিক পালাবদলের যে উৎপাত সাধারণ মানুষকে সইতে হয়েছিল, তার চিহ্নমাত্র সমসাময়িক অভিজাত সাহিত্যের মধ্যে ধরা পড়েনি। চৈতন্যপূর্ব এবং চৈতন্য-পরবর্তী কালের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি—সে ন্যায়শাস্ত্রই হোক কিংবা বেদান্তগ্রন্থ, কাব্যই হোক অথবা স্মৃতিশাস্ত্র—সেগুলি পড়লে পরে মনে হবে যেন এদেশে কিছুই হয়নি, কিছুই ঘটেনি, অথচ এই শাস্ত্রগুলি তৎকালীন ভদ্রসমাজের একমাত্র প্রতিবিম্ব। মুসলমান শাসকদের আমলে নবদ্বীপ দর্শন তথা নব্যন্যায়চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অথচ সেই নবদ্বীপেরই পণ্ডিত সমাজের একটি সংস্কৃত লেখাতেও বঙ্গদেশে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পালাবদলের কোনো ইতিহাস বা তেমন কোনও ইঙ্গিত নেই, লেখা নেই মুসলমান রাজাদের সম্বন্ধে তাঁদের সামান্য অসহিষ্ণুতা বা সহিষ্ণুতার কথাও।

অথচ সমসাময়িক বাংলা চরিত সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্যগুলিতে মুসলমান রাজাদের বিচার,আচার, অত্যাচার এমনকী ভালোবাসার কথাও বেশ সুষ্ঠুভাবে ধরা আছে। আমরা কি তাহলে এই অনুমান করব যে, সমকালীন অভিজাত তথা জ্ঞানী-মানী পণ্ডিত সমাজ ছিলেন অত্যন্ত নির্বিকার—হিন্দু রাজার বদলে মুসলমান শাসক বঙ্গদেশে রাজত্ব করলে তাঁদের কিচ্ছু আসত-যেত না, অথবা পাণ্ডিত্যচর্চায় তাঁদের এমনই মোহ ছিল যে, বাহ্য রাজনৈতিক জগতে কী ঘটছে না ঘটছে—এই নিয়ে তাঁদের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। বলা উচিত—আপোস, অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকেই বেশ আপোস করে চলতে জানেন। বিদ্বান বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের কাছে শাসকবর্গের ধন-মানের উপঢৌকন এমনভাবেই আসত, যাতে তাঁদের জীবনযাত্রায় কোনও বিঘ্ন ঘটত না। আর বিঘ্ন না ঘটে থাকলে ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী, মিশ্র-আচার্যেরা—পরম সমৃদ্ধ অশ্ব-গজ-যুক্ত হই। ...নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্‌বিজয়ী।।—এই বলে উদ্বাহু হতেন। এই তো সেকালের বিদ্যাসমাজের সামগ্রিক চিত্র, আর তা না হলে রূপ-সনাতনের মতো রাজমন্ত্রকে 'দবির খাস' বা 'শাকর মল্লিক' হয়ে গিয়ে মনে মানে পুড়ে মরা—এটাও অভিজাতের আশাপূরণের মন্ত্র ছিল।

আপনারা বলতে পারেন—বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। রূপ-সনাতনের মতো বিশাল হৃদয় মানুষ, যাঁরা নাকি বৈরাগ্যের কারণে এক বৃক্ষের নীচে এক রাত্রির বেশি থাকতেন না, তাঁদের সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করাটা একেবারে চরম অসভ্যতা হয়ে

যাচ্ছে। আমি বলি—রূপ-সনাতন আপনাদের কাছে যত শ্রদ্ধেয় তার চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশি এবং সেটা মৌখিকতা নয়, সেখানে আমাদের পিতা-পিতামহের ধর্ম-মর্ম ন্যাস করা আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, রূপ-সনাতন একটা উদাসীন উদাহরণমাত্র, চৈতন্যের পরিকরদের মধ্যেই কতগুলি মানুষ দেখুন—রূপ-সনাতনের ছোটো ভাই বল্লভ, চিরঞ্জীব সেন, মুকুন্দ, কেশব খান, কবিশেখর, দামোদর, যশোরাজ খান এবং আরও কত নাম বলব—এঁরা সবাই সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রিসভায় বা অন্যত্র রাজকার্য করতেন।

আমরা এটা বলছি না যে, এঁরা সব মুসলমান শাসকের তল্পিবাহক অঙ্গ-মর্দক ছিলেন, কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এবং অভিজাত তথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা, আপস না হয়ে থাকলে রাজদরবারে 'নেটিভ'দের এত চাকরি জোটে না। বলতে পারেন হুসেন শাহ বড়ো ভালো শাসক ছিলেন, যার ফলে এমন দেওয়া-নেওয়া। আমরা বলব বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র বরাবর একই রকম হয়, সমঝোতার কারণগুলোও প্রায় একই রকম থাকে—যেমন ইংরেজ আমলে; যেমন মুঘল আমলে, তেমনই সুলতানদের আমলে। এবং সবার শেষে আছে শাসিত গোষ্ঠীর আপন চরিত্র। প্রসঙ্গত বলে ফেলাই ভালো যে, জাতীয় মনস্তত্ত্বের নিরিখে বাঙালি বড়োই নমনীয় প্রকৃতির মানুষ। মোগল সম্রাট বাবুর পূর্বকথিত হুসেন শাহর ছেলে নসরৎ শাহকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের কিয়দংশের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করার স্মৃতি রোমন্থন করে বাবুরনামায় লিখেছিলেন— পরিবর্তিত যে কোনও সুলতানের প্রতিই বাঙালিরা বশ্যতা স্বীকার করে। কী আমির, কী ওয়াজির, কী সৈন্যসামন্তরা কিংবা কৃষককুল—সকলেই নতুন তথা সদ্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজার বশ্যতা স্বীকার করে।

এরপর আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে। বাঙালির চরিত্র কেন এমন হল, তার জুতসই ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে এবং তা বিচার করার জায়গা নয় এটা। যেটা বলার দরকার, সেটা হল—চৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপে জন্মেছেন, তখন সবেমাত্র বাংলার স্বাধীন সুলতানদের অন্যতম জালাল-উদ্-দিন ফতে শাহর রাজত্বকাল শেষ হচ্ছে। প্রসিদ্ধ মাহমুদ শাহী বংশের গৌরব ফতে শাহর রাজত্বকালেই শেষ হয়ে যায়, যদিও সেই গৌরবের মধ্যে হিন্দুবিদ্বেষের কলঙ্কটুকু অবশ্যই ছিল। আধুনিক গবেষকদের বিচারণায় একথা প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, বিজয় গুপ্ত যে মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন, তা আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে নয়, তা

জালাল-উদ্-দিন ফতে শাহর আমলে। বিজয় গুপ্ত অবশ্য এক হুসেন শাহর উল্লেখ করেছেন পয়ারে, কিন্তু সেই হুসেন শাহ আসলে ফতে শাহ, কেন না তাঁরও জনপ্রিয় নাম ছিল হুসেন শাহ। যাঁরা এতকাল 'ঋতু শশী বেদ শশী'-র পাঠান্তর প্রমাণ করে বিজয় গুপ্তকে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে পাঠাতে চাইতেন, তাঁরা গবেষণার প্রমাণে এতদিনে বুঝেছেন যে, 'ঋতু শূন্য বেদ শশী'-র পাঠটাই ঠিক। বিশেষত বিজয় গুপ্ত তাঁর 'হাসান-হোসেন' পালায় হিন্দু প্রজাদের ওপর মুসলমান শাসকের যে অত্যাচার বর্ণনা করেছেন, তা জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল*-এর বয়ানের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় ফতে শায়ের কালটা আরও সপ্রমাণ হয়ে ওঠে। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়কে এই বিষয়ে প্রায় অকাট্য মনে হয়।

জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যজন্মের পূর্বসময়ে নবদ্বীপে মুসলমান শাসকের অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। খেয়াল করুন, চৈতন্যদেব জন্মেছেন ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে এবং আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দের শেষে অথবা ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে। ফলে এই অত্যাচার ঘটেছে মাহমুদ শাহী রাজত্বের শেষ ভাগে ফতে শাহর সময়েই। কথাটা এর আগেও আমরা জানিয়েছি—জয়ানন্দ লিখেছেন—বাসুদেব সার্বভৌম রাজভয়ে নবদ্বীপ ছেড়ে উৎকলে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্র তাঁকে বরণ করে নিয়েছিলেন। এখানে জয়ানন্দের তথ্যে একটাই ভুল আছে এবং সেটা হল—উৎকলে তখনও প্রতাপরুদ্র রাজা হননি; তবে ওড়িশায় তখন গজপতিদের শাসনই চলছিল এবং হয়তো তাঁর বাবা পুরুষোত্তম দেবের আমলে সার্বভৌম গজপতি রাজার প্রসাদ লাভ করে থাকবেন। জয়ানন্দের বয়ানে প্রতাপরুদ্রের নাম এসেছে চৈতন্যদেবের সঙ্গ সাম্যে।

জয়ানন্দ তাঁর অসাধারণ ইতিহাসভেদী বুদ্ধিতে এটা খুব ভালো করে বুঝেছিলেন যে, বঙ্গদেশের মুসলমান রাজাদের কর্তৃত্ব অবশ্যই তাঁদের বিপরীতধর্মী হিন্দু প্রজাদের মনের মধ্যে একটা চিরন্তন সংশয়ের জন্ম দিয়েছিল এবং সেটা তিনি স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েই বলেছিলেন—'ব্রাহ্মণে-যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।' কিন্তু এ শুধু পারস্পরিক সংশয় নয়, মাঝে-মাঝে বিসংবাদ নয়, হঠাৎই এক চরম অত্যাচার নেমে এসেছিল নবদ্বীপে। জয়ানন্দ লিখেছেন—সে এক কঠিন সময় নেমে এসেছিল নবদ্বীপে এবং তা এসেছিল এক মিথ্যা গুজবকে কেন্দ্র করে। গুজবটা উঠে এসেছিল নবদ্বীপের কাছে 'পিরল্যা' গ্রাম থেকে। এখানে সুলতানের

কাজিরা বসবাস করতেন বোধহয় এবং তাঁদের কিছু ধর্মোন্মাদনাও ছিল বোধহয়। এখান থেকেই গৌড়েশ্বর যবন রাজার কানে গুজব এসে পৌঁছল যে—গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ রাজা হবে। এটা যে মিথ্যা রটনা এবং রটনার শক্তি অনেক সেটা জয়ানন্দ স্পষ্ট জানিয়েছেন—

গৌড়েশ্বর বিদ্যমান দিল মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপে বিপ্র তোমার করিল প্রসাদ।।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাণ হব পাছে।।

এই মিথ্যাবাদ বা গুজব যে রটেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত-এ চৈতন্য যখন সদ্যোজাত শিশু, তখন তাঁর কোষ্ঠী বিচার করে তাঁর মধ্যে 'মহারাজ লক্ষ্মণ' দেখতে পেলেন তাঁর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী। তিনি তাঁর সময়ের পূর্ববাদ স্মরণ করে বললেন—গৌড়ে এক ব্রাহ্মণের রাজা হবার কথা। হয়তো ভবিষ্যতে এই কথাটাই প্রমাণ হবে এই শিশুর মাধ্যমে—

বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে।
বিপ্র বোলে সেই বা জানিব তাহা পাছে।।

নীলাম্বর চক্রবর্তী চৈতন্যদেবের মাতামহ। একজন মাতামহ তাঁর নিজের সময়ের লোকবাদ উচ্চারণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন এবং কথাটা জয়ানন্দের বয়ানের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। শিশু চৈতন্যের জন্মলগ্নের এই ভবিষ্যদ্বাণীতে চৈতন্যপ্রভুর কোনও ক্ষতি হয়নি, কারণ চৈতন্যভাগবত-এ ঈশ্বরসম্ভাবনায় ওই পূর্বশ্রুত লোকোক্তি উচ্চারিত হয়েছে ভবিষ্য-পাঠক মাতামহের মুখে, আর জয়ানন্দ এই লোকোক্তি এবং মিথ্যাবাদের ফলশ্রুতি দেখিয়েছেন ঐতিহাসিকতার উচ্চারণে এবং সেকথা চৈতন্যপূর্বকালের নায়কোপম কতকগুলি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের নামোল্লেখে যথেষ্ট প্রামাণিক বলে মনে হয়। বিশেষত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত মুসলমান শাসকের অত্যাচার বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে কথিত 'হাসান-হোসেন' পালার মধ্যে সমর্থিত হওয়ায় আরও নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, নবদ্বীপে শাসকগোষ্ঠীর এই অত্যাচার ঘটেছিল জালাল-উদ্-দিন ফতে শাহ ওরফে হোসেন শাহের আমলেই। অর্থাৎ এই হোসেন শাহ চৈতন্য-সমকালীন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নন, তিনি ফতে শাহ—যাঁর রাজত্বের শেষ পর্বে চৈতন্য জন্মলাভ করেছিলেন।

বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চার ইতিহাসে দীনেশ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন যে, একমাত্র জয়ানন্দ ছাড়া আর কেউ এমন সঠিকভাবে লেখেননি যে, প্রখর নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি চৈতন্যজন্মের পূর্বেই 'ভট্টাচার্য-শিরোমণি' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। জয়ানন্দের এই বর্ণনায় যদি ঐতিহাসিকতা থাকে, তবে চৈতন্য পূর্বকালে যে হঠাৎই একদিন মুসলমান অত্যাচার নেমে এসেছিল নবদ্বীপে সেটাই বা মিথ্যা হবে কেন! সুখময় মুখোপাধ্যায় এই অত্যাচারের উপাদান—গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজার জনশ্রুতি ব্যাখ্যা করার সময় অনুমান করেছেন যে, গৌড়বঙ্গের সারস্বত সমাজে যে বিরাট অভ্যুদয় ঘটেছিল, সেখানে ব্রাহ্মণেরাই প্রধান ভূমিকা নেওয়ায় এই জনশ্রুতির সৃষ্টি হয়েছিল। এটা ঠিকই যে বাসুদেব সার্বভৌম বা রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র হওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে তখন প্রচুর ব্রাহ্মণ পড়ুয়ার আগমন ঘটছিল নবদ্বীপে। লক্ষ্য করে দেখুন, চৈতন্যের সময়েও এই ছাত্রধারার প্রশমন ঘটেনি—

প্রতিদিন দশ-বিশ ব্রাহ্মণ-কুমার।
আসিয়া প্রভুর পায়ে করে নমস্কার।।
পণ্ডিত আমরা পড়িবাঙ তোমা স্থানে।
কিছু জানি হেন কৃপা করিবা আপনে।।
ভাল ভাল হাসি প্রভু বোলেন বচন।
এইমত প্রতিদিন বাড়ে শিষ্যগণ।।

নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার এই বাড়বাড়ন্ত এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মর্যাদার বহুশ্রুতি রাজনিযুক্ত কাজিদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করেছিল এবং হয়তো সেই কারণেই ফতে শাহের কাছে তারা মিথ্যাবাদ রটনা করে দেয় যে, সবাই বলছে—এবার গৌড়ের রাজা হবে এক ব্রাহ্মণ এবং তাঁর হয়ে অস্ত্র ধরবে হিন্দু প্রজারা—

নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ময় প্রজা।।

কথাটা মুসলমান শাসকের মনে ধরল। এর দশ বছর আগেই রাজা গণেশ বিভিন্ন মুসলমান শাসকের কম ভোগান্তি ঘটাননি। সেই দুর্দিন যদি আবার ফিরে আসে, সেই স্মৃতিতেই নদিয়া নগরীর ওপর অত্যাচার নেমে এল—নদিয়া উচ্ছন্ন করো রাজা আজ্ঞা দিল। রাজার পেয়াদারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ধরে ধরে মারধর আরম্ভ করল। কেউ মারা গেল, কারও বা জাতি গেল, ধর্মান্তর গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর রইল না। যার গলায় পৈতে, যার কপালে বিষ্ণুর স্মারক তিলকচিহ্ন তাদের কারও

ঘরদোর লুঠ হয়ে গেল, রাজবন্দি হয়েও শুধু প্রাণে বেঁচে রইলেন কেউ কেউ। মন্দির-দেউল ভাঙা পড়ল অনেক, উপড়ে ফেলা হল সাধারণ গৃহস্থ ঘরের পূজার প্রতীক তুলসী গাছ—

দেউলে দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী।।

জয়ানন্দের এই বিবরণের সঙ্গে বিজয় গুপ্ত বর্ণিত 'হাসান-হোসেন' পালার কোনও পার্থক্য নেই। হাসান হোসেন দুই ভাই, হোসেন হাটি গ্রামে 'কাজিয়ালী' করে। তাদের সামনে কোনও 'হিন্দুয়ালি' রীতিতে চলা চলবে না। হোসেনের শ্যালকের নাম 'দুলা' সে এমনিতে হালদার—বোধহয় অনেকগুলি হাল-লাঙলের মালিক। সে তাঁর জামাইবাবুদের চেয়েও অত্যাচারে দড়। হাসান-হোসেন যাবার আগেই যে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছয় এবং যার মাথায় সে 'তুলসীর পাত' দেখতে পায়, তাকেই সে কাজীর কাছে নিয়ে যায়। বামুনের গলায় পৈতে থাকলে, তারও রেহাই নেই, হয় সে গাছে বাঁধা অবস্থায় মার খায়, নয়তো তার পৈতে ছিঁড়ে 'থুথু দেয় মুখে'। বিজয় গুপ্ত দুঃখ করে বলেছেন—মুসলমান শাসকের কাছে হিন্দুরা নিতান্তই 'পর' মানুষ, অতএব মার তো খেতেই হবে—

পরের মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা।
চোপড় চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা।।

মানুষজন সকলেই বিশেষত উচ্চ শ্রেণির ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা যে এই অকথ্য অত্যাচারের ভয়ে সিঁটিয়েছিলেন, সেকথা বিজয় গুপ্তও বলেছেন জয়ানন্দের মতো করেই। ঠিক একইরকম একটা আচম্বিত রাজভয় সৃষ্টি হবার পরেই বাসুদেব সার্বভৌম নবদ্বীপ ছাড়েন এবং গৌণ কারণ হিসেবে নিজশিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির উত্থানও হয়তো কাজ করেছে। সার্বভৌমের ভাই বিদ্যাবাচস্পতি নবদ্বীপের মানুষ হলেও তিনি গৌড়ের রাজধানীতে থাকতেন অথবা কাছেই বাস করতেন রামকেলি গ্রামে। অতএব তাঁর অত ভাবনা ছিল না। নবদ্বীপে রঘুনাথ শিরোমণি তখন সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অতএব সর্বজনমান্যতার কারণে তাঁরও অসুবিধে হয়নি নবদ্বীপে থাকতে। বাসুদেব সার্বভৌমের আর দুই ভাই বিদ্যাবিরিঞ্চি এবং বিদ্যারণ্য নবদ্বীপেই থেকে গেছেন, হয়তো তাঁদের অন্যত্র যাবার উপায় ছিল না। ঘটনা হচ্ছে—নবদ্বীপে এঁদের থেকে যাওয়া বা সার্বভৌমের প্রস্থানের খবরটা খুব বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল—চৈতন্যজন্মের অব্যবহিত পূর্বকালেই নবদ্বীপে এই অত্যাচার নেমে

এসেছিল এবং সেখানে প্রাণবধের কথা তেমন যুক্তিযুক্ত না হলেও জাত মেরে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা অনেক ঘটেছিল। বিজয় গুপ্তের কাজির বয়ানও তাই—

হারামজাদা হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান।।
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা।
এড়া রুটি খাওয়াইয়া কবির জাতিমারা।।

জালাল-উদ্-দিন ফতে শাহর এই অত্যাচার অবশ্য বেশিদিন চলেনি, যেভাবেই হোক—অন্তত স্বপ্নে দেখা কোনো চণ্ডীমূর্তির ভয়ে অবশ্যই নয়—ফতে শাহ তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন নিশ্চয়। নিশ্চয় বুঝেছিলেন যে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবার ব্যাপারটা একেবারেই গুজব এবং তাঁর অত্যাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার পরিবেশও তৈরি হয়েছিল আবার এবং তা চৈতন্য মহাপ্রভুর নিজের কাল পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে। ফতে শাহ কিন্তু খুন হয়ে যান তাঁর বিশ্বস্ত দাসের হাতেই।

ফতে শাহর মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসন দখল নিয়েই এত ডামাডোল চলে যে, গৌড়ে বা নবদ্বীপে তেমন সমস্যা কিছু হয়নি। ফতে শাহের পর হাবশী রাজারা কেউ তিন বছর, কেউ এক বছর—এইভাবে শাসন চালান। এভাবেই চলে প্রায় ছয় বছর এবং তার পরেই গৌড়ে সুলতান হয়ে বসেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। হুসেন শাহকে ঐতিহাসিকেরা অনেকে 'বঙ্গদেশের আকবর' নামে চিহ্নিত করেছেন। চৈতন্যদেবের জন্মের উৎসব শেষ হতে না হতেই ফতে শাহর রাজত্বকাল শেষ হয়ে যায় এবং তাঁর বাল্যকাল শেষ হতে না হতেই চারজন হাবশী রাজার রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। চৈতন্যের আট-নয় বয়স থেকেই গৌড়বঙ্গে তেমন কোনও অপশাসন তো চলেইনি বরঞ্চ এক সুস্থ রাজার শান্ত শাসনের আবহ তৈরি হয়ে গেছে।

হুসেন শাহ গৌড়বঙ্গের সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং কৌশলী সুলতান। রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর রাজত্বকালে অনেকটাই শান্তি নেমে আসে সমস্ত গৌড়বঙ্গে, নবদ্বীপে তো বটেই। ইসলাম ধর্মের পোক্তা হিসেবে তিনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যথেষ্ট উদার ছিলেন কিনা, অথবা তিনি তাঁর নিজস্ব ইসলামীয় গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠে রাজকার্য চালাতেন কিনা সেকথায় পরে আসছি। কিন্তু অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, চৈতন্য যখন তাঁর বাল্য-কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে উপনীত হচ্ছেন, তখন

নবদ্বীপে এমন কোনো রাজনৈতিক সমস্যা ছিল না, যাকে 'রাজভয়' বলা চলে। অর্থাৎ নিমাই-বিশ্বম্ভর যখন তাঁর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জীবন অতিবাহিত করছেন, অথবা সে জীবন ছেড়ে যখন তিনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন, তখন নবদ্বীপের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল অন্য ধর্মীর অধিকারে থাকলেও তা সুস্থ ছিল। ফলত অন্য অনেক কিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলেও চৈতন্যকে কোনও রাজনৈতিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়নি। এটা চৈতন্যের পক্ষে বাড়তি পাওনা ছিল।

রাজনীতির হানাহানি না থাকাটা একটা পাওনা বটে, তবে সেই পাওনাটা মোটেই নিরুপদ্রব ছিল না, নিরুপাধিকও নয় মোটেই। ইতিহাস এমনই এক বস্তু যেখানে কখনও একটা 'ফ্যাক্টর' কাজ করে না। সমাজ, ধর্ম, ভৌগোলিক স্থিতি, মানব-তত্ত্ব সবই সেখানে এমন ইতস্তত জড়িয়ে আছে যে, অভ্যুদয়ী পুরুষকে সেখানে বড়ো সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হয়। চৈতন্যের চলার পথে রাজনীতি ছাড়াও আরও সহস্র প্রতিকূলতা ছিল, সেই প্রতিকূলতাগুলিকে তাঁকে অনুকূল করে তুলতে হয়েছে আপন ব্যক্তিত্বের বিভূতিতে। চৈতন্য যেহেতু প্রধানত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা, অতএব যে সমাজ এবং ধর্মকে নিজের অনুকূল করে তুলতে হয়েছিল তাঁকে, সেই সমাজ এবং ধর্মকে নিজের কথাই আগে বলতে হবে, বস্তুত সেখানেই তাঁর সুবিধে এবং অসুবিধে দুইই লুকিয়ে আছে।

প্রথমেই একথা বলে নেওয়া ভালো যে, বঙ্গদেশে বেদ এবং ব্রাহ্মণের খুব সরস-কোমল বিচরণভূমি ছিল না কোনও কালেই। সেসব অকথা-কুকথা না হয় নাই বললাম, যখন সংস্কৃতে স্মার্ত শ্লোক বাঁধা হয়েছিল এই মর্মে যে, অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গে যদি কেউ তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য ছাড়া এমনি-এমনি যায় তবে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়বঙ্গের আর্যায়িত হবার আকাঙ্ক্ষা এবং ওদিক কার কান্যকুব্জী ব্রাহ্মণদের 'এক থেকে বহু' হবার প্রয়োজন—এই দুয়ের সঙ্গতে বাংলায় ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটতে থাকে। বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলপঞ্জি ঘাঁটলে দেখা যাবে যে, মহারাজ আদিশূর, যিনি অষ্টম খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে কনৌজ থেকে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নিয়ে এসেছিলেন। অন্য মতে একাদশ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গের বর্মন রাজা শ্যামল বর্মা তাঁর শকুন-সত্র সম্পন্ন করার জন্য গুটিকতক ব্রাহ্মণ এদেশে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদের বংশধরেরাই নাকি পাশ্চাত্য বৈদিক। চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রও কিন্তু সেই বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ।

কুলপঞ্জিগুলির ঐতিহাসিকতা তেমন নেই বটে, কিন্তু এইসব কাহিনির মধ্য দিয়ে লোকস্মৃতির একটা ঐতিহাসিক ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা অবশ্য ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা শিলালিপি এবং তাম্রশাসনগুলি পরীক্ষা করে বলেছেন যে, বঙ্গদেশে ইতস্তত ব্রাহ্মণদের আমদানি হতে থাকে গুপ্তযুগের শেষ পর্যায় থেকে। দিনাজপুর, পুণ্ড্রবর্ধন, ফরিদপুর এমনকী ত্রিপুরায় পর্যন্ত নানা ব্রাহ্মণ্য যাগযজ্ঞের খবর পাওয়া যাচ্ছে, তবে ব্রাহ্মণ্য তখনও এই শ্যাম বঙ্গদেশে তত প্রসারিত এবং দৃঢ়বদ্ধ নয়। বরঞ্চ পণ্ডিত ঐতিহাসিকেরা এই কথাটাই মেনে নিয়েছেন যে, বঙ্গদেশে সেন এবং বর্মন রাজাদের ছত্রচ্ছায়াতেই ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতি ও ব্যবহার-শাসন তথা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুশাসন সর্বব্যাপী প্রসার লাভ করে এবং মাথায় রাখুন—সেন রাজারা এবং বর্মন রাজারা ঐতিহাসিক প্রমাণেই অবাঙালি ছিলেন।

সেন-বর্মন রাজাদের আমলে এই যে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রোথিত হল, তাতে এখানে একটা নব্য অভিজাত শ্রেণি তৈরি হল বটে, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম বা মধ্যদেশের কড়া-কঠিন বৈদিকতা পালনে তাঁরা অনেকটাই অক্ষম ছিলেন। ফলে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ্যও বঙ্গদেশের জল-হাওয়া অনুযায়ী তৈরি হয়ে গেল। তাতে বৈদিক যাগযজ্ঞের চেয়েও পৌরাণিক এবং স্মার্ত অনুশাসনগুলি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। আমরা লক্ষ্মণ সেনের আমলেই দেখেছি যে, রাঢ়ী এবং বরেন্দ্রী ব্রাহ্মণেরা অনেকেই পশ্চিম-মধ্য ভারতের কঠিন বৈদিকতা আর বজায় রাখতে পারছেন না। বৈদিকতার এই ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের কারণেই ভবদেব ভট্ট, অনিরুদ্ধ ভট্ট, শূলপাণি, শ্রীনাথ আচার্য, আচার্য চূড়ামণি এবং অবশেষে রঘুনন্দনের মতো স্মার্ত পণ্ডিতের বিধান অনুশাসন বঙ্গীয় সমাজের ওপর অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে। স্মার্ত বিধানগুলির অনেক অংশই যেহেতু পুরাণ-বচন থেকে সংগৃহীত, ফলে পুরাণগুলি কিন্তু প্রায় বেদের মর্যাদা পেতে থাকে। অভিজাত সমাজের ওপর এই প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়েছে দুই ভাবে।

বস্তুত পুরাণগুলির মধ্যে এক ধরণের দ্বৈতবৃত্তি আছে। স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক বচনই যেহেতু পুরাণ থেকে নেওয়া, তাই নিয়ম-আচার-ব্রত-উপবাসের অভিযোজন পর্যবসিত হল ত্রিসন্ধ্যায় স্নান-আহ্নিক-তর্পণ এবং তিলক রচনার সংকেত চিহ্নে। এমনকী স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্য যখন নবদ্বীপে অধ্যাপনায় রত, তখনও তিনি প্রিয় শিষ্যের ব্রাহ্মণ্য-আচার অতিক্রমের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তার মধ্যে সন্ধ্যা না করা এবং কপালে তিলক না থাকাটাই খুব বড়ো ত্রুটি বলে গণ্য হয়েছে। অধ্যাপনার

সময় চৈতন্যের নিজের বাড়িতে কিছু অসুবিধে ছিল হয়তো, যার জন্য তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বসে পড়াতেন। সেখানে একদিন এক ছাত্রের কপালে তিলক না দেখে তিনি যে বৈদিক কর্মকাণ্ডের উপদেশ দিচ্ছেন—তা সন্ধ্যা-আহ্নিক ছাড়া অগ্নিষ্টোম, অগ্নিচয়নের মতো বৈদিক ক্রিয়াকলাপের নির্দেশ করে না। মহাপ্রভু তাঁকে দেখে বলেছেন—

প্রভু বোলে—কেনে ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে কি যুক্তি ইহার।।
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান-সদৃশ বেদে বলে।।
বুঝিলাঙ আজি তুমি নহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা।।
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পড়িবার।।

ছাত্রের প্রতি চৈতন্যের এই নির্দেশটিকে খুব একক বা একদেশীয় ঘটনা বলে না ভাবাই ভালো। পঞ্চদশ/ষোড়শ খ্রিস্টাব্দে এটাই বঙ্গদেশের আসল চেহারা। একাদশ খ্রিস্টাব্দে 'বালবলভীভুজঙ্গ' ভবদেবভট্ট যেসব স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করছেন, তার মধ্যেই পুরাণগুলিকে তেমন আমল দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু বঙ্গদেশে সেন রাজবংশের উত্তরকালে মুসলমান আক্রমণের পর যখন নব্যন্যায়ের মতো নব্যস্মৃতির সূচনা হচ্ছে, তখন কিন্তু তাঁদের গ্রন্থগুলিতে বিচার্য বিষয়গুলি বৈদিক কর্মকাণ্ডের পূর্বমীমাংসাঘটিত বিষয়গুলির চেয়ে পূজা, পার্বণ, তিথিতত্ত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং সেটা অবশ্যই পুরাণগুলির উত্থান সপ্রমাণ করে। আমাদের কাছে আরও আশ্চর্যের ঘটনা হল—আপনারা চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বসময়টুকু দেখুন। চৈতন্যের আর্বিভাব ঘটছে পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে আর বঙ্গীয় নব্যস্মৃতির জনক আচার্য শূলপাণি জন্মেছেন ওই একই খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে। কিন্তু শূলপাণির বিভিন্ন রচনার তালিকা ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে তাঁর লেখা স্মার্ত নিবন্ধের মধ্যে একদিকে যেমন তিথি, প্রায়শ্চিত্ত, শুদ্ধাচার এবং বিভিন্ন ব্রত-পার্বণ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তেমনই তাঁর লেখার মধ্যে দুর্গোৎসবের বিষয়ে অন্তত দুটি গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে, উপরন্তু পাওয়া যাচ্ছে কৃষ্ণের দোলযাত্রাবিবেক এবং রাসযাত্রাবিবেক।

এতদ্দ্বারা দুটি তর্ক প্রমাণিত হচ্ছে—প্রথমত, বিশাল বৈদিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যাগযজ্ঞের বিভিন্ন কল্প, তিথি মাহাত্ম্য-ব্রতমাহাত্ম্যের মাধ্যমে প্রতিপূরিত হচ্ছে এবং তাতে শুধু অভিজাত ব্রাহ্মণসম্প্রদায়েরই পালনীয় বিধি থাকছে না, সমাজের তথাকথিত হীনাংশও কিন্তু এই সরলীকৃত ব্রাহ্মণ্য আচারের আওতায় চলে আসছে। দ্বিতীয়ত, দুর্গাপূজার পালনীয়তা প্রসঙ্গে একদিকে যেমন ব্যক্তি দেবতা হিসেবে দুর্গাদেবীর উত্থান ঘটছে, তেমনই দোলযাত্রা, রাসযাত্রা নিয়ে গ্রন্থ রচিত হওয়ায় এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, চৈতন্যের পূর্বকালেই ভগবান কৃষ্ণ বঙ্গদেশের জনমানসে যথেষ্ট প্রিয়-পরিচিত দেবতা হয়ে উঠেছেন। এবং এত যে তিথি, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত অথবা এত যে ব্রত, নিয়ম, দেবতা-পূজন-বিধি—এগুলির প্রমাণ উঠে আসছে পুরাণগুলি থেকে। আর কে না জানে যে, স্ত্রী-শূদ্র এবং হীনাচার ব্রাহ্মণ, যাঁরা বেদে অধিকার পেতেন না, তাঁদের পক্ষে পুরাণগুলিই ছিল প্রধান অবলম্বন। চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে বেদব্রাহ্মণ্যের এই তথাকথিত অবক্ষয় অবশ্যই এক নতুন পথের সম্ভাবনা জুগিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এটাও মনে রাখতে হবে যে, নব্য স্মৃতির সমুদয়ে বেদ এবং ব্রাহ্মণ্য ক্রমে ক্রমে পৌরাণিক ব্রত-নিয়ম-তিথি-শুদ্ধির দ্বারা প্রতিপূরিত হতে থাকলেও সমাজের অভিজাত ব্রাহ্মণ শ্রেণির কাছে অন্যতর এক প্রশস্ত পথ তখনও খোলাই ছিল এবং তা হল দার্শনিকতা। নব্যন্যায় চর্চা তো ছিলই, এবং তার সঙ্গে ছিল বৈদান্তিকতা। শঙ্করাচার্যের বেদান্ত দর্শন তখনও বঙ্গদেশের পণ্ডিতজনের মনপ্রাণ অধিকার করে আছে। পণ্ডিত-সজ্জন, অভিজাত ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডিত্যের গর্বের সঙ্গে বৈদান্তিক ভাবনাট্যকেও খুব ভালোভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন। নব্যন্যায়ের পণ্ডিতেরাও অনেকেই ধর্মাচারণের ক্ষেত্রে ব্রহ্ম-ভাবনা বা বেদান্তদর্শনকে সাধ্য বা পরম উপেয় বলে মনে করেছেন। কিন্তু এখানেও একটা দার্শনিক সুবিধে চৈতন্যের অনুকূলে কাজ করেছে। ঘটনা হচ্ছে, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত যতই যুক্তিযুক্ত হোক, অথবা ঈশ্বর বা ভগবানের রূপ শঙ্করের কাছে যতই সোপাধিক বা মায়া মনে হোক, চৈতন্যের পূর্বেই যেহেতু রামানুজ—মধ্বাচার্যের বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলি শঙ্কর মতের বিরুদ্ধে নিজেদের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, তাই এদেশে যাঁরা পণ্ডিত-বৈদান্তিক ছিলেন, তাঁরাও কিন্তু শঙ্করের নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মকে সাকার সবিশেষ কৃষ্ণ-ভগবানের সঙ্গে একাকার করে তুলেছিলেন। এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ মিলবে—সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বয়ানে। চৈতন্যের সঙ্গে দেখা

হওয়ার পূর্বকালে তিনি অবশ্যই বৈদান্তিক ছিলেন কিন্তু চৈতন্য-পূর্বকালে বাসুদেব সার্বভৌম একটি স্বরচিত টীকায় পরম ব্রহ্মকে নিরাকার নিরাভাস বলা সত্ত্বেও সেই ব্রহ্মকে ভগবান কৃষ্ণেরই স্বরূপ বলে চিহ্নিত করছেন—অনাভাসং পরং ধাম ঘনশ্যাম মহং ভজে।

বিশিষ্ট ন্যায় গ্রন্থের মধ্যে এমন একটি শ্লোক দেখে দীনেশ ভট্টাচার্য মশায় লিখেছেন—"মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসার বহু পূর্বেই সার্বভৌমের হৃৎকমলে ঘনশ্যাম বিরাজমান ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ নূতন একটি তথ্য বটে। অনেকেই অদ্বৈত মকরন্দের টীকায় তাঁহার উৎকট অদ্বৈত মত দেখিয়া বিভ্রান্ত হইবেন; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাহ্য দার্শনিক মত বুদ্ধির বিলাসের জন্য এবং সভায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য যে ব্যক্তি অদ্বৈতমত অবলম্বন করেন, তিনিই আন্তরিক অনুষ্ঠানকালে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন।"

এই মন্তব্যের দুটি অংশই আমাদের কাছে জরুরি। তার মানে নবদ্বীপের অভিজাত দার্শনিক পরিমণ্ডলে শঙ্করের উৎকট অদ্বৈত মত তখনও যথেষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অন্যদিকে সেই অভিজাত জনের অন্তর্গত মানস-লোকে অখিলরসামৃতমূর্তি কৃষ্ণের প্রবেশও ঘটে গিয়েছিল চৈতন্যজন্মের পূর্বাহ্নেই। হয়তো এর জন্য অনেক কিছু দায়ী। বঙ্গদেশের সেন-বর্মন-চন্দ্র রাজবংশ ব্রাহ্মণ্যের অনুপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কিন্তু বৈষ্ণব ছিলেন। মনে রাখতে হবে 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' সেই রাজকবির কথা, যিনি গীতগোবিন্দ রচনা করে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবির আসনটির মর্যাদাই শুধু বাড়িয়ে দেননি, বঙ্গদেশের অভিজাত মানসে কৃষ্ণের লীলামাধুরীর বীজ বপন করে দিয়েছেন। এর সঙ্গে আছে মৈথিল বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীর মাতন—যাতে এই নদনদীসংকুল শ্যাম বঙ্গদেশের অন্তরলোক 'কালিয়া-পীরিতি'র সরসতায় সিক্ত হয়ে উঠেছিল। এইরকম একটা আবহের মধ্যে শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী তাঁর ভক্তিরস প্রোথিত করে গেছেন শান্তিপুরের প্রৌঢ় গৃহস্থ অদ্বৈত আচার্যের ঘরে—তিনি এখন নবদ্বীপে বাসা নিয়ে দশ-বিশ জন ভক্তসঙ্গী জুটিয়ে কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার আরম্ভ করেছেন। অন্যদিকে হালিশহরের ঈশ্বরপুরী তখন গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর বৃদ্ধাবস্থায় তাঁকে অন্তিম সেবা করে যাচ্ছেন, হয়তো সেটা পুরী-নীলাচল জগন্নাথে, নয়তো নবদ্বীপ থেকে আরও কাছে রেমুনায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথের স্থানে।

নবদ্বীপে তখনও বিশ্বম্ভর মিশ্র অধ্যাপনা করছেন। প্রতিদিন তাঁর টোল বসে মুকুন্দ-সঞ্জয়ের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে। পড়ানোর জন্য এতটা প্রশস্ত বড়ো জায়গা তিনি পেয়েছেন সম্ভবত এই কড়ারে যে, মুকুন্দ-সঞ্জয়ের ছেলে পুরুষোত্তমকে পড়িয়ে দেবেন বলে। এরই মধ্যে তাঁর বিবাহের বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু পিতৃহীন বালকের নানান কঠিন তথা অদ্ভুত আচরণে শচীমাতা এতটাই মনে মনে বিব্রত ছিলেন যে, পুত্রকে তিনি বিবাহের কথা মুখ ফুটে বলতে পারেননি। চরিতকারদের বয়ান শুনে মনে হয়—সেই যুগেও চৈতন্য তাঁর পত্নী নির্বাচন করেছিলেন নিজেই। এটাকে ভালোবাসার গান্ধর্ব-বিবাহ বলব না নিশ্চয়ই। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে বল্লভাচার্যের মেয়ে লক্ষ্মী এসেছিলেন গঙ্গাস্নানে, বিশ্বম্ভর গৌরাঙ্গও সেই সময়েই তাঁর অধ্যাপনার অবসানে হয়তো স্নান করতেই এসেছিলেন সেই ঘাটে—

হেন মতে দোঁহা চিনি দোঁহা ঘরে গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।।

ব্যাপারটা একদিনমাত্র ঘটেছে বলে আমাদের মনে হয় না, হয়তো কয়েকবার ঘটেছে এবং হয়তো ব্যাপারটা সেকালের দুঁদে ঘটক বনমালী আচার্যের চোখেও পড়েছে। সেই সূত্র ধরেই বনমালী একদিন শচীদেবীর ঘরে উপস্থিত হল গৌর বিশ্বম্ভরের অনুপস্থিতিতে। বনমালী ঘটক শচীদেবীর কাছে বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীর প্রসঙ্গ তুললে শচীদেবী কিন্তু পুত্রের কাছে মত না নিয়ে একটা কথাও বলতে রাজি হলেন না। বরঞ্চ তাকে হাঁকিয়ে দিয়ে বললেন—পিতৃহীন বালক আমার। জীউক পঢ়ুক আগে তবে কার্য আর।। কথাটা শুনে মনে হয়—শচীর মনে আশা ছিল যে, তাঁর পুত্র আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করবে—হয়তো সেটা ন্যায়শাস্ত্র অথবা বেদান্তদর্শন। যার ফলে বনমালী ঘটককে তিনি বলেছিলেন—আগে ছেলে বেঁচে-বর্তে থাক, আরও পড়াশুনো করুক, তবে তো বিয়ে। তা ছাড়া পুত্রের পিতৃহীনতার কথা উচ্চারণ করে হয়তো তিনি এটাও বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর ঘরে তেমন অর্থের স্বাচ্ছন্দ্যও নেই যাতে পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে।

বনমালী ঘটক চলেই যাচ্ছিলেন, বিয়ে হবে না ভেবেই তার মনের সমস্ত সরসতা চলে গিয়েছিল। কিন্তু যাবার পথে বিশ্বম্ভর গৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। বাড়িতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ঘটক গড়গড় করে সব বলে গেল। বিবাহের কথায় জননী যে তেমন গা করেননি, সেটাও বনমালী জানিয়ে দিল নবীন অধ্যাপককে। বিশ্বম্ভর গৌর নিজের ওপর জননীর অনন্ত স্নেহের কথা জানতেন

এবং সেই কারণেই ঘরে ঢুকেই এক লহমায় তাঁর মনের গতি ঘুরিয়ে নিলেন নিজের দিকে। বললেন—বনমালী ঘটক এসেছিল, তাকে তুমি একেবারেই আমল দাওনি শুনলাম। কী ব্যাপার?

বুদ্ধিমতী জননী কোনো উত্তর দেননি। তিনি পুত্রের ইঙ্গিত বুঝেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বনমালী ঘটকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জগন্নাথ মিশ্রের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না এবং পুত্র বিশ্বম্ভর গৌরাঙ্গের আমলেও সে অবস্থার পরিবর্তন খুব ঘটেনি। বল্লভাচার্যের যে কন্যাটিকে বিশ্বম্ভরের পছন্দ হয়েছে, সে বাড়ির আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। বল্লভাচার্য ঘটককে বলতে লজ্জা পেয়েছেন, কিন্তু যৌতুকের প্রতীক হিসেবে পাঁচটি হর্ত্তুকি ছাড়া তাঁর দেবার মতো ক্ষমতা কিছু ছিল না। পরে একেবারে বিবাহ-মঙ্গলের সময় জামাতা বিশ্বম্ভরকে বরণ করার পর বল্লভাচার্য যে লক্ষ্মী কন্যাটিকে তাঁর সামনে নিয়ে এসেছিলেন সেই কন্যার রূপ দেখছি—'শেষে সর্ব অলংকারে করিয়া ভূষিত'। বেশ বোঝা যায়—এই 'অলংকার' বৈবাহিক আড়ম্বরের স্তিমিত বর্ণনার মধ্যেও চৈতন্য-চরতিকারের কাব্যিক অভ্যাসবশত প্রযুক্ত। আর তা না হলে এটাই বিশ্বাস করতেই হবে যে, বরপক্ষ যাতে এতটুকু যৌতুকও না চায়, তাই আগেভাগেই বল্লভাচার্য নিজের দরিদ্র অবস্থার কথা বনমালী ঘটকের মাধ্যমে শচীদেবীকে জানিয়েছিলেন। যাই হোক বিয়ে হয়ে গেল এবং পূর্ববৎ বিশ্বম্ভরের অধ্যাপনাও চলতে লাগল—সেই সাহংকার স্বভাব এবং একে-তাকে ডেকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে তাঁর পাণ্ডিত্য বিপন্ন করা—

> সর্বদাই পরিহাসমূর্তি বিদ্যাবলে।
> সহস্র পঢ়ুয়া সঙ্গে যবে প্রভু চলে।।

৪

বিদেশি পণ্ডিতেরা বিভিন্ন লোক-সমাজের ধর্ম-চেতনা লক্ষ্য করে দুটি অসাধারণ শব্দের সৃষ্টি করেছেন—Great Tradition আর Little Tradition, শব্দ দুটি আমাদের সমাজেও সুপ্রযুক্ত। গ্রেট ট্রাডিশন হল ধর্মভাবনার মূল ধারণা যা বেদ-বেদান্ত থেকে আমাদের ধর্ম-যুক্তির মধ্যে প্রবহমান। যেমন নবদ্বীপের অভিজাত পণ্ডিতকুল বেদবেদান্তের মৌলিক ধারা বজায় রেখে অদ্বৈতবেদান্ত অথবা বড়োজোর বিষ্ণু-নারায়ণের ঐশ্বর্য মূর্তির সেবায় আবিষ্ট ছিলেন। অন্য দিকে আছে সাধারণ মানুষ—যাঁরা অভিজাত-কুলের শাব্দিক আড়ম্বরে গ্রেট ট্রাডিশন-কে স্বভাবতই ভয় পায় এবং নিজেদের মতো করেই একটা লোক-ধর্মের সংস্কার গড়ে তোলে। চরিতকার বৃন্দাবন দাস দেখিয়েছেন যে, সাধারণ মানুষ বেদ-বেদান্ত বোঝে না। তারা মঙ্গলচণ্ডীর গীত গায়, বিষহরি মনসার পূজা করে। আর উলটো দিকে ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী-মিশ্র-আচার্যদের অভিজাতকুল শাস্ত্র পড়ান বটে, কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম বোঝেন না—ব্রাহ্মণ্যের শুষ্ক আচার তাঁদের পৃথক করে রেখেছে সাধারণ মানুষের স্বকল্পিত সংস্কৃতি থেকে।

ব্রাহ্মণ্য এবং লোকসংস্কৃতির পরস্পর বিপরীত ঐতিহ্যের মধ্যে আছে 'মঝ্‌ঝিমঃ পন্থাঃ' অর্থাৎ মধ্যপন্থী ধারা। সেই ধারাটি অস্পষ্টরূপে নেমে আসছিল বৈষ্ণব-ধারণার পথে জয়দেব-বিদ্যাপতি-মাধবেন্দ্রপুরীর সরসা ভক্তির পথবাহিত হয়ে। এই ধারণার মূল প্রোথিত হয়েছিল নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্যের ঘরে। মাধবেন্দ্রপুরী তাঁকে শিখিয়ে গেছেন ভগবানের মধুর স্বরূপের কথা, যে মধুরতার পথ ধরে মানুষের সঙ্গেও পরম ঈশ্বরের প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ ঘটতে পারে, শিখিয়ে গেছেন কৃষ্ণের নাম-গুণের মহিমা, যে নামে তিনি নেমে আসেন এই মর্ত্যের ধূলিকণার মধ্যে।

নবদ্বীপের ওই উদ্যত ব্রাহ্মণ এবং মনসা-চণ্ডীর লোকাবহের মধ্যেও অদ্বৈত আচার্য একটি নিজস্ব গোষ্ঠী তৈরি করতে পেরেছিলেন। পূর্বেই জানিয়েছি যে, তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে দীক্ষা লাভ করে নবদ্বীপে অবস্থান করেছিলেন এবং তাঁর বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় নিয়মিত বৈষ্ণবসভা বসত—যেখানে চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ

কৃষ্ণভক্তিমূলক শাস্ত্রের আলোচনা করতেন এবং কুমার বিশ্বম্ভরের সেখানে যাতায়াত ছিল। অদ্বৈত আচার্যের অসম্ভব নজর ছিল এই দীপ্ত অহংকারী বালকের ওপর। তখনও পর্যন্ত বিশ্বম্ভর অদ্বৈত আচার্যের পথে আসেননি—তিনি মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে যান বটে, কিন্তু সেখানে ভক্তি-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়ে অগ্রজের স্থানও প্রতিপূরণ করেন না অথবা অদ্বৈত সভায় সহপাঠী মুকুন্দ দত্তের মধুর কৃষ্ণলীলা গান শুনেও অভিভূত হন না। আগে এই মানুষগুলি তাঁর সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ করতেন কখনও কখনও, কিন্তু তাও কেউ করে না, সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলেন। দেখা হলেই পাণ্ডিত্য যাচাই করে ফাঁকি জিজ্ঞাসা—এসব আর তাঁদের ভালো লাগে না। আর চৈতন্যও তাঁদের কৃষ্ণভক্তিরসের সঙ্গী নন তখনও, তিনি দেখা হলেই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করেন—ফাঁকি বিনু প্রভু কৃষ্ণকথা না জিজ্ঞাসে।

নিজের জন সকলেই তাঁকে এড়িয়ে চলছেন, অন্যদিকে ভট্টাচার্য, চক্রবর্তীদের দলেও তিনি নেই—হয়তো এইরকম একটা পরিস্থিতি বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। তিনিও বুঝতে পারছিলেন—কেউ কেউ তাঁকে এড়িয়ে চলছে। অদ্বৈত আচার্যের ঘরে যাঁরা কৃষ্ণচর্চা করেন, তাঁদের কেউ কেউ বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে বলেও ফেলল—এই বিদ্যার রসে আর কতদিন ভুলে থাকবে তুমি? কৃষ্ণের মাধুর্যই কিছু বুঝলে না, বুঝলে না তাঁর রূপ-গুণের মাধুর্য। সহপাঠী মুকুন্দ তাঁকে এড়িয়ে এসে অদ্বৈত আচার্যের ঘরে প্রবেশ করেন, আরম্ভ হয় কীর্তন এবং ভাগবতী কথা। এই রকমই এক দিনে অদ্বৈতের আবাসে উপস্থিত হলেন মহামতি ঈশ্বরপুরী।

সম্ভবত গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর প্রয়াণ ঘটেছে তখন এবং পূর্বাশ্রমে তিনি যেহেতু হালিশহরের মানুষ এবং বাঙালি অতএব গুরুর মহাপ্রয়াণের পর তিনি গুরুভাই অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন নবদ্বীপে। অদ্বৈত তখনও প্রত্যক্ষ চেনেন না তাঁকে, কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরী এই গৃহস্থ শিষ্যের ঠিকানা দিয়ে থাকবেন তাঁকে। স্নিগ্ধ মানুষ বটে, কিন্তু ঈশ্বরপুরী ভক্ত বৈষ্ণবের বেশে অদ্বৈতের ঘরে আসেননি। হয়তো বা গিরি-পুরী-ভারতী ইত্যাদি শঙ্কর সন্ন্যাসীর বেশই তাঁর রয়ে গেছে। অদ্বৈত আচার্য বার বার তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে অদ্বৈতকে তিনি বলছেন—আপনার চরণ-দর্শনের জন্যই এসেছি। এরই মধ্যে গায়ক মুকুন্দ দত্ত কৃষ্ণ-সম্বন্ধী গীত আরম্ভ করতেই ঈশ্বরপুরী বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে পড়লেন মাটিতে। সকলে বুঝতে পারলেন—যে বেশেই থাকুন ঈশ্বরপুরী পরম কৃষ্ণভক্ত এবং তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

নবদ্বীপের পথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে ঈশ্বরপুরীর দেখা হল। আসলে গৃহস্থ অবস্থাতেই হোক অথবা সন্ন্যাস আশ্রমে, চৈতন্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর চেহারা। চরিতকার থেকে আরম্ভ করে অন্য সমস্ত উপাদান থেকে এটা প্রমাণ হবে যে, তাঁর গায়ের রং ভীষণ রকমের ফর্সা এবং আকারে যথেষ্ট লম্বা। দশজনের মধ্যে হেঁটে গেলে তিনিই প্রথমে চোখে পড়বেন এবং তাঁকে দেখলে পরে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি সমীহ হয়, ভয় হয়—তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্বজনে। ঈশ্বরপুরী তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকেন অবাক বিস্ময়ে। জিজ্ঞাসা করেন—'কি পুঁথি পঢ়াও, পঢ়, কোন স্থানে ঘর'। পড়ুয়া শিষ্যেরা এ-কথার উত্তর দিয়ে বলল—ইনি নিমাই পণ্ডিত। ঈশ্বরপুরী নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনেছেন। বললেন—ও তুমিই সেই নিমাই পণ্ডিত। বেশ বেশ, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

সন্ন্যাসী দেখে ঈশ্বরপুরীকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর যথোচিত মধ্যাহ্নআহারের ব্যবস্থা করলেন নিমাই পণ্ডিত। খাওয়া-দাওয়া সেরে মন্দিরের দাওয়ায় বসে কৃষ্ণকথা বলতে আরম্ভ করলেন ঈশ্বরপুরী। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত খুব একটা রা কাড়লেন না। ঈশ্বরপুরী প্রথমে অদ্বৈত আচার্যের অতিথি হয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পর তিনি অদ্বৈতের আবাস ছেড়ে গোপীনাথ আচার্যের বাড়িতে গিয়ে রইলেন। গোপীনাথ আচার্য হলেন তৎকালীন বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বিখ্যাত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগিনীপতি। তাঁর বাড়িতে অবস্থান-কালে অনেকেই আসতেন ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা করতে এবং এই প্রথম বিশ্বম্ভর নিমাই-এর মধ্যে একটি মানুষের সন্ধান পাচ্ছি, যেখানে নিমাই পণ্ডিত তাঁর নিজের সমস্ত আত্মসচেতনতা নিরস্ত করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসতেন ঈশ্বরপুরীকে প্রণাম করার জন্য। এই দাম্ভিক অধ্যাপককে ঈশ্বরপুরীও কেন জানি না বেশ পছন্দ করেন এবং দাম্ভিক মানুষের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করতে হয় ঠিক সেইভাবেই নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে ঈষৎ কণ্ডূয়ণ করে ঈশ্বরপুরী একদিন বললেন—আমি 'কৃষ্ণলীলামৃত' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছি, এই গ্রন্থের মধ্যে যদি ব্যাকরণেরও কোনো দোষ থাকে, তবে আমায় শুদ্ধ করে দিলে আমার পরম সন্তোষ ঘটবে।

এই প্রথম নিমাই পণ্ডিতের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি, হয়তো বেশ কিছুদিন ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ করার ফলেই তাঁর মধ্যে এই নৈমিত্তিক পরিবর্তন এসেছে। কেননা, ঈশ্বরপুরী গোপীনাথ আচার্যের ঘরে বেশ কয়েক মাস ছিলেন

এবং নিমাই পণ্ডিত প্রতিদিন অধ্যয়ন-অধ্যাপনার শেষে সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কাছে গেছেন। পরিবর্তনের স্বরূপটাও কিছু অদ্ভুত। এই কিছুদিন আগেও তাঁর মুখের বোলচাল ছিল আমাদেরই মতো সাধারণ; নিজের ওপর অখণ্ড বিশ্বাসে তিনি বলতেন—ভালো করে ব্যাকরণের সন্ধি পর্যন্ত যে করতে পারে না, সেও নিজেকে এখন ভট্টাচার্য বলে জাহির করতে চায়—

প্রভু কহে সন্ধি কার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার।।

এই মানুষই ঈশ্বরপুরীর গ্রন্থ-সংশোধনের প্রসঙ্গে বলছেন—আপনি প্রেমীভক্ত বলে কথা, আপনি যা লিখবেন, তাতেই কৃষ্ণের প্রীতি ঘটবে। পণ্ডিত ব্যক্তি বিষ্ণু-নমস্কার করার সময় নির্ভুল সংস্কৃতে বলে—'শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' আর মূর্খ ভুল সংস্কৃতে বলে—'বিষ্ণায় নমঃ'—তাতে ফল দুরকম হয় না, ভাবগ্রাহী জনার্দন ভক্তের ভাবটুকুই গ্রহণ করেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের ভুল নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। অতএব আপনি যে কৃষ্ণপ্রেমের কথা লিখেছেন সেখানে ভুল ধরে কার এমন সাহস? ঈশ্বরপুরী নিমাই পণ্ডিতের কথায় খুশি হয়েছেন মনে-মনে, কিন্তু তাঁর কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থখানি সংশোধন করাবার ছলে, তাঁকে দিয়ে একবার পড়িয়ে নেবার ইচ্ছায় আবারও অনুরোধ করেছেন। কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থের বিচার চলল কয়েকদিন, এর মধ্যে একদিন শুধু সংস্কৃত ধাতুপ্রয়োগের সামান্য একটা দোষ উচ্চারণ করেছিলেন নিমাই পণ্ডিত, কিন্তু ঈশ্বরপুরী সে দোষ সংশোধন না করে নিজের পক্ষে ব্যাখ্যা করলেন এবং কী আশ্চর্য, অহংকারী পণ্ডিত মেনে নিলেন তাঁর তর্ক-যুক্তি।

বিশ্লেষণী বুদ্ধি প্রকট করে চৈতন্য-চরিত-গবেষকেরা বলেন যে, এই সময়ে নিমাই পণ্ডিতের বায়ু-রোগ দেখা দেয় এবং এটাই তাঁর জীবনের 'টার্নিং পয়েন্ট'। এই সময়ে তিনি খানিকটা বাতুল পাগলের মতো ব্যবহার করেছেন এবং নিজেকে ভগবত্তার স্বরূপে প্রকট করেছেন—যার চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে শ্রীবাসের বাড়িতে ভগবান দেব-সিংহাসনে অধিরূঢ় হবার পর। আমাদের মতে—এত বড়ো বিরাট পুরুষের জীবন-চর্যার আকস্মিক যে পরিবর্তন এসেছিল, তা বহিরঙ্গে খুব অস্বাভাবিক ছিল বলেই ভীষণ রকমের অলৌকিক বলে মনে হয়। কিন্তু এটাও মানতে হবে যে, তাঁর জীবন-চর্যায় ধারার মধ্যেই এই আকস্মিকতা বা অস্বাভাবিকতার বীজ ছিল। আলোকসামান্য পুরুষের এক-একটা পদক্ষেপ অনেক সময়ই খুব আকস্মিক এবং বিপরীত বলে মনে হয়, কিন্তু এঁদের শক্তি-বিভূতি

এতটাই যা ভীষণভাবে অপচয় লাভ করার মুখেও আকস্মিকভাবে বিরাট এক অভ্যুদয় ঘটিয়ে দেন। নইলে দেখুন, শৈশবের সময় নিমাই-বিশ্বম্ভর চরম দুষ্টুমিতে জীবন কাটিয়েছেন, সেকালের দিনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হবার বুদ্ধি মাথায় নিয়েও তিনি শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ে বসে রইলেন, অধ্যাপনার জীবনেও একটি ভালো গ্রন্থ রচনা করলেন না, যা সেকালের নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমাত্রেই করেছেন, তারপর হঠাৎ এল সেই আকস্মিক পরিবর্তন—সেদিন আর তিনি ঘরে থাকতে পারেননি। কৃষ্ণভক্তি সরল রাজ্যে প্রবেশ করার পথে যেটা প্রথম বাধা—অভিজাত্য, কৌলীন্য, ব্রাহ্মণ্য, আত্মমানিতা—সব ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন একদিন অকালে, অসময়ে।

সেদিন দ্বিপ্রহরের খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে গিয়েছিল, সাধারণত আবার সেই সন্ধ্যাবেলায় অধ্যাপনার কালে নিমাই পণ্ডিত পড়াতে যান মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে। কিন্তু সেদিন দিবা ভোজনের পরে নিমাই পণ্ডিতের চোখে ঘুম এল না। তিনি অসময়ে পুঁথি-হাতে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু পড়াতে গেলেন না। প্রথমে গিয়ে উঠলেন এক তাঁতির বাড়ি। তাঁতি তাঁত বোনে, তার বাড়িতে প্রচুর ধুতি-শাড়ি-কাপড়। ব্রাহ্মণ মানুষ, তায় ওই চেহারা—তাঁতি অনেক সম্মান করে নিমাই পণ্ডিতকে ঘরে বসাল। নিমাই পণ্ডিত ভালো একটা কাপড় চাইলেন তাঁতির কাছে। কাপড় এনে দিতেই দামের কথা উঠল, কিন্তু পণ্ডিত বললেন—আমার কাছে এক পয়সাও নেই। তাঁতি বলল—ঠিক আছে—তুমি দশ-পনেরো দিন পরেই না হয় দাম দিও। নিমাই পণ্ডিত বস্ত্র গ্রহণ করে উপস্থিত হলেন এক গয়লার ঘরে। তারপর গন্ধবণিকের ঘর, মালাকারের ঘর, বারুজীবী তাম্বুলীর ঘর, শঙ্খবণিকের ঘর এবং সর্বশেষে শ্রীধরের বাড়ি—যিনি বাজারে এসে থোড়-কলা-মুলো-মোচা বেচে জীবন চালান।

চরিতকার বৃন্দাবন দাস কৃষ্ণলীলার সারস্যে নিমাই পণ্ডিতের এই নগর-ভ্রমণের বর্ণনা করেছেন। ভাবটা এমন, যেন কংসবধের আগে কৃষ্ণ যেমন মথুরা-পুরীতে রজক, মালাকার, গন্ধকার—এঁদের কাছ থেকে জিনিস নিয়ে সেজেছিলেন, গৌরাঙ্গ নিমাই সেই আবেশেই যেন সাধারণ মানুষের কাছে থেকে দান নিচ্ছেন—পূর্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ। সেই লীলা করে এবে শ্রীশচীনন্দন।। আমাদের বক্তব্য, ভক্ত-চরিতকার যে-ভাবেই ঘটনাগুলি প্রকট করুন, আমরা এই ঘটনাটাকে একটু অন্যভাবে দেখি। না হয় ধরেই নিলাম—তাঁতি কিংবা মালাকার, গন্ধবণিক বা

শঙ্খবণিক কারও বাড়ি তিনি যাননি, কিন্তু নগর-অভিযানের শেষে একটি ঐতিহাসিক চরিত্র আছেন। তিনি খোলা-বেচা শ্রীধর। এই নামেই তিনি সমস্ত বৈষ্ণব-মহলে বিখ্যাত। এই দরিদ্র বাজারে-বসা মানুষটির সঙ্গে নিমাই পণ্ডিত অনর্থক ঝগড়া করতেন এবং মূল্য না দিয়ে জোর করে তাঁর বিক্রেয় দ্রব্যের ওপর ভাগ বসাতেন। এ-ঘটনা আপাতত দেখলে খুব ক্রূর মনে হতে পারে, কিন্তু খোলা-বেচা শ্রীধর আর নিমাই পণ্ডিতের অন্তরঙ্গতা এতটাই যে, আমাদের সেই ঐতিহাসিক উচ্চারণ করতে হচ্ছে যে, তীব্র অভিজাত ব্রাহ্মণ্য যা নবদ্বীপের অভিজাত শ্রেণিকে আকণ্ঠ অহংকারে ভরিয়ে রেখেছিল, নিমাই পণ্ডিত সেই ব্রাহ্মণ্যের কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর আনাগোনা চলছে সাধারণ মানুষের বাড়িতে বাড়িতে, বিশেষত দরিদ্রের ঘরে। নিম্নবর্গের মানুষগুলির সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম বাড়ছে।

আমরা জানি, চরিতকারদের বয়ান থেকেই জানি যে, পিতৃ-পিতামহক্রমে নিমাই-পণ্ডিতের ঘরে দারিদ্র্য ছিল। অধ্যাপনা করে পণ্ডিত তেমন অর্থ ঘরে আনতে পারেননি কোনোদিন, যাতে খুব তাড়াতাড়ি দারিদ্র্য-মোচন ঘটে। হয়তো অর্থলাভের উদ্দেশ্যেই তিনি বঙ্গদেশে শ্রীহট্টে গিয়েছিলেন, অর্থলাভও কিছু ঘটেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জীবন ছাড়াও এখানে যেটা বাড়তি পাচ্ছি, সেটা হল—নতুন একটা সর্বাশ্লেষী ধর্মের কথা তিনি সুস্পষ্টভাবে বলতে আরম্ভ করেছেন। তপন মিশ্র নামে যে ব্রাহ্মণটি তাঁর কাছে সাধ্য-সাধনের তত্ত্ব জানতে এসেছিল, তাঁকে তিনি শুধু 'হরেকৃষ্ণ'—নামকীর্তন করতে বলছেন। এরই সঙ্গে আছে প্রাসঙ্গিক উপদেশ—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া।।

এখানে এই 'কুটিনাটি' কথাটা খুব বড়ো একটা শব্দ। আমাদের প্রত্যেকের কাছে আচার-বিচার, শুদ্ধি-সংস্কারের একটা পরম্পরালব্ধ শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা যেমন আছে, তেমনই তার নিজস্ব উপলব্ধিজাত সংজ্ঞাও আছে। যে-কোনো ধর্মপালনের ক্ষেত্রে সেই আচার-বিচারগুলি নিশ্চেতনেও ক্রিয়া করতে থাকে এবং তারই বশবর্তী হয়ে আমরা হাত-মুখ ধুয়ে, স্নান-শুদ্ধি করে পুজো করি, সাধন করি। ভেবে দেখুন, তখন নবদ্বীপে বেদাচারের অবশেষে নব্যস্মৃতির উদয় হয়েছে, সমাজের অভিজাতশ্রেণি তাতে আবিষ্টপ্রায়। সেই স্মৃতিশাস্ত্রের বিপরীত ভূমিতে দাঁড়িয়ে এমন

একটা প্রচার যে, তুমি সব বিচার-আচার-শুদ্ধিমার্গের 'কুটিনাটি' ত্যাগ করে শুধু কৃষ্ণভজন করো এবং খেতে-শুনতে যখন ইচ্ছে হরিনাম করো—এই প্রচার একদিকে যেমন তপন মিশ্রের মতো সামাজিক ব্রাহ্মণকে তাঁর ব্রাহ্মণ্যের মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনছে, তেমনই অন্যদিকে সাধারণ নিম্নবর্গীয় দরিদ্র মানুষকে একেশ্বরবাদিতার স্বপ্ন দেখাচ্ছে—পথটাও বড়ো সহজ—শুধু হরিনাম করো—রাত্রে দিনে নাম লয় খাইতে শুইতে। তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে।।

অনেকে এমন ভাবেন, এমনকী অনেক বড়ো বিদ্বান মানুষকে আমি সভা-সমিতিতে বড়ো গলায় বলতেও শুনেছি যে, চৈতন্যদেব একজন সমাজ-সংস্কারক, তিনি এই করেছেন, তিনি সেই করেছেন ইত্যাদি। এমনকী অনেক সভায় এই বিরাট পুরুষের গায়ে সাম্যবাদের ফুরফুরে হাওয়াও লাগিয়ে দেওয়া হয়—তিনিই প্রথম মিছিল করে মুসলমান কাজীকে অনুকূলে নিয়ে আসেন, তিনিই জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে একত্রে নিয়ে আসেন ইত্যাদি। এইসব বৃহদুক্তির একটা কথাও মিথ্যে নয়, কিন্তু তার প্রক্রিয়াটা কিন্তু এই নয় যে, তিনি তৎকালীন জাতি-বর্ণ-দীর্ণ সমাজটাকে নিপুণভাবে দেখেশুনে বেশ সচেতনভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এইভাবে তিনি সমাজ-সংস্কার করবেন। আমরা যারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পরম্পরা খুব কাছ থেকে দেখেছি, চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের অন্তর্লোক যাঁদের জানা আছে এবং জানা আছে চৈতন্য-ধর্মের অগণিত রসশাস্ত্র তথা দার্শনিক গ্রন্থগুলি, তাঁরা কিন্তু চৈতন্যদেবের এই সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা একেবারেই অন্য চোখে দেখবেন।

প্রসিদ্ধ রামদাস বাবাজিমশায় হরিদাস-নির্যাতনের প্রসঙ্গে এক কলি গান গাইতেন—দেখতে আসলে দেখা দেওয়া অনুষঙ্গে হয়ে যায়, চৈতন্যদেবের সমাজ-সংস্কারের ঘটনাটাও তেমনই এক অনুষঙ্গ। তিনি সচেতন ভাবে সেটা করেননি কিন্তু অনুষঙ্গে হয়ে গেছে—তাঁর উদার ধর্মমতের অনুষঙ্গ-মাধ্যমেই সেটা হয়ে গেছে। কেমন করে যে এটা হয়, তার প্রক্রিয়াটা যে-কোনো অবতার-প্রমাণ পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য। এই যে পূর্বকালের কথা শুনে থাকি—মথুরায় কংসধ্বংস লঙ্কায় রাবণ—অর্থাৎ রামচন্দ্র বা কৃষ্ণের বিরাট ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও সেটা এমনিভাবেই খাটে। অবতারবাদের গূঢ় তত্ত্বও যদি খুব গভীরভাবে আলোচনা করা যায়, তাহলে দেখবেন—একটা রাবণ-বধ, বা একটা কংস-বধ—এগুলো ঈশ্বরাবতারের কোনো মৌলিক উদ্দেশ্যেই নয়, অন্তত মনুষ্য-অবতারের উদ্দেশ্য

তো নয়-ই। অবতার-প্রসঙ্গে গীতার সেই শাশ্বত বাণী বারবার উচ্চারিত হয়ে বটে—পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—কিন্তু সেটা একটা জাগতিক প্রয়োজন হলেও মনুষ্য অবভাবের সেটা মৌলিক উদ্দেশ্য নয়। রামচন্দ্র লঙ্কায় রাবণ-বধ করলেন, পৃথিবীতে অশুভশক্তির বিনাশ ঘটল, মানুষ শান্তি পেল—এটা রামচন্দ্রের মহিমা কিছু বাড়ায় না। কিন্তু তাঁর মতো বিরাট পুরুষ যখন পিতৃসত্য রক্ষার জন্য বনে যান, অথবা ভাই লক্ষ্মণের জন্য, বন্ধু সুগ্রীবের জন্য, এমনকী পরিণীতা পত্নীকে উদ্ধারের জন্য যে মানবিক অন্তরঙ্গতার পরিচয় দেন—সেই স্বার্থহীন লোকশিক্ষাই তথা সেই অন্তরঙ্গতাই কিন্তু রাম-অবতারের স্থায়ীভাব অথবা আধুনিক ভাষায় leitmotif।

ব্যাপারটা একটুও আড়ম্বর না করে খুব নিপুণভাবে ধরেছিলেন চৈতন্যচরিতামৃত-এর লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তিনি বলেছিলেন—আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর-মারণ। অর্থাৎ অসুর-দৈত্য মেরে ফেলাটা মনুষ্য অবতারের গৌণ কর্মমাত্র। এই যে কৃষ্ণের কথা ওঠে, তো তাঁর জীবনে যত ঘটনা ঘটছে, সেখানে ওই কংসবধ কি শিশুপালবধ এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, বরঞ্চ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই সব ঘটনা—যেখানে তিনি অধিগুণসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও রাধার প্রেমে পাগল, অতিবুদ্ধিমান অস্ত্রবীর হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সখার রথের সারথি। আর শত শত মানুষের সঙ্গে কৃষ্ণের মানবিক সম্পর্কগুলি এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যে, তাঁর নরলীলা মনুষ্য-স্বরূপই ভগবত্তার অভিব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে—কৃষ্ণের যতেক খেলা/সর্বোত্তম নরলীলা/নরবপু তাঁহার স্বরূপ।

এই নিরিখে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবনা-বিচারও আমাদের কাছে অন্যরকম। তিনি প্রধানত এক উদার ধর্মের প্রবক্তা—যে ধর্ম তাঁর অনুভবসিদ্ধ এবং যে ধর্ম তিনি নিজে সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টিকর্মটা তাঁর মতো বিরাট বিশাল ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু কোনো মতেই এ-কথা বলা ঠিক হবে না যে, সাধারণ মানুষের কষ্ট-যন্ত্রণার দিকে তাকিয়ে, তাঁদের কথা ভেবে-ভেবেই এই নূতন উদার ধর্ম তিনি সৃষ্টি করেছেন। যদি তাই হত, তাহলে ভাবুক-রসিক সাধকের চেয়ে তাঁকে রাজনীতিক বলা বেশি ভালো হত। তাঁর আটচল্লিশ বছরের জীবনে চব্বিশ বছরের গৃহস্থাশ্রম বাদ দিলে আর চব্বিশটা বছর যেভাবে কেটেছে—তাতে তাঁর ব্যক্তি জীবনের ভক্তিরসায়নটুকুই বড়ো হয়ে ওঠে —তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির প্রচার চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভক্তি এবং ভগবত্তাকে

শাস্ত্রীয়ভাবে বোধ করার প্রক্রিয়াটা তিনি এতটাই লৌকিক উপায়ে সহজ করে বুঝেছিলেন, যাতে সমাজ-সংস্কারের কাজটা অনুষঙ্গে আপনিই হয়ে গেছে। এর জন্য তাঁকে বাড়তি কোনো চেষ্টা করতে হয়নি। তাঁর ধর্মবোধ অত্যন্ত সহজ বলে সাধারণ মানুষ আপনিই তাঁর বশবর্তী হয়েছে।

ভারতবর্ষে নতুন কোনো ধর্ম অথবা নতুন কোনো দর্শন প্রস্তাবিত করার সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল পূর্ববর্তী ধর্ম এবং পূর্ববর্তী দর্শন—কেননা সর্বত্র প্রমাণ দিতে হবে শাস্ত্র থেকেই। চৈতন্য তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিতে পূর্বের শাস্ত্র-দর্শন অতিক্রম করেছেন, অথচ শাস্ত্র-পরম্পরার বাইরে তিনি পা রাখেননি। সবচেয়ে বড়ো কথা, পরম ঈশ্বর, যিনি এতদিন সকলের দূরাগত অন্তরীক্ষলোকের অধিবাসী ছিলেন, যাঁকে সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্তী কোনো অঞ্চলে জ্যোতির স্বরূপে ধ্যান করতে হত, সেই ঈশ্বরকে তিনি মথুরা-বৃন্দাবন থেকে বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকতায় তুলে এনে মানুষের মনের সঙ্গে তাঁর প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ ঘটিয়ে দিলেন। অন্যদিকে যে ঈশ্বরকে পাবার জন্য জ্ঞান, যোগ এবং সহস্র আচার গড়ে উঠেছিল, তা এক লহমায় ভেঙে পড়ল চৈতন্যের উদার সিংহনাদে—কলিযুগের একমাত্র সাধন—হরিনাম, হরিনাম এবং হরিনাম। এমন একটা সহজ সাধন-কল্পের জন্যই যে শত-সহস্র জাতি-বর্ণ-দীর্ণ সাধারণ মানুষ চৈতন্যের পিছনে এক-আকার হয়ে দাঁড়াবে—এটাই ছিল দেশ এবং সময়ের পরিণতি। সেকালের পদে-পদাবলীতে এই বিরাট অভ্যুদয় নিবন্ধ হয়েছে—ধাওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ বলিয়া।

গঙ্গার সমৃদ্ধ অঞ্চল ছেড়ে পদ্মাবতীর দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটার মধ্যে বিশাল কোনো তাৎপর্য নেই, কিন্তু নিমাইপণ্ডিতের অধ্যাপন-সৌজন্যের অন্তরালে যে মানুষগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হচ্ছে, তাঁরা কিন্তু তৎকালীন নবদ্বীপের অভিজাত সংস্কৃতির তুলনায় অনেকটাই হীন। একথা ইতিহাসের প্রমাণেই মানি যে, শ্রীহট্ট-হরিকেল অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কম ছিল না, কিন্তু পঞ্চদশ/ষোড়শ খ্রিস্টাব্দে গৌড়বঙ্গের তুলনায় সে ঐতিহ্য অবশ্যই ম্লান। আর একটা কথা—মানুষ নিজের মধ্যে যে পরিবর্তন অনুভব করে বা যে পরিবর্তন সে ঘটাতে চায়, তা স্বদেশের চিরপরিচিত ভূমিতে ঘটাতে গেলে নিজেরও কিছু অস্বস্তি লাগে, অন্যেরাও তা নিয়ে বড়ো বেশি কথা বলে। লক্ষণীয়, চৈতন্য কিন্তু তখনও জীবনের সেই অবস্থায় উপনীত নন, যখন লোকলজ্জা অথবা নিজের লাজ-ভয়, মান-অপমান সব বিসর্জন দিয়ে নিজেকে প্রকট করে তুলছেন, কিন্তু আশ্চর্য হল—জীবনের শেষ

পর্যায়ে উপস্থিত হয়ে তিনি সাধারণের উদ্দেশে যে সাধন-মন্ত্র উপদেশ করবেন, সেই হরিনাম-মহামন্ত্র কিন্তু তিনি প্রথমে উচ্চারণ করছেন পূর্ববঙ্গের অপরিচিত ভূমিতে। অর্থাৎ তিনি তাঁর বোধসিদ্ধ বক্তব্য বলতে আরম্ভ করেছেন নিজের বাহ্য কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েই এবং তা নিজের দেশে নয়, অন্য দেশে।

অন্তত এইসব ক্ষেত্রে চৈতন্য মহাপ্রভু বেশ লৌকিকভাবেই প্রমাণসহ হয়ে ওঠেন। এ-বঙ্গে এবং ও-বঙ্গে বহুতর সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটছে। এমনকী তাঁর মধ্যে থেকে একান্ত লৌকিক এবং সাধারণী বৃত্তিগুলিও তখন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়নি। বাঙাল দেশ থেকে ঘুরে আসার পর বাঙাল ভাষা নকল করে আপন ইষ্টজনের মধ্যে তিনি মজা কুড়োচ্ছেন—এ দৃশ্য তাঁকে আমাদের মতোই মনুষ্যোচিত করে তোলে। বাঙাল ভাষা নকল করে কথা বলার ব্যাপারটা এত দূর পৌঁছেছিল, যা মোটেই শিষ্টজনোচিত নয়। বিশেষত শ্রীহট্টের মানুষ দেখলে নিমাই পণ্ডিত আর স্থির থাকতে পারতেন না। মনে রাখতে হবে—ইতোমধ্যে তাঁর প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্পাঘাতে মারা গেছেন কিন্তু এই মৃত্যুতে জননী শচীদেবীকে যতখানি বিব্রত দেখেছি, নিমাই পণ্ডিতকে তত নয় এবং এই দুর্ঘটনার পরও শ্রীহট্টীয় মানুষদের সঙ্গে তাঁর রসিকতার বহর কমছে না। চৈতন্যের পূর্বপুরুষেরা অনেকেই শ্রীহট্টীয়, অথচ নবদ্বীপ-শান্তিপুরের পরিশীলিত ভাষার বংশধর তাঁর পিতা-পিতামহের দেশজ ব্যক্তিদের ভাষা নকল করছেন এবং যখন করছেন, তিনি তখন অধ্যাপক। শ্রীহট্টীয়া দেখলে তিনি এত সময় ধরেই এই ভাষা-বিকার উপস্থাপনা করতেন যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি ক্রোধ না করে থাকতে পারত না। অবস্থা এমন দাঁড়াত যে, বাঙাল শ্রীহট্টীয়রা তাঁর পিছনে হাতের কাছে যা পান, তাই নিয়েই দৌড়োতেন এবং একজন অধ্যাপক পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও নিমাই পণ্ডিতও দৌড়ে পালাতেন। তারা প্রভুর নাগাল না পেয়ে গালাগালি দিতেন দূর থেকে এবং আমার পরম বিশ্বাস, সে গালাগালিটাও নিশ্চয়ই বাঙাল ভাষাতেই দিতেন তাঁরা।

এই ভাষা-নকলের ঘটনায় উত্যক্ত হয়ে শ্রীহট্টীয়রা কোনো সময় নিমাই পণ্ডিতকে রাজকীয় শিকদারের কাছেও ধরে নিয়ে গেছে এবং নিমাই পণ্ডিতের বন্ধু-বান্ধবদের শিকদারের বাড়িতে গিয়ে মিটমাট করতে হয়েছে। আমরা এই ঘটনাটা উল্লেখ করতাম না, কিন্তু এই কারণেই তা করেছি যে, নিমাই পণ্ডিতের স্বভাবের মধ্যেই এই অদ্ভুত একটা গোঁয়ার্তুমি আছে যাতে যেটা তিনি ধরেন, সেটা আর তিনি ছাড়তে পারেন না। এই যে ভয়ংকর মনুষ্যোচিত ভাব—এই ভাবটাই যখন ভবিষ্যতে

ধর্ম-দার্শনিকতায় পরিবর্তিত হবে, তখনও এই সুবিধেটা থাকবেই যে, অতি-সাধারণ মানুষও তাঁকে নিতান্ত মনুষ্যোচিত-ভাবেই স্পর্শ করতে পারবে, বুঝতে পারবে তাঁর উদার পারমার্থিকতা।

পূর্ববঙ্গ থেকে আসার পরে নিমাই পণ্ডিতের ঘরে অর্থের সংকট খানিকটা মিটেছিল—তাই বলে সেটা এতটা নয়, যেটা তাঁকে ধনীর পর্যায়ে নিয়ে যায়। কেননা তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের সময় লক্ষ্মীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া যখন তাঁর ঘরে এলেন, তখন নিমাই পণ্ডিতের বন্ধু বুদ্ধিমন্ত খান সে বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন। বুদ্ধিমন্ত খান অবশ্যই নবদ্বীপে জমিদার-শ্রেণির মানুষ ছিলেন এবং মুসলমান শাসকবর্গের সঙ্গেও তাঁর ওঠাবসা ভালোই ছিল, নইলে গুণরাজ খান, যশোরাজ খানের মতো খান-উপাধিটা তাঁর জুটত না। যাই হোক, বন্ধু নিমাই পণ্ডিতের বিয়েটাও তিনি এমনভাবেই দিয়েছিলেন, যাতে দরিদ্র ব্রাহ্মণের দিন-যাপনের গ্লানি এতটুকু প্রকট না হয়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন—

শুন সর্ব ভাই।
বামনিঞা মত এ বিবাহে কিছু নাই।।
এ বিবাহ পণ্ডিতেরে করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন।।

বেশ ধুমধাম করে নিমাই পণ্ডিতের দ্বিতীয় বিবাহ হল বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে। কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা যেটা এখানে বুঝতে হবে, সেটা হল—তাঁর অনুগামী তৈরি হয়েছে অনেক। তাঁর সখা-বন্ধুরা তাঁকে শিকদারের আইনি হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসছে, কোনো বন্ধু তাঁর বিশাল চণ্ডীমণ্ডপ তাঁর অধ্যাপনার জন্য ছেড়ে দিয়েছে এবং ধনী বন্ধু তাঁর বিবাহের ব্যয়ভার বহন করছে—এই সমস্ত ঘটনা থেকে তাঁর প্রিয়ত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরও এক বৃহৎ গোষ্ঠী, যাঁরা অদ্বৈত আচার্যের ঘরে কীর্তনানন্দে রয়েছেন, তাঁরা শুধু এই বৃহৎ নেতা-নায়কের অপেক্ষা করছেন, কবে তিনি অধ্যাপনার বিদ্যারঙ্গ ছেড়ে নতুন রূপে ধরা দেন।

নিমাই পণ্ডিত জীবনে আমূল পরিবর্তন যে সময়ে এল এবং যে ভাবে এল—তার কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। কোনো ঐতিহাসিকতা বা সামাজিক সূত্র ধরে এই বিরাট অভ্যুদয়ের ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং অন্তত আমি সেই ব্যাখ্যা দিতে পারবও না। শুধু এইটুকু বলতে পারি—ধর্মের জগতে এমন হয়, তাতে যাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন, তাঁরা বেঁচে গেলেন, যাঁরা পারেন না, তাঁরা যুক্তি

দিয়ে বিচার করতে থাকুন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ওই বিশ্বাসের পথ ধরেই তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে আজকের সমাজ-সচেতন ঐতিহাসিকের যুক্তি-তর্কগুলি নিবেশ করছি মাত্র। নইলে চৈতন্য-জীবন নিয়ে এই যুক্তিবাদী নির্মাণ আমার পছন্দ নয়। পছন্দ না হওয়ার সবচেয়ে বড়ো কারণ হল—আমি ছোটোবেলা থেকে শত শত চৈতন্যপন্থী ভক্ত দেখেছি, দেখেছি প্রেমীভক্ত, যাঁদের সঙ্গ করলে তাঁদের চৈতন্য-প্রেমের জাল ছেড়ে বেরিয়ে আসাই কঠিন। চৈতন্যপন্থীদের মধ্যেই এমন মানুষ আমি দেখেছি, যারা ধন-মান-ঐশ্বর্য এক মুহূর্তে মলবৎ পরিত্যাগ করে চলে গেছেন, সেখানে স্বয়ং চৈতন্যের এই হঠাৎ পরিবর্তন আমার কাছে এতটুকু অস্বাভাবিক নয়।

আগে ভাবতাম—এসব এক ধরনের সংকীর্ণতা। তখন মনের মধ্যে বুঝি উপলব্ধ বিদ্যার সামান্য অহংকার ছিল, হয়তো বা গবেষণা-কর্মের নানান নব-নবোন্মেষিণী গরিমায় আমার হৃদয়ের চারিদিকে ঘনিয়ে উঠেছিল আত্মমানিতার আবরণ। তখন ভাবতাম—এসব নিছকই সংকীর্ণতা, নিজের ঘরের জিনিসটাকে বড়ো করে দেখানো। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাধার প্রণয়-মহিমা নির্ণয় করতে গিয়ে যখন এমন কথা বললেন—বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়—তখন এটাই ভেবেছিলাম যে, তামাম জগতের মানুষকে বেরসিক বলে কবিরাজ এক ধরনের আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন, আর একই সঙ্গে সমুদয় কৃষ্ণভক্তদের একটা 'কোটারি' তৈরি করার চেষ্টা করছেন তিনি। এরপর এক সময় মহামতি রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পড়তে আরম্ভ করলুম। বিভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারী ভাব ইত্যাদির চমৎকার ব্যাখ্যাবৃত্তি অনুভব করে অবশেষে স্থায়ী ভাব শেষ করেই একটা ধাক্কা খেলুম। গোস্বামীজি লিখলেন—অনেকেই আছেন যাঁরা জ্ঞান-বৈরাগ্যের সাধন করেন বটে, কিন্তু ভক্তির ব্যাপারে উদাসীন, অর্থাৎ শুকনো-শুকনো জ্ঞানের তাত্ত্বিকতায় যাঁদের হৃদয় কঠিন হয়ে উঠেছে, তাঁদের জন্য আমার এই গ্রন্থ নয় বাপু! এমনকী তাঁদের জন্যও এই গ্রন্থ নয়, যাঁরা দিনরাত হেতুবাদিতায় তর্কের ঝড় তুলে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করছেন মাত্র, অথবা তাঁদের জন্যও নয় যাঁরা কর্মকাণ্ডের যজ্ঞ-দান-হোমক্রিয়ায় নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত।

কেমন যেন ধাক্কা খেলুম এসব কথা শুনে। রূপ বলছেন—গৃহস্থ যেমন চোরের ভয়ে মহামূল্য বস্তু লুকিয়ে রাখ, ভক্তিরসিক ব্যক্তি যেন সেইভাবেই তার আস্বাদ্য ভক্তি লুকিয়ে রাখবেন কর্মবাদী, হেতুবাদী, জ্ঞানবাদী মানুষের কাছ থেকে, কেননা

যিনি রসিক ভক্ত নন, তিনি ভক্তির সরসতা অনুভবই করতে পারবেন না—সর্বথৈব দুরূহোঽয়ম্ অভক্তৈর্ভগবদ-রসঃ। এসব কথা পড়ে সন্দেহ হত, নিজে ভালো করে বুঝতেও পারতাম না এই সংকোচ, এই সংকীর্ণতার তাৎপর্য, কেননা আমি নিজে সেই পরম আস্বাদনের ভোক্তা পুরুষ, অতএব আমার মাথায় এটা ঢুকতই না যে, অন্যের কাছেই বা এ সরসতা গ্রহণীয় হবে না কেন! ক্রমে বড়ো বড়ো গবেষকের বই পড়লাম, স্বদেশি-বিদেশি অনেক গবেষকের সঙ্গে কথাও হল। ওঁরা বেশ গালভরা একটা শব্দ শুনিয়ে বললেন— cult ; cultic feature এটা। প্রত্যেক পুরাতন cult-এর ক্ষেত্রেই—none but the initiates has access into it —এই ব্যাপার আছে

তাঁদের কথা বোধগম্য না হওয়ার কিছু নেই। দীক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া বিশেষ cult-এর ব্রত-নিয়ম-আচার পালন করা যায় না বা cult-এর গভীরে প্রবেশ করা যায় না, সেটা বুঝতে কি অসুবিধে আছে? কিন্তু চৈতন্যপন্থা তো তেমন নয়, অনেক অদীক্ষিত অবৈষ্ণবও তো এই রসের রসিক, তবে এমন লুকোছাপা ভাব কেন, কেন এমন সতর্কতা! ভাবতে ভাবতে আমার বয়স বেড়েছে, তথাকথিত সংকীর্ণতাকে তদীয় অনুভব দিয়ে বুঝতে শিখেছি। ঘরের মধ্যে আপন আনন্দ লুকিয়ে রাখার তত্ত্বটা আবিষ্কার করলাম ভগবদ্‌গীতার মধ্যে। সেখানে অর্জুনকে শতেক দার্শনিক তত্ত্ব উপদেশ করার পর চরম শ্লোকে ভগবান বললেন সমস্ত ধর্মত্যাগ করে তুমি আমার শরণ নাও, আমি তোমাকে সমস্ত অনর্থ পাপ থেকে বাঁচাব। এই চরম উপদেশ দেবার পরেই কৃষ্ণ বললেন—দেখো বাপু অর্জুন! আমি যা এতক্ষণ ধরে বলেছি, তা যেন এমন লোককে বোলো না যার মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম ঐকতানে পর্যবসিত হয়নি—ইদন্তে নাতপস্কায়। ধরা যাক, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সংযত হয়েছে কিন্তু যা বলেছি এতক্ষণ, তার প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, আত্মনিবেদন নেই, এমন লোককেও তুমি আমার এসব কথা বোলো না। আবার এমনও হতে পারে যে, তিনি সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, শ্রদ্ধাবান ভক্তও বটে, কিন্তু শুনতে চান না এসব কথা—আমি বলি তেমন লোকের কাছেও তুমি বোলো না। কেননা জ্ঞান, বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদির মাধ্যমে যে মানুষ গম্ভীর পরিশীলন লাভ করেছেন, তিনি ঈশ্বর পুরুষের এই নিতান্ত মানুষ রূপটিকে তো স্বীকারই করবেন না, উপরন্তু সমস্ত ধর্ম-কর্ম ত্যাগ করে তাঁর ঐকান্তিক শরণাগতির কথাটাকে খুব ছেঁদো বলে ভাববেন, ভগবত্তার-স্বরূপের প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা থাকবে।

অতএব তেমন লোকের এসব কথা পছন্দ হবে না বলেই তুমি তাঁদের কাছেও আমার এই মনের কথাগুলি বোলো না—ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।

সত্যি কথা বলতে কী, চৈতন্য-জীবন আমার কাছে এক অন্তরঙ্গ কথা, তাঁর সেই বিরাট অভ্যুদয় ব্যাখ্যার জন্য আমি কিন্তু সেই পাঠকদের 'অ্যাড্রেস' করছি, যাঁরা তাঁর জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তনকে ঈশ্বর-প্রেরিত অথবা দৈব-সংঘটিত বলেই ভাববেন, অন্তত সেখানে বেশি যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করবেন না। নিমাই পণ্ডিত গয়ায় গিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ করলেন, দর্শন করলেন বিষ্ণু-পাদপদ্ম। তাঁর শরীর-মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—এই সেই চরণ—যা একদিন অপার করুণা-রসে দৈত্যরাজ বলির মস্তকে অর্পিত হয়েছিল, এই সেই চরণ, যা প্রতি পূজার সংকল্পে উচ্চারিত হয়—তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। এই সেই চরণ, যার দিকে নিশ্চল চোখে চেয়ে থাকেন দেবতারা—নিমাই পণ্ডিতের সমস্ত বিদ্যার অহংকার চোখের জলে ধুয়ে গেল, তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল বিরাট পুরুষের সেই ব্যাপ্তি—যা অন্তরের মধ্যে অতীত-অনাগতকে একাকার করে দেয়, জাতি-বর্ণ, ঐশ্বর্য-কৌলীন্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করে নিমাই পণ্ডিত কেমন যেন হয়ে গেলেন—

অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম-নয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণদর্শনে।।

গয়াধামে কত না মানুষ বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করেন, কয়জনের এমন হয়? অতএব নিমাই পণ্ডিতের ক্ষেত্রে যা ঘটল, সেটা বিষ্ণুপাদপদ্মের মহিমা, নাকি সেটা তাঁর নিজের মহিমা! একটা কিছু উপলক্ষ্য লাগে বিরাট অভ্যুদয়ের জন্য—সেই রাজপুত্র, যিনি কপিলাবস্তুর পথভ্রমণে বার্ধক্য-জরা-মৃত্যুর চিরন্তন দৃশ্য দেখে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন, এও তেমনই এক উপলক্ষ্য—বৈদিক বিষ্ণুর বিরাট ব্যাপ্ত পদ-সংক্রমণ নিমাই পণ্ডিতের অন্তরাত্মা জাগিয়ে তুলল ব্যাপ্তির সংকেতে—জাভং রসময়ং জগৎ—

সর্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ।।

চরিতকার যাই বলুন—ঈশ্বরপুরী সেই সময়েই দৈবযোগে উপস্থিত হলেন গয়ায়, আমার তা বিশ্বাস হয় না। এই মানুষটির জন্য তিনি বহুকালের অপেক্ষায় ছিলেন।

নবদ্বীপে একবার অদ্বৈত আচার্যের ঘরে, একবার গোপীনাথ আচার্যের ঘরে থেকে ঈশ্বরপুরী এই মানুষটির সান্নিধ্যে এসেছেন, নিজকৃত গ্রন্থ সংশোধন করার নাম করে তিনি বারবার তাঁর কাছে আসবার চেষ্টা করেছেন। তখন পারেননি, এখন সে পথ সুগম হয়ে গেল। আসল কথা কী জানেন—শিষ্য যেমন কখনও উপযুক্ত গুরুলাভের জন্য গুরুর পিছন ঘোরে, তেমনই এমন গুরুও আছেন, যিনি উপযুক্ত শিষ্যের জন্য তেমন শিষ্যের পিছন পিছন ঘোরেন। ঈশ্বরপুরী তেমন গুরু নন, যিনি অর্থলোভে, মানলোভে নিমাই পণ্ডিতের পিছনে ধাওয়া করছেন, তাঁর কাজ—মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমময়ী ভক্তির বীজটি সঠিক জায়গায় রোপণ করা, যে-বীজ মহীরুহ হয়ে উঠবে। নিমাই পণ্ডিতকে দেখে ঈশ্বরপুরী বুঝেছিলেন—মাধবেন্দ্রপুরী প্রবর্তিত প্রেমভক্তির সবচেয়ে বড়ো আধার হতে পারেন এই মানুষটি। তদবধি তাঁর কৃপাচক্ষু পড়ে আছে পণ্ডিতের ওপর। তিনি এখানে সেখানে ঘুরছেন এবং গয়ায় এসে নিমাই পণ্ডিতকে বলেও ফেলেছেন—যদবধি তোমা দেখিয়াছি নদীয়ায়। তদবধি চিত্তে আর কিছু নাই ভায়।।

যিনি এর পরের দিনই নিমাই পণ্ডিতের গুরু হবেন, তিনি কত সন্তর্পণে এগোচ্ছেন তাঁর দিকে। গয়াধামে কোনো বিশাল প্রভুত্বের পদসঞ্চারে তিনি নিমাই পণ্ডিতের ঘরে 'অয়মহং ভোঃ' বলে উপস্থিত হননি। গয়ায় বিভিন্ন তীর্থ এবং বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করে এসে নিমাই পণ্ডিত দিনান্তের আহার রন্ধন করেছেন, সেই বেলা তাঁর দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন ঈশ্বরপুরী। নিমাই পণ্ডিত বললেন—আজ যা রেঁধেছি; তুমি খাও সব। পুরী বললেন—তবে তুমি কী খাবে? পণ্ডিত বললেন—আবার রান্না করতে কতক্ষণ?

পুরী বোলে কি কার্যে করিবে আর পাক?
যে অন্ন আছয়ে তাহি কর দুই ভাগ।।

নিমাই পণ্ডিত মানলেন না। তিনি বুঝেছিলেন—এই অর্ধপ্রৌঢ় মানুষটি তাঁকে খুব চাইছেন। অতএব সেই গৌরব নিয়েই বললেন—তুমি যদি আমাকে চাও, তো আমার রান্না সবটাই তোমায় খেতে হবে। ঈশ্বরপুরী ভাবী শিষ্যের প্রথম দাস্যকর্ম অঙ্গীকার করলেন। ভাবী গুরু আর ভাবী শিষ্যের নিভৃতে কথা হল অনেক। পরের দিনই ঈশ্বরপুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা চাইলেন নিমাই পণ্ডিত। পুরী বললেন—মন্ত্র কী, তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি। পুরী গোঁসাই কৃষ্ণের দশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করলেন নিমাই পণ্ডিতের কানে। নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীকে প্রদক্ষিণ করে শিষ্যবৎ

আত্মনিবেদন করলেন গুরুর চরণে। এ কেমন গুরু, আর এ কেমন শিষ্য! দীক্ষামন্ত্রের আদান-প্রদানে শিষ্য এবং গুরু দুজনেই পরম উল্লাসে অস্থির হয়ে পড়লেন। শিষ্যের অবস্থা হল ততোধিক। দশ অক্ষরের ক্ষুদ্র একটি দীক্ষামন্ত্র আণবিক আবেগ-স্ফুরণ ঘটিয়ে দিল নিমাই পণ্ডিতের মনে—তিনি হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ বলে পাগল হয়ে উঠলেন, সমস্ত শরীর ভরে উঠল কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে—

যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির।।

আমার সহৃদয় পাঠককূল। আমি আপনাদের মনে কোনো বিশ্বাসের মন্ত্র জাগাতে পারব না, যাতে এই আকস্মিক প্রেম-বিকার ব্যাখ্যা করা যায়। লোকে তো একে বিকারই বলে, বুদ্ধিমান তার্কিক জনে এমনও বলেছে যে, এ হল এক ধরনের 'হিস্টিরিয়া'। আগেই বলেছি—তাদের বোঝানোর দায় নেই আমার। কিন্তু আমি যে নিজেও এমন দেখেছি, শুনেছি, অনুভবও করেছি। যারা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রামদাস বাবাজি মশায়ের মুখে 'হরিদাস নির্যান' শুনেছেন, তাঁরা কীর্তনের আসরে বসেই কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন। বলতে পারেন, এও তো বিকার। দীক্ষামন্ত্র লাভের পর হঠাৎ এই আকস্মিক পরিবর্তন কী করে হল, তার কোনো লৌকিক যুক্তি নেই আমার কাছে। কিন্তু উপযুক্ত গুরুর কাছে উপযুক্ত শিষ্য যখন প্রথম শিক্ষা পেতে আরম্ভ করে, তখন এমনতর পাগলামি আমি লৌকিক জগতেও দেখেছি, সেখানে কৃষ্ণপ্রেমী গুরুর কাছে চৈতন্যের মতো শিষ্য যখন দীক্ষামন্ত্র লাভ করেন, তখন যে কী অনাস্বাদিতপূর্ব চমৎকার ঘটতে পারে, তা শুধুই অনুভববেদ্য, প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ নয়। পরের দিন শেষ রাত্রেই নিমাই পণ্ডিত ঘর ছেড়ে মথুরা-বৃন্দাবনের উদ্দেশে রওনা দিলেন—কী করব, কোথায় যাব, কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাব—এমন একটা আকুতি তাড়িয়ে নিয়ে চলল তাঁকে। কিন্তু মাঝপথে সে তাড়না স্তব্ধও হল। চরিতকার বলেছেন 'দৈববাণী'। দৈববাণী বলেছিল—এখন মথুরা যাবার কাল নয়, এখন তুমি নবদ্বীপে ফিরে যাও।

আমাদের ধারণা—দৈববাণীর চেয়েও এখানে অন্তরের তাড়না ছিল বেশি। নবদ্বীপে কতগুলি মানুষ তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন—শান্তিপুরের প্রৌঢ়-বৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য, গদাধর, শ্রীবাস, মুকুন্দ, আরও কত শত মানুষ পূর্বে থেকেই তাঁর ভাব গ্রহণ করে বসে আছেন, তাঁদের মধ্যে আপন কল্যাণী শক্তি সঞ্চার করার কাজটুকু তাঁর বাকি রয়ে গেছে। বিশেষত মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমভক্তির উত্তরাধিকার, যা

ঈশ্বরপুরীর মাধ্যমে তাঁর মধ্যে সমাহিত হল, সেই প্রেমভক্তির প্রথম রহস্যটুকু আপন দেশের মানুষকে জানিয়ে দেবার কাজটুকু তিনি করে যাবেন।

গয়া থেকে নিমাই পণ্ডিত ফিরে এলেন নবদ্বীপে—একেবারেই পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর স্বভাব এবং বক্তব্য। সেই বেপরোয়া অধ্যাপকের ঔদ্ধত্য এতটুকু অবশিষ্ট নেই তাঁর মধ্যে, সর্বক্ষণ কৃষ্ণের নাম করে যাচ্ছেন এবং অন্তরের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম রসায়িত হচ্ছে ক্ষণেক্ষণে। অধ্যাপনার মণ্ডপে ছাত্ররা আসছে, কিন্তু কলাপ ব্যাকরণের বৃত্তি-পঞ্জী-টীকা ভুলে তিনি কৃষ্ণকথা বলছেন ছাত্রদের। সময় এল, যখন ছাত্ররাও ব্যাকরণ ছেড়ে ভক্তির ব্যাখ্যান বুঝতে শুরু করল। আবহ খানিকটা তৈরি ছিল বটে, কিন্তু পুরোটা মোটেই নয়। চরিতকার বৃন্দাবন দাস যেভাবে এই সময়টার বর্ণনা করেছেন, তা যে ঠিকঠাক আমি বোঝাতে পারব না, তা নয়, কিন্তু চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবের ঘরে-দোরে যাঁদের যাতায়াত নেই, তাঁদের কাছে সন্ন্যাস-পূর্ব নিমাইপণ্ডিতকেও বোঝা সম্ভব হবে না, তেমনই নদীয়া-বিনোদিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর ভক্তগোষ্ঠীর ঐকান্তিক ব্যবহারগুলি বোঝা কঠিন হবে।

এ-কথা অবশ্যই এখানে জানাতে হবে যে, গয়া থেকে ফেরার পর, নবদ্বীপে যে বৈষ্ণব-সমাজ এতদিন ধরে একটু একটু করে পুষ্ট হচ্ছিল, তারা শুধু এক নতুন ব্যক্তিত্বই সঙ্গী হিসেবে লাভ করেনি, তারা এক বিরাট পুরুষের নেতৃত্ব লাভ করেছিল। অদ্বৈত আচার্যের মতো প্রৌঢ় বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজেকে এই নবীন যুবার দাস হিসেবে ঘোষণা করলেন। বীরভূমের জাতক নিত্যানন্দ অন্য জায়গা থেকে এসেছিলেন নবদ্বীপে। নিত্যানন্দ এমনই এক বিচিত্র মানুষ যিনি প্রথম জীবন থেকে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে নিজের ধর্মমত দৃঢ় করেছেন এবং তাঁকে বিচার করতে গেলে আবারও সেই আশ্চর্য তথ্যটি দিতে হবে যে, তিনি এবং মাধবেন্দ্রপুরী হয়তো একই গুরুর শিষ্য—মাধবেন্দ্র বৃদ্ধ এবং নিত্যানন্দ যুবক; হয়তো বৃদ্ধত্বের কারণেই মাধবেন্দ্রপুরীকে গুরুর সম্মানে দেখতেন নিত্যানন্দ এবং এই দুইজনের সাক্ষাৎকার যখন হয়েছিল, তখনও কিন্তু নিমাই পণ্ডিত তাঁর ভক্তিভাবের মধুর রাজ্যে প্রবেশই করেননি। মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমময়ী ভক্তি নিত্যানন্দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল এবং সেই ভক্তি আত্মসাৎ করে তিনি এমন সময়েই নবদ্বীপে এসেছিলেন যখন নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপের সামগ্রিক বাতাবরণ পালটে দিতে বসেছেন প্রায়।

সেদিন মুকুন্দ-সঞ্জয়ের বিরাট চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই পণ্ডিতের ব্যাকরণ-শিষ্যেরা শেষ সিদ্ধান্ত চাইল। পণ্ডিত বললেন—আমার দ্বারা এ অধ্যাপনার কর্ম আর সম্ভব হবে

না। নবদ্বীপে নামী-দামী অনেক অধ্যাপক আছেন, তোমাদের যার যেখানে ইচ্ছে পড়তে যাও। নিমাই পণ্ডিত পুঁথি বন্ধ করে বেঁধে ফেললেন দড়ি দিয়ে। শিষ্যরা বলল—এতদিন আপনার কাছে পড়ার পর আর কোথাও আমাদের পক্ষে আর পড়াশুনো করা সম্ভব নয়। তারাও সব পুঁথি বন্ধ করে দিল—পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর। এই ঘটনাটা খুব বড়ো নয়, কিন্তু একই সঙ্গে আমি নিমাই পণ্ডিতের জনপ্রিয়তাটুকু বোঝাতে চাইছি। শিষ্যদের প্রতি পণ্ডিত-আচার্যের শেষ উপদেশ হল—

পড়িলাঙ শুনিলাঙ এত কাল ধরি।
কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি।।

বিদ্যায়তনের সেই প্রকোষ্ঠেই কৃষ্ণের সংকীর্তন আরম্ভ হয়ে গেল, সেইখানেই অন্য মানুষজন জমায়েত হতে আরম্ভ করল—কীর্তনের রোল উঠল পাঠাগার থেকেই। সবার কাছে যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল সেটা হল এই যে, এমন উদ্ধত অহংকারী অধ্যাপক কোন্ মায়ামন্ত্রবলে এমন দীন-হীন নরম হয়ে উঠল? নাকি কৃষ্ণভক্তি বস্তুটাই এইরকম যা মানুষকে এমন মধুর কোমল করে তোলে।

হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা এ বা কিবা হয়।।

নবদ্বীপে শ্রীবাস বা শ্রীনিবাস পণ্ডিতেরা চার ভাই। চার ভাই-ই বৈষ্ণব। নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়িতে কীর্তনানন্দ আরম্ভ হয়েছিল অনেক আগে থেকেই, সেখানে আনাগোনা করতেন তাবৎ বৈষ্ণব সজ্জনেরা—গদাধর, মুকুন্দ, মুরারি, অদ্বৈত আচার্য সকলেই। কৃষ্ণপ্রেমের অনুভবে নিমাই পণ্ডিতকে যখন বাইরে থেকে বিকারগ্রস্তের মতো দেখাচ্ছিল, তখন এই শ্রীবাস পণ্ডিতই প্রথম তাঁর অভ্যুদয় প্রচার করেন। বাড়িতে শচীমাতা প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন তাঁর ছেলের সাত্ত্বিক ভাবকে বায়ুর প্রকোপ ভেবে, পরে শ্রীবাসের বক্তব্য শুনে আরও গভীরতর ভয় তাঁর মনের মধ্যে বাসা বাঁধল। ভাবলেন—জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপের মতো নিমাইও একদিন সন্ন্যাসী না হয়ে যায়—বাহিরায় পুত্র পাছে এই মনে ভয়।

শ্রীবাসের গৃহে নামকীর্তনের যে বিরাট উল্লাস-যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছিল, চরিতকারেরা সেখানে নিমাই-পণ্ডিতের নানান অলৌকিক বিভূতিও লিপিবদ্ধ করেছেন, আমরা তার মধ্যে যাচ্ছি না, কেননা সেগুলি ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা। বাস্তবে এই একটা সময় যখন নবদ্বীপ এবং তার সমীপবর্তী অন্যান্য স্থান

থেকে বহু বহু পরিচ্ছন্ন মানুষ নিমাই পণ্ডিতকে তাঁদের ধর্মীয় ভাবনার পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তখনও তাঁর ব্যাপারে উদাসীন রইল, কিন্তু মধ্যবিত্ত মানুষ এবং সাধারণ ভদ্র দরিদ্র মানুষ নতুন প্রাণ খুঁজে পেল নবোন্মেষিত এই ধর্মের মধ্যে।

প্রাথমিক একটা 'রি-অ্যাকশন' অবশ্যই হয়েছিল এবং তা হয়েছিল সাধারণের মধ্যেও এবং পণ্ডিতের মধ্যেও। মানুষ তো কত রকম আছে—ভিন্নরুচি, ভিন্নভাব এবং তার মধ্যে আছে ভিন্নধর্মী শাসকের ভয়—যেন নতুন কোনো হিন্দুয়ানি আরম্ভ হল। চরিতকারেরা সমাজের এই অংশের প্রতিক্রিয়াটুকু সযত্নে লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তা বর্ণনা করেছেন অতি সংক্ষেপে এবং বেশ সকৌতুকে। অত্যন্ত বিষয়ী মানুষ যাঁরা—সমাজের কোনো উজ্জীবনী প্রক্রিয়া যাদের মনে ছায়া ফেলে না, স্ত্রী-পুত্র-খাদ্য এবং স্ব-সুখবাসনা ছাড়া আর কিছুই যারা ভাবে না, তারা বিচার-ভাবনাহীন বৈষয়িকতায় বলতে আরম্ভ করলেন—এই লোকগুলোর হঠাৎ হল কী? রাত্রিদিন হরিনাম করে ডাক ছাড়ছে, আমাদের ঘুমের বারোটা বেজে গেছে। বিশেষ করে রাতের বেলায় এত চেঁচিয়ে লাভ কী? মনে-মনে ভগবানকে ডাকলে পুণ্য কি কম হয়?—

কেহ বোলে—এ-গুলায় হইল কি বাই।
কেহ বোলে—রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই।।
মনে মনে ডাকিলে কি পুণ্য নাহি হয়?
রাত্রি করি ডাকিলে কি পুণ্য জনময়?

ঘটনা হল—শ্রীবাসের বাড়িতে যে কীর্তনারম্ভ হয়েছিল, তা রাত্রিতেই হচ্ছিল। দিনের বেলায় অর্থ-চিন্তায় ব্যাপৃত মানুষের বৈষয়িক বিঘ্ন না ঘটে, এটা যেমন একটা কারণ হতে পারে, তেমনই অন্য কারণ হতে পারে ভিন্নধর্মী এবং ভিন্নদেশি প্রশাসকের ভয়—যাতে প্রাথমিক এই সংকীর্তনরঙ্গ অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয়। পুণ্য-পাপ এই শব্দদুটির উচ্চারণে বোঝা যায় যে, এরা বঙ্গের স্মৃতিশাস্ত্রতাড়িত মানুষ, বিভিন্ন বৈদিক ক্রিয়ার অপভ্রষ্ট আচার—এই করলে পুণ্য, আর এই করলে পাপ—এই রকম একটা সাধারণ যোগ-বিয়োগের অঙ্ক মেনে এরা চলে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এদের ধারণাটা অবশ্য বড়োই গম্ভীর এবং দূরবর্তী—অন্তরীক্ষলোকে আসীন হয়ে তিনি যে পরম গম্ভীরতায় প্রত্যেকটি মানুষের পাপ-পুণ্যের নিক্তি কষে যাচ্ছেন এমন একটা ধারণাবশে তারা মন্তব্য করে—কীর্তনের এই উচ্চগ্রাম চেঁচামেচিতে

প্রলয়পয়োধিজলে অনন্ত-শয়ান বিষ্ণুর ঘুম ভেঙে যাবে এবং তাতে অন্য বিপাক সৃষ্টি হবে—

কেহ বোলে গোসাই রুষিব ঘন ডাকে।
এগুলার সর্বনাশ হইব এই পাকে।।

এ-বাবদে সমাজের মাথা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ভাব ছিল অন্যরকম। এতকাল তাঁরা উপনিষদের ব্রহ্ম নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এসেছেন। নিরাকার নির্বিশেষ পরব্রহ্মের উপাসনায় তাঁদের সাধন হল জ্ঞানযোগ। পণ্ডিত বলেই তাঁরা যুক্তি-তর্ক দিয়ে সেই জ্ঞানের সাধন বুঝতে পারেন। সাধারণ ক্রিয়াচারে পুণ্য-পাপের ভাবনা তাঁদের ভাবিত করে না। শম-দমের সাধন সম্বল করে সংসার মুক্তির জন্য তাঁরা পরম গম্ভীর জ্ঞানকেই একমাত্র উপায় বলে উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ-হেন বড়ো মানুষেরা ভগবানকে অত খাস্তা-খাস্তা সহজ জিনিস ভাবেন না। হরিকৃষ্ণ বলে ডাক ছাড়লেই তিনি এসে দেখা দেবেন—ভগবানকে এত সহজ করে ফেললে এতদিন ধরে যে যাগ-যজ্ঞ-ধ্যান-জ্ঞানের চেষ্টা করলেন পণ্ডিতেরা, সে-সব কি তাহলে অর্থহীন? তা ছাড়া এতদিনের উপদিষ্ট জ্ঞান-সাধনের শিষ্ট মার্গ ত্যাগ করে হরি-কৃষ্ণ বলে ডাক ছাড়লেই তার দেখা মিলবে—এমন ভাবনার কোনো মূল্য নেই পণ্ডিতদের কাছে—

কেহ বোলে জ্ঞান যোগ এড়িয়া বিচার।
পরম উদ্ধত হেন সভার ব্যাভার।।
কেহ বোলে কিসের কীর্তন কেবা জানে।
এত পাক করে এই শ্রীবাস বামনে।

শ্রীবাস পণ্ডিতের ওপরেই তখনকার সংরক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজের আরও বেশি রাগ, কেননা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হয়েও তিনি এই হরিনাম-সংকীর্তনের আশ্রয়-প্রশ্রয় অঙ্গীকার করেছেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজের প্রতিক্রিয়া নিয়ে বৃন্দাবন দাস যে শ্লোক বেঁধেছিলেন, তার একটা অসাধারণ সূত্রও মেলে সমসাময়িক একটি সংস্কৃত শ্লোকে। আগেই বলে নেওয়া ভালো যে, নবদ্বীপে বিদ্যাবত্তার যে সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল, সেখানে নব্যন্যায়ের পণ্ডিতেরাও কিন্তু অনেকেই মনে-মনে বেদান্তবাদী জ্ঞানযোগের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁরা যে স্মৃতিশাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ডে খানিকটা উদাসীন ছিলেন তার জোরদার প্রমাণ মেলে তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্রেই। স্মার্ত রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ আচার্য-চূড়ামণি নিজকৃত একটি স্মার্ত গ্রন্থে

লিখেছেন—আমাদের আচার-বিচার, হোম-যজ্ঞসমৃদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রের দিকে দার্শনিক পণ্ডিতেরা কেমন যেন হাতির মতো নির্বিকার চোখে একবার তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নেন। শ্রীনাথ এখানে বোধহয় নির্দিষ্টভাবে বৈদান্তিকদের কথাই বলছেন। তারপরেই ইঙ্গিত করছেন নৈয়ায়িকদের প্রতি। বলছেন—আর এক দার্শনিকের দল আছে, যারা শুধু পদার্থ-বিচার করে যাচ্ছে দিন-রাত। অতএব শিষ্যদের হিতের জন্য আমাকে গ্রন্থ লিখতে হচ্ছে।

এতে এই কথাটাই আরও ভালোভাবে প্রমাণ হয় যে, পণ্ডিত নন, বৈদান্তিক নন, নৈয়ায়িক নন—এমন একটা সাধারণ ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যেই স্মৃতিশাস্ত্রের আচার-বিচার এবং বৈদিক হোম-যজ্ঞের ক্ষীয়মাণ অবশেষটুকু ধরে রাখার একটা প্রবণতা ছিল। আর ছিলেন ব্রাহ্মণেতর বৈশ্য শূদ্র মানুষেরা, স্মার্ত প্রক্রিয়াগুলি যাঁদের কাছে ব্রাহ্মণ্য আচরণের হোম তৈরি করত। এঁরা ব্রাহ্মণ নন, কোনো মন্ত্রবলে এঁরা ব্রাহ্মণ হতেও পারবেন না, কিন্তু এঁদের হয়ে হোমযজ্ঞ করে, এঁদের ব্রত-উপবাস-পূজনবিধি শিখিয়ে ব্রাহ্মণ যে উচ্চতর ব্রাহ্মণ্যের স্পর্শ দিতেন এঁদের, তার একটা নিজস্ব মোহ ছিল। আবার নিজেরা কিছু করতে পারছেন বলে একটা হীনম্মন্যতাও তাদের ছিল। অতএব নিমাই পণ্ডিত যখন সমস্ত হীনবর্গের কাছে হরিসংকীর্তনের উদার আহ্বান পৌঁছে দিলেন, সেদিনও কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হল স্মৃতিশাস্ত্রী সংরক্ষক প্রভুদের। আমরা যে সমসাময়িক শ্লোকের কথা বলেছিলাম, সেই শ্লোকের মধ্যে স্মার্ত শাস্ত্রকারের এই যন্ত্রণা ধরা পড়েছে। সেখানে নব্যন্যায় এবং চৈতন্য-মহাপ্রভুর কীর্তন সমারোহ জোয়ারের চেহারা নিয়েছে।

শ্লোকটির নির্গলিতার্থ থেকে মনে হয়—চৈতন্য মহাপ্রভু তখন সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেছেন এবং তাঁর প্রবর্তিত কাজটুকু সম্পূর্ণ করছেন নিত্যানন্দ প্রভু। নিত্যানন্দের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, তিনি খুব বিনয় নিয়েও চলতেন না। সংকীর্তন প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতাও ছিল অপরিসীম। দীন-হীন সাধারণকে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে প্রেমভক্তি দান করে নিজ গ্রন্থির মধ্যে নিয়ে আসার কাজটা চৈতন্যের অনুপস্থিতিতে তাঁর ওপরেই বর্তেছিল, এবং তিনি সে কাজটা করেছিলেন সাধারণ নিয়ম-কানুন তথা স্মার্ত আচার-বিচারের ঊর্ধ্বে উঠে। ফলত তাঁর ওপরে স্মার্তদের ক্ষোভ ছিল চৈতন্যের চেয়েও বেশি। ঠিক এই কারণেই বর্তমান শ্লোকে চৈতন্যের বদলে নিত্যানন্দকেই আসল অপরাধী বলে নির্ণয় করা হয়েছে। শ্লোক বলছে—কলিযুগের কী বিপুল পরাক্রম দেখো ভাই—বুদ্ধিজীবী দার্শনিক পণ্ডিতেরা

এখন আর হোম-যজ্ঞ করেন না। তাঁরা শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত কর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে সবই আহুতি দিচ্ছেন তার্কিক শিরোমণি রঘুনাথের তর্কযজ্ঞের আগুনে। আরেক দিকে দেখো—কোথা থেকে এক কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনের আওয়াজ উঠেছে, অবধূত নিত্যানন্দ নিজের স্বেচ্ছাচারিতায় সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন এক আন্দোলন তৈরি করেছেন। অতএব সাবধান ভাই, সব সাবধান, নিজের মনকে এসব ভুল পথে যেতে দিও না বাপু! কলির পরাক্রম বড়ো বেড়ে গেছে—বলী কলিপরাক্রমা বিরম বিভ্রমেভ্যো মনঃ।

নিমাই পণ্ডিতের সংকীর্তন-যজ্ঞ শ্রীবাসের বাড়িতে আরম্ভ হয়েছিল রাতের বেলায়। ক্রমে তা দিনের বেলাতেও ছড়িয়ে পড়ল সর্ব-সাধারণের মধ্যে। দলে দলে মানুষ যোগ দিতে লাগল এই নতুন ধর্মের প্রেরণায়। আচার্য-বৃদ্ধ অদ্বৈত ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গের কাছে বর চেয়েছিলেন—মূর্খ-নীচ-দরিদ্রের অনুগ্রহ করো। নিমাই পণ্ডিত কথা রেখেছিলেন। নদীয়ার নগরে-নগরে কীর্তন আরম্ভ হয়েছিল। অদ্বৈত বলেছিলেন—যদি ভক্তিই বিলোতে হয়—

যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।।

বৃদ্ধ আচার্যের এই সকরুণ যাচনা থেকে বোঝা যায় যে, সমাজের এমন একটা অংশকে এই ধর্মের অংশীদার করা হচ্ছে, যারা এতদিন ঐতিহ্যগত ব্রাহ্মণ্যের বঞ্চনা-যন্ত্রণা সহ্য করেছে। এতে আরও বোঝা যায় যে, বেদ নয়, উপনিষদ নয়, সাংখ্য বেদান্ত কিংবা ন্যায়-বৈশেষিকও নয়, চৈতন্য এমন একটি পরম্পরাগত শাস্ত্রকে অবলম্বন করেছেন আপন ধর্মমূল হিসেবে—যাকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা অস্বীকারও করতে পারছেন না, আবার ভালো করে গিলতেও পারছেন না। এই শাস্ত্র হল পুরাণ এবং পুরাণের আরম্ভ-বক্তব্যই এ-রকম যে, স্ত্রী-শূদ্র এবং ক্রিয়াকাণ্ডহীন ব্রাহ্মণদের জন্যই পুরাণ লেখা হচ্ছে, কেননা বেদে-ব্রাহ্মণ্যে তাঁদের অধিকার নেই—স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ। অধিকার যাদের থাকে না, তারাও অধিকারী হতে চায়। এটাই সাধারণ ধর্ম। বৃন্দাবন দাস ভান-ভণিতার ধার ধারেন না বলেই এমন করে বলতে পেরেছেন যে, চৈতন্য এমন একটা ধর্ম প্রবর্তন করলেন যা দেখে স্ত্রী-শূদ্র-চণ্ডালেও নেচে ওঠে আর ভট্টাচার্য-চক্রবর্তীদের তাতে জ্বালা ধরে গায়ে—

চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগ্রামে।
ভট্ট-মিশ্র-চক্রবর্তী সব নিন্দা জানে।।

যারা চিরকাল উচ্চবর্ণের অনুগমন করে এসেছে, তারা চৈতন্য-ধর্মের মাহাত্ম্যে সামাজিক সম্মান এবং অধিকার লাভ করায় তৎকালীন সমাজের মধ্যে একদিকে যেমন একটা বৈপ্লবিক পরির্তন ঘটে গেল, তেমনই অন্যদিকে নিমাই পণ্ডিত পরিচিত হয়ে উঠলেন পরিত্রাতা হিসেবে। মানুষের শক্তি তাঁর পশ্চাৎবর্তী হল দিনে-দিনে। এই শক্তি যে কতটা, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ মিলবে কতগুলি নির্দিষ্ট ঘটনায়। এখানে বিশদ করে বলবার উপায় নেই তাই সূত্রাকারে এ-কথা জানিয়ে রাখছি যে, নিমাই পণ্ডিত যে ভক্তিধর্মের প্রচার আরম্ভ করলেন, তার নেতৃত্বে ছিলেন কিন্তু সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণির লোকেরাই। বিত্তে ঐশ্বর্যে তাঁরা খুব বড়ো ছিলেন না, কিন্তু মধ্যবিত্তের ঘর থেকে উঠে আসা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ—যাঁরা এদিক-ওদিকে ভিনদেশে পড়ে ছিলেন, তাঁরা চৈতন্যের অনুগামী হওয়ায় তাঁর ধর্ম-আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত জগাই-মাধাইয়ের মতো দুষ্কৃতী, মদ্যপ—যারা নবদ্বীপে দুষ্কর্ম করার জন্য মুসলমান প্রশাসকের কোটাল বলে নিজেদের পরিচয় দিত, তাঁরা তাঁদের দুষ্কর্ম বন্ধ করে, মদ্যপান ছেড়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন আরম্ভ করল।

সাধারণ মানুষ এইসব অদ্ভুত কাণ্ড দেখছে, লক্ষ্য করছে। এ-কথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, কোনো অলৌকিক মন্ত্রবলে জগাই-মাধাইয়ের মতো ভয়ংকর দুষ্কৃতী সাধু হয়ে গেল। এটা চৈতন্য-নিত্যানন্দের সেই অসামান্য ব্যক্তিত্ব, যাতে এতটুকু হিংসা না করেও এমন দুষ্কৃতীকে তাঁরা আপন করুণার মহিমায় কৃষ্ণভক্তির উদার ভূমিতে পৌঁছে দিয়েছেন। নিমাই-পণ্ডিতের আদেশে নিত্যানন্দ এবং হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে কৃষ্ণনামের মহিমা কীর্তন করতেন। এমন কর্মে হরিদাস ঠাকুরের নিযুক্তি নিমাই পণ্ডিতের বাস্তব-বোধ আরও প্রকট করে তোলে। হরিদাস মুসলমান যবন ছিলেন, তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক ভাবাবেশের বহু আগে থেকেই বৈষ্ণব। যবন হওয়া সত্ত্বেও হরিনাম কৃষ্ণনাম করার হিন্দুয়ানির জন্য মুসলমান প্রশাসকের হাতে তাঁকে মার খেতে হয়েছে বাজারে বাজারে। অদ্বৈত আচার্য এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে তিনি আগেই এসে জুটেছিলেন। নিমাই পণ্ডিত এখন তাঁকে নিযুক্ত করেছেন নাম-ধর্মের প্রচারে। অন্য ধর্মের মানুষ আমার ধর্মের ধ্বনিকে পরম সম্মানে আদর করছে—এই ঘটনা সাধারণ

মানুষকে আত্মস্ফীত করে তোলে। ফলত নিত্যানন্দের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের হরিনাম-প্রচারের যুক্তিটা অনেক বেশি লোকগ্রাহ্যই শুধু হয়ে ওঠেনি, তা একই সঙ্গে নিমাইপণ্ডিতের নেতৃত্বের বোধ জাগ্রত করে।

নদীয়ার সাধারণ মানুষকে ভক্তিধর্মে উজ্জীবিত করার প্রয়াসের মধ্যেই মদ্যপ জগাই-মাধাইয়ের সঙ্গে নিত্যানন্দ এবং হরিদাসের দেখা হয়। জগাই-মাধাইয়ের ভক্তিধর্ম গ্রহণের মধ্যে এক বিচিত্র রঙ্গ আছে। আসলে এমন আমার জীবনেই দেখেছি যে, সাধু-মহাপুরুষরা অনেক সময় বিপরীত স্থানে নিজের ধর্ম প্রচার করে থাকেন। এমনও দেখেছি যে, তাঁরা অভিপ্রেত মানুষটিকে নিজ ধর্মে শামিল করার জন্য তাঁর পিতা-মাতা, আত্মীয়-বন্ধুর তিরস্কার, গালি-গালাজ খাচ্ছেন। কিন্তু এমন অবস্থাতেও তাঁরা অবিচলিত থেকে অভিপ্রেত বিপরীতমুখী মানুষকেও নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেছেন এবং পরবর্তীকালে সেই তিরস্কারী পিতা-মাতা, আত্মীয়-বন্ধুকেও আমি সেই ধর্ম গ্রহণ করতে দেখেছি।

জগাই-মাধাই ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, তাদের পিতা-মাতাও যথেষ্ট ভালো, কিন্তু কুসঙ্গে পড়ে এদের মদ খাওয়া অভ্যাস হয়েছিল, মদের সঙ্গে মাংস এবং হয়তো গোমাংসও। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি করে তারা নিজেদের মদ খাবার পয়সা তোলে। নিত্যানন্দ এবং হরিদাস গৌরাঙ্গ প্রভুর নির্দেশে সেদিনও বেরিয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর ভক্তিধর্মের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য এবং সেদিন অদূরেই দেখা হয়ে গেল দুই মদ্যপের সঙ্গে। লোকের কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নিত্যানন্দ জানলেন তাঁদের বংশপরিচয়। পিতা-মাতা, ভাই, বন্ধু এদের ত্যাগ করেছে এবং 'হেন পাপ নাহি না করে দুইজন।' নিত্যানন্দ পাপী উদ্ধারের মানসে তাঁদের কাছে এগোতে চাইলে পাড়ার লোকজন তাঁকে বারণ করল—এরা মানুষকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করে না। আর জেনে রেখো—তোমরা সন্ন্যাসী বলে কোনো রেহাই পাবে না কীসের সন্ন্যাসী-জ্ঞান এই-দুইর ঠাঁই। নিত্যানন্দ হরিদাসকে বললেন—আমরা প্রভুর আজ্ঞা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কৃষ্ণনাম প্রচার করার জন্য। আমাদের ফিরে যাবার উপায় নেই। অতএব চৈতন্য-প্রভুর আদেশ পৌঁছে দিয়ে নিত্যানন্দ দুই মদ্যপের সামনে গিয়ে বললেন—বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।

কথা বলবার সঙ্গে-সঙ্গে নিত্যানন্দ হরিদাসের অদ্ভুত অবস্থা হল। জগাই-মাধাই ছুটল দুই সন্ন্যাসীকে তাড়া করে। ভয়ে দুজনেই ছুটলেন উর্ধ্বমুখে। সাধারণে বলল—আগেই নিষেধ করেছিলাম, আর যারা চৈতন্যধর্মকে পাগলামি ভাবছিল,

তারা বলল—দুই ভণ্ডের উচিত শাস্তি হয়েছে। হরিদাস-নিত্যানন্দ ছুটছেন, তাঁদের পিছনে পিছনে ছুটছে জগাই-মাধাই—তাদের শরীর স্থূল এবং কিছু মদের ঘোর রয়েছে বলেই তারা দুই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ধরতে পারছে না। কিন্তু ছুটতে-ছুটতে দুই সন্ন্যাসীর মধ্যে যে অন্তরঙ্গ কোন্দল শুরু হল—পরম বৈষ্ণবদের ঘরে আমি অনুরূপ গল্প নিজের কানে শুনেছি। নিত্যনন্দ হরিদাসকে বললেন—এমন কৃষ্ণনাম শুনিয়েছি দুই মাতালকে যাতে এরা ভয়ংকর বৈষ্ণব হয়ে উঠেছে, আজকে যদি প্রাণে বাঁচি, তবেই বাঁচলাম, নইলে তো শেষ। হরিদাস যবন বললেন—তোমার বুদ্ধিতেই আজকে আমার এই দশা, এমন চঞ্চল লোকের সঙ্গে মানুষ বেরয় কখনও। কী আর বলব—তুমি মাতালকে ধরে হরিনাম শোনাচ্ছ। আমি জেনেশুনে এমন চঞ্চল লোকের সঙ্গে এসেছি বলেই না আমার এই দশা—জানিঞাও আসি আমি চঞ্চল সহিতে।

অসাধারণ জবাব দিলেন নিত্যানন্দ, হয়তো এ-সব কারণেই বৈষ্ণবেরা তাঁকে 'রঙ্গিলা ঠাকুর' বলে ডাকে। নিত্যানন্দ বললেন—তুমি আমাকে কী চঞ্চল বলছ, তোমার প্রভু চৈতন্যের কথা বলো না একবার। তিনি তো সবচেয়ে বড়ো চঞ্চল মানুষ। আর তাঁর স্বভাবটাই বা কী। বামুন মানুষ, কোথায় একটু ভেবে-চিন্তে কথা বলবে। তা তো নয়—ভাবটা এমন, যেন রাজা এসেছেন কোথা থেকে, আমরা শুধু রাজার আদেশ পালন করে যাচ্ছি। তিনি বলেছেন, অতএব ঘরে ঘরে গিয়ে হরিনাম শোনাচ্ছি সবাইকে—লোকে তো আমাদের চোর আর ভণ্ড ছাড়া কিছু বলে না। তাঁর আদেশ মেনে লোকের গালি খাচ্ছি, আর আদেশ না মানলে, তাঁর গালি খাব। তাঁর আদেশে তুমিও তো মাতালের সামনে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বললে, আর এখন তুমি আমাকেই দুষছ কেন শুধু—

আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুইজনে বলিলাঙ দোষভাগী আমি।।

নিত্যানন্দ প্রভুর মুখে চৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রকৃত বৈশিষ্ট্যটি এখানে ফুটে উঠেছে। এখনও তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি, আমরা চৈতন্য বলে মাঝে-মাঝে তাঁকে ডাকছি বটে, কিন্তু এখনও তাঁর নাম চৈতন্য নয়। কিন্তু যেদিন থেকে কৃষ্ণপ্রেমের মাহাত্ম্যে তিনি বিহ্বল হয়েছেন, সেই আকুল বিহ্বলতাও কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব বিনাশ করেনি। তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। নিত্যানন্দের মুখে বৃন্দাবন দাসের ভাষাটা এইরকম—ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে। নিত্যানন্দের রসিকতার মধ্যেও এই

কথাটার একটা তাৎপর্য আছে। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নিমাই পণ্ডিতকে আমরা যেভাবে পরিবর্তিত হতে দেখলাম—এই পরিবর্তনের মধ্যেও একটা তথ্য খুব সুস্পষ্টভাবে ধরা যায় যে, তিনি আপামর জনসাধারণের কাছে একটা সহজ বার্তা পৌঁছে দিতে চান এবং সে বার্তা হল—সমস্ত বাহ্য আড়ম্বর ত্যাগ করে কৃষ্ণের নাম করো। সাধারণের পক্ষে সেটাই সবচেয়ে বড়ো উপায়।

মদ্যপ জগাই-মাধাই নিত্যনন্দ এবং হরিদাস ঠাকুরকে ধাওয়া করে বহু দূর এসেছিল এবং এক সময় মদের ঘোরে আপন কর্তব্যে ক্ষান্তিও দিয়েছিল। সন্ন্যাসী-প্রায় নিমাই পণ্ডিতের কাছে নিত্যানন্দ আর্জি পেশ করেছিলেন—এই দুই মদ্যপকে কৃষ্ণনামে মাতাল করতে হবে। প্রভুর খানিকটা ক্রোধাবেশ হয়েছিল প্রাথমিকভাবে, কিন্তু তিনি অহিংসভাবে হরিনামের উচ্চারণেই মানুষকে নিজের পথে আনতে চেয়েছেন। তাঁর ইচ্ছার ফলশ্রুতি ঘটল দু'-একদিনের মধ্যেই। গঙ্গার যে ঘাটে স্নান করতে যান মহাপ্রভু, সেই ঘাটের কাছে এসেই দুই মদ্যপ সাময়িক একটা আস্তানা নিয়েছিল। তারা এদিন-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, নিজের শক্তিতে নানা অপকর্ম করে, আস্তে আস্তে সেই ঘাটে লোকজন কমতে লাগল। সন্ধে গড়িয়ে একটু রাত হলেই আর কেউ গঙ্গার ঘাটে যাবার সাহস পায় না, যদি বা যায় দশ-পনেরো জন একসঙ্গে জড়ো হয়ে তবে যায়। আবার এমনই মজা, রাতের বেলায় তারা শ্রীবাসের বাড়ির কাছেই এসে জোটে—রাত্রিতে সেখানে কীর্তন হয়, মৃদঙ্গ-মন্দিরার তালে তালে তারা নাচতে থাকে মদের ঘোরে তাল মিলিয়ে। গান যত ভালো লাগে, তারা তত বেশি নাচে, তত বেশি মদ খায়। মহাপ্রভুকে দেখলে আবার মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে—তোমার বাড়িতে যে মঙ্গলচণ্ডীর গান হয়, তা তো তুমিই শেষ করেছ। বেশ লাগে তোমাদের গান। একবার গায়েনদের দেখতে ইচ্ছে হয়, তোমাদের এই মঙ্গলচণ্ডীর উৎসবে যেসব জিনিসপত্র লাগবে, আমরা এনে দেব। তুমি আমাদের জানাতে দ্বিধা কোরো না।

তখনকার সময়ে মঙ্গলচণ্ডীর গান, মনসার লোক-গান ছাড়া গানই ছিল না। রাত্রে শ্রীবাসের বাড়িতে হরিনাম-সংকীর্তনের বিচিত্র ধ্বনি, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদ, যা মাতালদেরও নাচিয়ে দিত, সেটা নৃত্যগীতের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন এবং সেটাও চৈতন্য-ধর্মের নতুন প্রবর্তনা। নিমাই পণ্ডিত এদের দেখলে পরে একটু একটু এড়িয়ে-এড়িয়ে চলেন, অন্য লোকেরা কাছাকাছিও থাকে না। সেইদিন একটু রাত হয়ে গিয়েছিল ফিরতে। নিত্যানন্দ তাঁর কীর্তনের দল-বল নিয়ে ফিরছেন একটু

রাতে—গ্রামে-নগরে কীর্তন সেরে আসতে তাঁর দেরি হয়ে গেছে। রাতের আধা-অন্ধকারে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল জগাই-মাধাই দুই মদ্যপের। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'কে রে তুই?' নিত্যানন্দ বললেন—আমি 'অবধূত'। অবধূত কথাটার একটা গভীর গম্ভীর অর্থ আছে, এবং তা নিয়ে একটা বিচারও আছে। আমরা তার মধ্যে যাচ্ছি না। শুধু এইটুকু বলি—অবধূত এমন দরের সন্ন্যাসী, যিনি সন্ন্যাসীর নিয়ম-আচারও তেমন করে মানেন না। তিনি এতটাই উচ্চস্তরের মানুষ যে, এই মানা না-মানায় তাঁর সাধন-সিদ্ধিরও কোনো ক্ষতি হয় না। অথচ নিয়ম-আচার না মানার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁকে নিয়ে নানা সংশয়েরও সৃষ্টি হয়। এই না-মানার পরিণামটা নিত্যানন্দ প্রভুর ক্ষেত্রে এতটাই যে নিত্যানন্দ প্রভু একটু বেশি বয়সে দু-দুটি বিবাহও করেছিলেন। যাক এসব কথা, অবধূত-সন্ন্যাসীর স্বভাব হল—তিনি দেশে-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান, দুই মদ্যপের একজন মাধাই সেই অর্থটা ধরে ভাবল—বাইরের লোক আবার এই নবদ্বীপে কেন! মাতালের ক্রোধে সে মাটির একটা ভাঙা পাত্র ছুঁড়ে মারল নিত্যানন্দের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়ল রক্ত।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ-নাম স্মরণ করতে লাগলেন। কিন্তু একবারও মাধাইকে তিরস্কার করলেন না, কিংবা আত্মরক্ষার চেষ্টাও করলেন না। মাধাই আরও একবার আঘাত করবার জন্য ভাঙা মৃৎপাত্র তুলতে গেলে জগাই তাকে বারণ করল এবং 'অবধূত' শব্দের সাধারণ অর্থ করে বলল—বিদেশি 'দেশান্তরী' মানুষকে শুধু শুধু মেরে কী হবে? নিত্যানন্দ প্রভুর এমন রক্তাক্ত লাঞ্ছনার কথা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে নিবেদিত হল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কাছে। তিনি অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে তৎক্ষণাৎ পৌঁছলেন নিত্যানন্দের কাছে। নিত্যানন্দের মুখে এতটুকু কাতরতার চিহ্ন নেই, ভয়ংকর-বৃত্তি দুই মদ্যপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি হাসছেন। নিত্যানন্দের মাথার রক্ত দেখে প্রভুর আপাত একটা ক্রোধাবেশ হল বটে, কিন্তু নিত্যানন্দ যুক্তি দিলেন—মাধাই মদ্যপানজনিত মত্ততায় এমন কাজ করেছে, এটি তার ইচ্ছাকৃত নয়। বিশেষত জগাই তার ভাইকে বাধা দিয়েছে, এমতাবস্থায় এদের কারও ওপরেই রাগ করা যায় না।

জগাই এবং মাধাই—হয়তো বা কোনো কালে এদের ভালো দুটো নাম ছিল, হয়তো নাম ছিল জগন্নাথ এবং মাধব। দুঃসঙ্গে পড়ে এরা মাতাল এবং অসভ্যের চূড়ান্ত হয়ে উঠেছিল। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এদের দুই জনকেই কৃপা করেছিলেন এবং

দুই জনেই তাদের অসদ্‌বৃত্তি ছেড়ে পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিল। চরিতকারেরা এই অসদুদ্ধার-কাহিনিতে নানান ভগবত্তার আবেশ দেখিয়েছেন বিশ্বম্ভর নিমাইয়ের মধ্যে এবং সেটা তাঁদের কথা, কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য এইখানেই যে, পাপী-তাপী বা অসৎ বলেই তাকে ফেলে দেওয়া যাবে না, দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এমন ব্যক্তিকেও নিজের সমাজে টেনে এনেছেন আপন আন্তরিকতায়, ভালোবাসায়। সঙ্গে-সঙ্গে জগাই-মাধাই গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে মূর্ছিত হল কি না হল—সেটা বিশ্বাসী ভক্তের ভক্তিরাগরক্ত চক্ষুর মহোৎসব, কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ যেটা বুঝি, সেটা হল—এই ঘটনা প্রমাণ করে মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমের জগতে কেউ অচ্ছুৎ নয়, কেউ অবহেলার পাত্র নয়—সমাজবহির্ভূত অসভ্য মানুষও এখানে নিজের স্থান খুঁজে পায়।

সন্ন্যাসের পূর্ব সময়ের মধ্যেই মহাপ্রভুর এই ভক্তি-আন্দোলন সমস্ত রাঢ়ভূমি এবং বঙ্গভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যক্তিত্বশালী মানুষ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই উদার ধর্ম গ্রহণ করায় জায়গাগুলি ভক্তি-আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। চরিতকারেরা অদ্ভুত একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে। বলেছেন—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজে তাঁর পার্ষদদের নিয়ে নবদ্বীপে জন্মালেন বটে, কিন্তু তাঁর অনেক প্রিয় ভক্তই দূরে অন্যত্র জন্মেছেন। যেসব দেশে গঙ্গা নেই, হরিনামের ধ্বনিও কোনোদিন শোনা যায়নি যেখানে, সেইসব 'শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে' মহাপ্রভুর 'আপন সমান' ভক্তেরা জন্মেছিলেন। তার মানে শুধু গৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর নন, অন্যান্য জায়গাতেও এই উদার ভক্তি আন্দোলনের আধার তৈরি হয়েই ছিল। তাঁরা তাঁদের মতো করে এই ভক্তির পথ দেখাচ্ছিলেন সাধারণ মানুষকে। তাঁরা সকলেই যে উচ্চবর্ণজাত ব্রাহ্মণ কিংবা অভিজাত পুরুষ, তাও নয়। কিন্তু গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই ওইসব দূরস্থিত ভক্তেরা তাঁদের সামনে নেতৃত্ব দেবার মানুষটিকে পেয়ে গেলেন। চরিতকারের অবতারবাদী দৃষ্টিতে ব্যাপারটা এই রকম—

> শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন সমান।
> জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রাণ।।
> নানা স্থানে অবতীর্ণ হইলা ভক্তগণ।
> নবদ্বীপে আসি সভার হইল মিলন।।

নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার।।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এতাবৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবন যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে বলব সন্ন্যাস-পূর্বকালে তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—মুসলমান কাজির রাজনৈতিক প্রতিরোধের সামনে তাঁর সর্বাশ্লেষী ধর্মের উত্তরণ। একথা মানতেই হবে যে, প্রতিরোধ, বিরোধ, অপবাদ আরও একভাবে এসেছিল এবং তা এসেছিল প্রথমত সংরক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকেই। মানুষ তো এমন চিরন্তনভাবেই আছেন যাঁরা নূতন অথচ উদার ধর্ম সহ্য করতে পারেন না বা পারেননি। তাঁরা নিমাই পণ্ডিত এবং তাঁর পার্ষদগণের মুখে হরিনামের ধ্বনি শুনেই নানা কথা বলেছেন, এবং তৈলবাজ লোকও তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন, যাঁরা ভেবেছিলেন যে ঘটনাটা মুসলমান শাসকের গোচরে আনা দরকার।

প্রথম দিকে তারা গুজব রটাত। কেননা ভিনদেশি শাসক সম্বন্ধে যে সংশয় ছিল, সেই সংশয় থেকেই গুজব রটিয়ে বলত—এই ব্যাটা শ্রীবাসের জন্যই দেশটা উচ্ছন্নে যাবে। শ্রীবাসের বাড়িতেই যেহেতু রাত্রিভর কীর্তনানন্দ চলত, অতএব দুই-একজন আরও একটু বাড়িয়ে বলল—এই তো সেদিন রাজদরবারে গিয়েছিলাম, সেখানে দেওয়ান-ঘরে শুনলাম—এইসব কীর্তনের খবর তাদের কানে পৌঁছেছে। রাজার নৌকো আসছে শ্রীবাসকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। আর এক উৎসাহী বলল—আমি আগেই বলেছিলাম—এই বিপদটা হবে। আরে ওই শ্রীবাস ব্যাটার আর কি! যাবে একদিকে পালিয়ে, কিন্তু আমাদের সর্বনাশ করে দিয়ে যাবে। তখন অনেক করে বলেছিলাম—ওই শ্রীবাসের ঘরদোর ভেঙে গঙ্গায় ফেলে দাও, তখন শোনোনি কথা, ভেবেছিলে ঠাট্টা করছি, এখন বোঝো মজা। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হল—নিতান্তই যদি মুসলমান শাসকের পেয়াদা আসে দোষীজনকে ধরতে, তাহলে শ্রীবাসকে আমরাই ধরে তার হাতে দিয়ে দেব—

কেহ বোলে আমরা সভের কোন দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যেবা আসি চায়।।

কথাটা বেশ চাউর হয়ে গেল যে, রাজার নৌকো আসছে শ্রীবাসকে ধরতে। অন্য ভক্তজনেরা খুব একটা ভয় পেলেন না—হয়তো এই কারণেই যে, তাঁদের বাড়িগুলো সংকীর্তনের কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি শ্রীবাসের বাড়ির মতো। কিন্তু সরল-হৃদয় শ্রীবাস নবদ্বীপের রটনা বিশ্বাস করলেন একটু-একটু। মনে মনে তাঁর ভয়ও হল।

ভাইরা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন এবং বৈষ্ণবদের সঙ্গতে শ্রীবাসের বাড়ি এখন যেভাবে চলছে, তাতে শাসকের পেয়াদা এলে তাঁর বিপদ বাড়বে। তিনি একটু ভয়ই পেলেন—কেননা শাসক ভিন্নধর্মী মুসলমান, একবার তাঁর ওপর অবিশ্বাস জন্মালে তাঁর ওপরে কোনো মায়া থাকবে না—যবনের রাজ্য দেখি মনে হইল ভয়।

শ্রীবাস পণ্ডিতের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য চরিতকার বৃন্দাবন দাস এখানে বিশ্বম্ভর মহাপ্রভুর অবতার-সত্তা প্রকাশ করেছেন। সেটা একান্ত বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু সেই বিভূতিতে বিশ্বাস না করলেও প্রভুর বক্তব্য বলে চরিতকার যা নিবেদন করেছেন, তা থেকে আর কিছু না হোক, তাঁর ক্রিয়া-কর্ম পদ্ধতি তথা তাঁর কার্যকরী ব্যক্তিত্বটুকু ঠিক বোঝা যায়। সংকীর্তন-রঙ্গের হোতা হিসেবে তিনি নিজের বিশ্বাসকে শ্রীবাসের দায় বলে এড়িয়ে যাননি। তিনি বলেছিলেন—শাসকের নৌকো যদি শ্রীবাসকে ধরতে আসে তবে—মুঞি গিয়া সর্ব আগে নৌকায় চঢ়িমু। আপন ধর্ম-সাধন-পদ্ধতির ওপর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এতটাই বিশ্বাস যে, তিনি মনে করেন—পৃথিবীর অতি ক্রূর-নৃশংস মানুষও তাঁর ভক্তিবাদী রসায়নে মোহিত হবে। শ্রীবাসকে তিনি বলেছেন—আমাকে যদি রাজা একবার দেখেন, তাহলে তিনি নৃপাসনে বসেই থাকতে পারবেন না। তাঁকে আমি আমার কৃষ্ণনামের মহামন্ত্রে বিহ্বল করে তুলব। তারপর মুসলমান প্রশাসকের উদ্দেশে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—তোমার মোল্লা-কাজি সবাইকে ডেকে আনো এখানে, ডেকে আনো তোমার হাতি-ঘোড়া, পশু-পক্ষী যত আছে। এবার মোল্লা-কাজিদের আদেশ দাও—তারা নিজেদের শাস্ত্র উচ্চারণ করে কাঁদাক সবাইকে—

শুন শুন অয়ে রাজা সত্য মিথ্যা জান।
যতেক মোল্লা কাজী সব তোর আন।।
হস্তী ঘোড়া পশুপক্ষী যত তোর আছে।
সকল আনহ রাজা আপনার কাছে।।
এবে হেন আজ্ঞা কর সকল কাজীরে।
আপনার শাস্ত্র বলি কান্দাউ সভারে।।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বুঝেছিলেন যে, তাঁর ভক্তিধর্ম শুধুমাত্র উপদেশ-সার নীতিকথা নয়। ধর্মপালনের মধ্যে যে শাস্ত্রীয় বাধ্যতা থাকে, সেই বাধ্যতার মধ্যে যে শুষ্কতা থাকে, চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মে সেই বাধ্যতা, শুষ্কতা নেই। হরিনামের বিধি-মন্ত্র ভক্তিকে কীভাবে রসে পরিণত করে তা এখানে দেখানোর উপায় নেই, কেননা

সেই রসশাস্ত্রসম্মত বিচার এত অল্প পরিসরে বোঝানো কঠিন। কিন্তু ভক্তি এবং শরণাগতির ফলে ভক্তের মধ্যে যে রসায়ন ঘটে, সেটা এমনই এক অবধারিত সহজ পরিণতি, যেটা মহাপ্রভুর মতো আভ্যুদায়িক ব্যক্তিত্বের পক্ষে প্রকট করাটা কোনো কঠিন কাজ নয়। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলেছিলেন—

রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে।
সভা কান্দাইমু কৃষ্ণ বলি ভাল মতে।।

শ্রীবাস মহাপ্রভুর কথায় আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন এবং স্থানীয় মানুষজনও যেসব হুমকি দিয়েছিল, তেমন কোনো রাজভয় নেমে আসেনি মহাপ্রভুর কীর্তন-সম্প্রচারে। বেশ কিছু দিন এমনই চলেছিল এবং নবদ্বীপে ভক্তিধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটে গিয়েছিল অত্যল্পকালের মধ্যেই। কীর্তনের প্রচার যত বাড়তে লাগল, ততই অবশ্য সংশয় সৃষ্টি হচ্ছিল অবিশ্বাসীর মনে। বিশেষত শ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার গৃহে সারা রাত ধরে যে কীর্তন চলত, তাতে সন্দেহ পোষণ করার জন্য মুসলমান কাজির প্রয়োজন ছিল না, কোটালের শক্তিপ্রয়োগের আগে হিন্দুদের কোটনামি এবং নালিশি স্বভাব সেখানে অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। শ্রীবাসের বাড়িতে মহাপ্রভু যে কীর্তনানন্দে মেতেছিলেন, অবিশ্বাসী পড়শিদের মুখে তার ব্যাখ্যা ছিল এইরকম—কেউ বলত আরে এগুলো সব খায়, মাছ-মাংস-গোমাংস সব খায়, দেখতে পেলে যদি ওই ভণ্ডামি ধরে ফেলি, তাই দরজা খোলে না কখনও। অন্যজন বলে—এক্কেবারে সত্যি কথা বলেছ, এসব না খেলে গায়ে এত শক্তি আসে কোত্থেকে, অষ্টপ্রহর নাম করতে শক্তি লাগে ভায়া। আরও কুৎসিত মন্তব্যও বাদ গেল না। কেউ বলল—'আরে ভাই মদিরা আনিয়া। সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া।।'

নিমাই পণ্ডিতদের সম্বন্ধে এসব লোকের ধারণা খারাপ ছিল না, কিন্তু এখন খারাপ হয়েছে। তাদের ধারণা—সঙ্গদোষে পণ্ডিতের আজ এই অবস্থা। তার বাপটাও নেই যে তাকে শিক্ষা দিয়ে আগলে রাখবে, তার মধ্যে আছে বায়ু রোগের প্রকোপ, যার জন্য সব গেছে, নইলে দেখ, আগে এত চর্চা করত, এখন বইয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। পুঁথিতে হাতও ছোঁয়ায় না, আরে এক মাস ব্যাকরণ না পড়লে লোকে সব ভুলে যায়, সেখানে এত দিন হয়ে গেল শুধু কীর্তন করে বেড়াচ্ছে। আর নিম্নমানের মানুষেরা যুক্তি দিল—আমরা দরজা বন্ধ করে কীর্তন করার রহস্যটা বুঝে গেছি। আসলে এরা হল সব নিম্নশ্রেণির তন্ত্রসাধক। রাতের

বেলায় মেয়েছেলে নিয়ে আসে, তার সঙ্গে—'ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন। খাইয়া তা সভা সঙ্গে বিবিধ রমণ। ভিন্ন লোক দেখিলে, না হয় তার সঙ্গ। এতেক দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ।।' মহাপ্রভুর এই রুদ্ধদ্বার কীর্তনানন্দের অন্য রহস্য নিশ্চয়ই আছে, তবে সে রহস্যও সাধারণ মানুষকে বোঝানো কঠিন। আসলে সিদ্ধ মহাপুরুষদের বিচিত্র স্বভাব থাকে, তাদের সাধনসিদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব-বিকারগুলি অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাধারণের চোখে বিকারগ্রস্তের মতোই লাগে। মহাপ্রভু নিজের এই বিকারগুলি জনসমক্ষে প্রকট হোক চাননি, প্রকট করতে চাননি তাঁর বিভূতিময়ী সত্তা। অতএব রুদ্ধদ্বার কীর্তনের জন্য ব্যাখ্যা হল নানা রকম এবং সেই ভয়দেখানো আবার শুরু হল—আমরা রাজদরবারে নালিশ জানাব। তারপর দেওয়ানের লোক এসে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে—

কেহ বোলে কালি হউ যাইব দেয়ানে।
কঁকালি বান্ধিয়া সব নিজ জনে জনে।।

এতসব হুমকি, মনের মধ্যে নানা রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও মানুষ যে রাজদরবারে মহাপ্রভুর সংকীর্তন-বিলাস নিয়ে কোনো স্পষ্ট নালিশ জানিয়েছিল, তা মনে হয় না। তবে শ্রীবাসের ঘরে যে সংকীর্তন চলছিল দিনের পর দিন, তাতে সকলের একটা সংশয় ছিল যে, এই কারণে একদিন যবন শাসকের কোপে পড়বে নবদ্বীপ—অন্যথা যবনে গ্রাস করিবে কবল।

যবন শাসকের কোপ হবার অনুকূল ঘটনা যেটা ঘটল, সেটা যুক্তিতর্কের মধ্যে আসে না খুব, তবু সেটা ঘটল। মহাপ্রভুর সংকীর্তন-ভাবনা ততদিনে শ্রীবাসের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ যেমন শ্রীবাসের বাড়ির রহস্য-কীর্তন নিয়ে অনর্থক অপবাদ তৈরি করেছে, তেমনই অনেক মানুষের দুঃখও ছিল যে, তাঁরা মহাপ্রভুর কীর্তনানন্দের নাগাল পাচ্ছেন না। অনেকেই তখন দিনের বেলায় মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করল। তাঁর এমনই ব্যক্তিত্ব, এমনই দিব্য আবেশ যে তাঁকে দেখলেই মাথা নুয়ে আসে সহজে। প্রভু তাদের আদেশ করেন—কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণগুণগান ছাড়া তোমাদের উপদেশ দেবার মতো কিছু নেই আমার। তোমরা দশে-পাঁচে মিলে নিজের ঘরে বসে কলিকালের মহামন্ত্র কৃষ্ণনাম জপ কর। এই নাম করতে-করতেই তোমাদের সিদ্ধি হবে।

প্রভুর এই কথা অসামান্য ফলেছিল। হরিনাম সংকীর্তন শ্রীবাসের অঙ্গন ছেড়ে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। সন্ধ্যা হলেই ঘরে ঘরে কীর্তন আরম্ভ হয়ে

যায়। মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ যা নৈমিত্তিক দুর্গোৎসবের বাদ্য ছিল, তার নিত্য ব্যবহার আরম্ভ হল নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে। মাঝেমধ্যেই প্রভুর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়, তিনি কখনও বিনয়ে নম্র হয়ে, কখনও বা তাদের আলিঙ্গন করে বলেন—'অহর্নিশ ভাই সব বোলহ কৃষ্ণেরে'—দিন-রাত হরিগুণ গান করো, কৃষ্ণের নাম করো। এত সহজে এই বিধানের মধ্যে যেহেতু স্মার্ত আচারের গোঁড়ামি নেই, বৈদান্তিক জ্ঞানের তাত্ত্বিকতা নেই, অতএব সাধারণ সর্বস্তরের মানুষ এমনভাবেই চৈতন্যের ধর্মে শামিল হল, যেটা বর্হির্মুখ সামাজিক জনের কাছে অনভীষ্ট পরিহাসের বিষয় হয়ে উঠল। একটু উদাহরণ দিয়ে বলি—

একদিন প্রভুর প্রিয় ভক্ত শ্রীধর যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে। শ্রীধরের কোনো সামাজিক কৌলীন্য নেই, অর্থ-প্রতিপত্তি নেই, তিনি নবদ্বীপের বাজারে থোড়া-মোচা-কলা বেচে সংসার প্রতিপালন করেন। তিনি মহাপ্রভুর অসীম কৃপালাভ করেছেন, কাজেই সামাজিক কৌলীন্যহীন মানুষ হলেও ভক্ত-বৈষ্ণবেরা তাঁকে অন্য চোখে দেখেন। একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে আসছেন উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করতে-করতে। তাঁর এই ভাব-বিহ্বল হরিনাম শুনে রাস্তায় বেশ কিছু লোক জুটে গেল, তারা কীর্তন করতে-করতে নাচতে লাগল শ্রীধরের সঙ্গে। নাগরিক মানুষের এমন পরিবর্তন দেখে শ্রীধর মহাপ্রভুর কৃপা স্মরণ করে ভাববিহ্বলতায় মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকলেন। বহির্মুখ অবিশ্বাসী জনেরা এ-দৃশ্য দেখল এবং পরিহাস করে বলতে আরম্ভ করল—কী দিন এল! খোলা-বেচা মিনসেও 'ভাব' দেখাচ্ছে। ব্যাটার পেটে ভাত নেই, খেতে পায় না, সেও আজকে বৈষ্ণব হয়ে ভাব দেখাচ্ছে—হের ভাই সব!

খোলা বেচা মুনিসাঙ হইল বৈষ্ণব।।
পরিধান-বস্ত্র নাহি পেটে নাহি ভাত।
লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত।।

এই সামান্য ঘটনা উল্লেখ করে আমি দুটি কথা বোঝাতে চাইছি। প্রথমত, নবদ্বীপের রাস্তায়-রাস্তায় এখন কীর্তন আরম্ভ হয়েছে এবং নগরের অন্যান্য সাধারণ মানুষ এখন সহজেই চৈতন্য-প্রবর্তিত কীর্তন-গানে শামিল হন। অন্যদিকে এই ধর্মের প্রতি তথাকথিত সামাজিক সুসভ্য জনের কদর্থনা আছে। চরিতকার এঁদের চিহ্নিত করেছেন 'হিন্দু কাজি' বলে—যারা নাকি হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকেও আপন সামাজিক উচ্চতা-বোধে চৈতন্যের কদর্থনা করে যাচ্ছেন—হিন্দু-কাজি সব আরও

মারে কদর্থিয়া—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় এই নিয়মে রাজ-দরবারে যারা তৈল-নিষেক করে যাচ্ছিলেন তারা মুসলমান কাজির চেয়েও বেশি ভাবনা প্রকট করেছিলেন। ঘটনাটা এইভাবে ঘটল—

একদিন নবদ্বীপের সাধারণ মানুষেরা অনেকে একত্র হয়ে রাস্তা দিয়ে কীর্তন করতে-করতে চলেছিল এবং দৈবাৎ নগর-শাসক মুসলমান কাজির কানে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খের শব্দ ভেসে এল। নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের কথা মাঝে মাঝে তাঁর কানে আসছিল বটে, তবে তাতে প্রশাসনের কোনো বিরুদ্ধতা ছিল না দেখে তিনি এতদিন চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু এবার তিনি প্রত্যক্ষ দেখলেন—বহু লোক একত্রে সমবেত হচ্ছে নগরের মধ্যে, তারা প্রশাসনের কোনো বিরোধিতা করছে না বটে, তবে নগরের যত্রতত্র এমন মনুষ্য-সমবায় কোন্ দিন কোন্ চেহারা নেবে, সেটা ভিন্নধর্মী প্রশাসকের মনে একটা সংশয় তৈরি করে রাখবে অবশ্যই। কাজি কীর্তনমত্ত জন-সমূহের ওপর চড়াও হলেন লোকজন নিয়ে। মাঝে-মাঝে ক্রোধ-হুংকার ছাড়তে আরম্ভ করলেন—আজি কি বা করে তোর নিমাঞি আচার্য।

কাজির ভয়ে সাধারণ মানুষজন অনেকেই পালিয়ে গেল। কীর্তনরত বৈষ্ণবদের খোল-মৃদঙ্গ অনেকগুলি ভেঙে দিলেন কাজি এবং বেশ কিছু লোককে তিনি মারধোরও করলেন—

> যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
> ভাঙিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।।

আসলে মুসলমান কাজির পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব ছিল না যে, এটা কোনো 'হিন্দু আপরাইজিং' নয়। বিশেষত এতদিন তিনি শাসন-কার্যে নিযুক্ত আছেন এবং নবদ্বীপকে এতদিন যেভাবে তিনি চিনেছেন তাতে বিদ্যাচর্চা, ধর্মচর্চা সবটাই ঘরের মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরে সংঘটিত হতে দেখেছেন। নগরের রাস্তায় এমন হরিনাম-সংকীর্তন, সাধারণ মানুষের মধ্যে চৈতন্য-ধর্ম নিয়ে এমন মাতোয়ারা ভাব—এটা তিনি কখনও দেখেননি, আর দেখেননি বলেই তাঁর মনে একটা দুর্ভাবনা সৃষ্টি হল যে, ভবিষ্যতে এই মনুষ্য-সমবায় শাসকের বিরুদ্ধে সংগঠিত না হয়। তাঁর মনে হল—সাধারণ মানুষ হিন্দুয়ানিতে মেতেছে এবং এমন হিন্দুয়ানি চলতে থাকলে তিনি জাতমারা করে ছাড়বেন হিন্দুদের। তাঁর সুস্পষ্ট হুংকার শোনা গেল নবদ্বীপের রাস্তায়—

কাজি বোলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া।।
ক্ষমা করি যাঙ আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগি পাইলে লৈব জাতি।।

কাজি প্রাণে মারবেন না, জাতি মারবেন—এই সামাজিক-মৃত্যুর ভয় নবদ্বীপবাসীকে আক্রান্ত, আচ্ছন্ন করে রাখল বেশ কয়েকদিন। বেশ কয়েকদিন কাজি তার দলবল নিয়ে নগরে-নগরে ঘুরলেন কিন্তু কোথায় কীর্তন, কোথায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ! চৈতন্য-ভক্তের কীর্তন-রঙ্গ বন্ধ হয়ে রইল কয়েকদিন। শাসকের তল্পিবাহক 'হিন্দু-কাজি'রা বলতে লাগল—বেশ হয়েছে। হরিনাম মনে-মনে করলে হচ্ছে না, এত হুড়াহুড়ি করে এত নাচন-কোদন করে হরিনাম করার কথা কোন্ শাস্ত্রে বলে! এদের কি জাত খোয়াবার ভয়টাও নেই—লঙ্ঘিবে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়। জাতি করিয়াও এ-গুলোর নাহি ভয়। তাঁরা চৈতন্য-নিত্যানন্দের উদ্দেশ্যেও কটূক্তি করতেও ছাড়ল না। বলল—এবার নিমাই পণ্ডিত বুঝবে—কাজির বাড়িটা কেমন লাগে। আর ওই যে নিত্যানন্দ—সময়-অসময় নেই নগরে-নগরে কীর্তন করে বেড়াচ্ছে, এবার সে বুঝবে ঠ্যালা—দেখো তার কোনো দিন বাহিরায় রঙ্গ।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের কাছে আবেদন-নিবেদন-সংবাদ এল—নগরে নগরে কীর্তন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিদিন লোকজন নিয়ে কাজি নজর রাখছে কীর্তনিয়া বৈষ্ণবদের ওপর। সব শুনে মহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ ক্রোধাবেশ হল বটে, তবে রাগ করে তিনি যেটা করতে চাইলেন, সেটাকে একটা সামগ্রিক বিপ্লব বলা চলে। সাধারণ মানুষকে একত্রিত করে সেই সংহত শক্তির মাধ্যমেই যে শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ হানা যেতে পারে, সেটা প্রথমে করে দেখালেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। তবে তাঁর এই প্রতিবাদের মধ্যে হানাহানি ছিল না, ছিল না সর্বনাশা আক্রমণ—যা সংঘশক্তিকে বর্বরোচিত করে তোলে।

চৈতন্য আদেশ দিলেন নিত্যানন্দ প্রভুকে—কেননা নগর কীর্তনের তিনিই প্রধান সূত্রধার। চৈতন্য বললেন—তুমি এই নবদ্বীপ-মণ্ডলের সবার ঘরে, সমস্ত বৈষ্ণবের কাছে গিয়ে বলবে যে, আমি নগর-সংকীর্তন করতে-করতে কাজির বাড়িতে যাব—সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন। ক্রোধাবেশে এমন কথাও তিনি বললেন যে, আজ আমি পুড়িয়ে দেব কাজির ঘর-বাড়ি, দেখি কে কোথায় শাসক আছে

আমাকে বাধা দেয়। আমার আদেশে আজ তুমি সবাইকে জানাবে—আজকে যারা কৃষ্ণের শক্তি দেখতে চায়, তারা যেন প্রত্যেকে এক-একটি বড় প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে আমার এখানে আসে। সকলেই দ্বিপ্রহরের খাওয়া-দাওয়া সারবে তাড়াতাড়ি এবং বিকেল হবার আগেই উপস্থিত হবে আমার কাছে—বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে।

মহাপ্রভুর এই বার্তা মুহূর্তের মধ্যে রটে গেল সর্ব নবদ্বীপে। অনেকে দ্বিপ্রহরের ভোজন বাদ দিয়ে দিল, বিশালাকার প্রদীপ বানিয়ে নবদ্বীপের নগরিয়া জন একে একে উপস্থিত হতে আরম্ভ করল মহাপ্রভুর আঙিনায়—নিমাঞি পণ্ডিত আজি নগরে নগরে। নাচিবেন ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে।। মহাপ্রভু বলেছিলেন—'মহাদীপ' নিয়ে আসবে প্রত্যেকটি মানুষ। এ কিন্তু মাটির প্রদীপ নয়, এ হল মশাল। মহাপ্রভুর নির্দেশ পাওয়া মাত্র ঘরে ঘরে মশাল বাঁধা শুরু হয়ে গেল—বাপও মশাল বাঁধছে ছেলেও মশাল বাঁধছে। কেউ বড়ো বড়ো করে মশাল বাঁধছে, কেউ বা একটার জায়গায় দশটা বাঁধছে এবং সেই মশালের তৈলপুর ফুরিয়ে গেলে যাতে পুনরায় তেলে চুবিয়ে জ্বালানো যায়, তার জন্য বড়ো বড়ো ভাণ্ডও নেওয়া হল—

তা বড় তা বড় করি সভেই বান্ধেন।
বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন।।

দ্বিপ্রহরের পর থেকে মহাপ্রভুর বাড়িতেও সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। নগর-সংকীর্তনের সময় যাঁরা কীর্তন করতে-করতে যাবেন, তাঁদের কে আগে যাবেন, কি পিছনে, কে মাঝখানে কিংবা কার সঙ্গে কে-কে থাকবেন এসব সম্বন্ধে একটা দলবিভাগের ভাবনা প্রকাশ করলেন মহাপ্রভু নিজে। আসলে যাঁরা এসব দেখেননি, কোনো সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে যাঁরা এগুলো বোঝেননি তাঁদের পক্ষে এই বিভাগ বোঝা খুব কঠিন। আমি ছোটোবেলা থেকে যেহেতু বহু শুদ্ধ বৈষ্ণবের আখড়া দেখেছি, বহু কীর্তন শুনেছি, সেই সুবাদে বলতে পারি—এ এক বিচিত্র অনুভব। এমন দেখেছি—এক-একজন মধুর কীর্তনীয়া তাঁর সমুচিত দোহারকির অভাবে, সঙ্গতের অভাবে, সহকারীর অভাবে তেমন করে গাইতে পারেন না। এমন দেখেছি—যিনি রাতের গভীরে অসাধারণ কীর্তন করেন, তিনি সন্ধ্যারতি-কীর্তনের সময়ে একেবারেই স্তিমিত। এমন দেখেছি—যিনি একজনের সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল ছোটাতে পারেন, আরেকজনের গায়েনের সঙ্গে তিনি অতি সাধারণ। জেনে রাখুন—এই সব কিন্তু শ্রাদ্ধ-বাড়িতে অথবা অর্ডারি অষ্টপ্রহরে ভাড়াটে কীর্তন

গানের কথা বলছি না—এসব আমার মান্য বৈষ্ণব-স্থানে দেখা-শোনা অনুভবসিদ্ধ কথা। আসলে মানুষের ব্যক্তিগত সুরজ্ঞান, তালজ্ঞান, চরিত্র, ভাব-অনুরাগ এবং সংস্কার বিশেষত বৈষ্ণবীয় সংস্কার—এগুলি সব একত্র হয়ে তাঁর সহকারী, অনুকারী তৈরি করে ফেলে। দিনের পর দিন কীর্তন, অসচেতন প্রয়াস পরীক্ষা এবং ভুল, রাতের পর রাত তেমন সঙ্গীর সঙ্গ—এই সমস্ত কিছুই সম্মিলিত কীর্তনের অভিপ্রেত সম্প্রদায় সৃষ্টি করে ফেলে।

মহাপ্রভু বললেন—কাজির কাছে যাবার জন্য বিরাট কীর্তনের দল বেরবে, তাতে 'আগে নৃত্য করিবেন আচার্য গোঁসাই' এবং তার পিছনে একটি কীর্তনের সম্প্রদায় থাকবে। অর্থাৎ অদ্বৈত আচার্য যাবেন সবার সামনে—চৈতন্য গোষ্ঠীর তিনিই বৃদ্ধতম ব্যক্তি, তিনি চৈতন্য ধর্মের চৈতন্য-পূর্ব প্রকাশ, অতএব তিনি সবার আগে যাবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এমন কীর্তন-রঙ্গের অগ্রভাগে এমন বৃদ্ধ আচার্যকে কত দেখেছি—তাঁরা যে সব সময় খুব ভালো কীর্তন গান করেন অথবা উদ্বাহু নৃত্য করেন, তাও নয়। কিন্তু তাঁর সম্মান, তাঁর মর্যাদা এবং গুরুত্ব তাঁকে অগ্রবর্তী করে। আজকে মহাপ্রভুর এই নগর-সংকীর্তনে মাঝখানে এক বিরাট দল নিয়ে থাকবেন ঠাকুর হরিদাস। এরও কারণ আছে। ঠাকুর হরিদাস নিজে মুসলমান গোষ্ঠীর মানুষ, তাঁকে নিয়ে আগে অনেক তর্ক-বিতর্ক, অত্যাচার, নিপীড়ন হয়ে গেছে। আপন ধর্ম ছেড়ে হরিনাম মুখে আনার জন্য শাসকের ক্রোধাগ্নি আত্মসাৎ করতে হয়েছে তাঁকে। পর পর বাইশটি বাজারে নিয়ে গিয়ে সবার সামনে তাঁকে বেত্রাঘাত করেছে প্রশাসনিক রাজপুরুষ। তবু তাঁকে নিজের অভীষ্ট থেকে ভ্রষ্ট করা যায়নি।

মহাপ্রভু হরিদাসকে মাঝখানে রেখে একদিকে কাজিকে ইঙ্গিতে বোঝাবেন যে, ধর্মপালনের অধিকার, ধর্ম-পরিবর্তনের অধিকার মানুষের একান্ত নিজস্ব এবং ধর্মের অন্তর্গত সার ঈশ্বরানুভূতির আনন্দ শাসকের নিপীড়ন অতিক্রম করেও বেঁচে থাকে এবং থাকবে। হরিদাসকে মাঝখানে রেখে নবদ্বীপের সংরক্ষণশীল স্মার্ত সমাজের মুখেও সম্মার্জনীর আঘাত ঠুকে দিলেন মহাপ্রভু। বুঝিয়ে দিলেন—এতদিন এই ছিল যে, হিন্দু জন-জাতির মানুষ খুঁটিনাটি নানা কারণে সমাজচ্যুত হত এবং একবার সমাজচ্যুত হলে হিন্দুধর্মে তার আর প্রবেশ-পথ থাকে না। চৈতন্য-ধর্মে এমন হবে না, সূর্য-চন্দ্রের আলোক-বিকিরণ যেমন শূদ্র চণ্ডালের জাতি-তত্ত্ব বুঝে বিকীর্ণ হয় না, তেমনই চৈতন্যধর্মও এই বাহ্য জাতিসংস্কার নিয়ে বিব্রত নয়, এখানে সবার স্থান আছে—তাঁদের সাধারণ-সামান্য ধর্ম হল হরিনাম-সংকীর্তন। আচার-বিচারের

বালাই নেই, জাতি-বর্ণের বালাই নেই, উত্তম-অধমের ভেদ বিবেক নেই, এমনকি অন্য ধর্মীরও প্রবেশ আছে এখানে। হিন্দু-সংরক্ষণশীলতায় তিনি যেমন বিচার্য হোন—চৈতন্য বুঝিয়ে দিলেন—তাঁর কাছে যবন হরিদাস শুধু হরিনামে সিদ্ধ বলেই আজকের সংকীর্তন-যজ্ঞের মধ্যমণি। তাঁর আদেশ—

মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ।।

অর্থাৎ যবন হরিদাস মাঝখানে থাকবেন, আর তাঁর পিছনে অনুগামী হয়ে কীর্তন করবেন হিন্দু-কীর্তনীয়ার বিরাট এক দল। সবার পিছনে শ্রীবাস পণ্ডিত—যাঁর বাড়িতে মহাপ্রভুর প্রথম আত্মপ্রকাশ, যাঁকে এতকাল লোকে রাজনৈতিক শাসকের ভয় দেখিয়েছে এবং যিনি অনেক উপরোধ সহ্য করেও চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবমণ্ডলীকে নিজের ঘরে 'আঁতুড়' তোলার মতো করে আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁকে আজকে নগরকীর্তনের পুচ্ছভাগে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মহাপ্রভু বুঝিয়ে দিলেন—শ্রীবাস পণ্ডিত চৈতন্য-সংগঠনের শেষ দুর্গরক্ষক। হয়তো এই কারণেই চরিতকার এই নগর-কীর্তনের সংস্থানকে মহাপ্রভুর অঙ্গ উপাঙ্গ পরিষদ বর্গকে ভাগবত পুরাণের ভাষা আত্মসাৎ করে অস্ত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন—সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পরিষদে প্রভু নাচে—সাঙ্গোপাঙ্গো'স্ত্রপার্ষদঃ।

মধ্যাহ্ন চলে গিয়ে অপরাহ্নের বেলা এল। দলে দলে লোক মশাল-দীপ জ্বালিয়ে উপস্থিত হল শ্রীবাসের বাড়ির সামনে। মাঝে মাঝে হরিধ্বনি উঠেছে আকাশে, অনন্ত দীপালোকে ভগবান কৃষ্ণ যেন জ্যোতিরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন নদীয়ায়। প্রভুর নগর-সংকীর্তন উপলক্ষ্যে নবদ্বীপের গৃহস্থ-বাড়িতেও নতুন সমারোহ তৈরি হয়েছিল। ঘরে-ঘরে জ্বালা হয়েছিল প্রদীপ, ঘরের দোরে পূর্ণঘট, আমের পল্লব। সন্ধ্যার অন্ধকার আসার আগেই মহাপ্রভুর নগর-সংকীর্তনের দল বেরিয়ে পড়ল গঙ্গার তীর ধরে। আরম্ভ হল হরিনাম। বেজে উঠল খোল-মৃদঙ্গ করতাল। কীর্তন যাবার পাথে বহুতর লোক—যাঁরা আগে আসেননি—তাঁরাও বাড়ি ছেড়ে যোগ দিচ্ছেন কীর্তনের সমারোহে। এ এক অদ্ভুত সমারোহ, যেখানে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য নেই, মানীও তার মান বিসর্জন দিয়ে হরিধ্বনিতে গলা মেলাচ্ছেন। এমনকী যে চোর ব্যাবাক ঘর খালি দেখে চুরি করবে ভেবেছিল—'সেই চোর পাসরিল আপন বেভার—' সেও 'হরি' বলে যোগ দিল এই মহা-সমারোহে।

বহুজনের সমারোহ ঘটলে এমনই হয়, ব্যক্তির ব্যক্তিগত ধর্ম, সমাজ ব্যবহার, সংস্কার গাম্ভীর্য সব ধুলোয় গড়াগড়ি যায়। পূর্বের ভাবনা-মতো আচার্য অদ্বৈত, হরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীবাস তাঁদের গীত-নৃত্যের সম্প্রদায় নিয়ে চলেছেন। মহাপ্রভু স্বতন্ত্র, তিনি সকলের পিছনে কীর্তনানন্দে চলেছেন নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে। মহাপ্রভুর ভক্ত যত, কত বা নাম বলব তাঁদের—গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, শ্রীধর—কত, কত নাম করব—'কেহ গায়, কেহ বায়, কেহ মাঝে নাচে।' নগর-কীর্তনে কীর্তনীয়ার দল যত এগিয়ে যাচ্ছিল, তাতে কীর্তনানন্দ এতটাই প্রধান যে, মোটেই এটা বোঝা যাচ্ছিল না—মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গের অস্ত্র নিয়ে বিধর্মী কাজিকে শায়েস্তা করতে যাচ্ছেন।

কীর্তন-সমারোহ চলল গঙ্গার তীর ধরে। চরিতকার এই কীর্তন ভ্রমণের ভৌগোলিক উত্তরণ দেখিয়েছেন গঙ্গার ঘাটের 'ল্যান্ডমার্ক'-গুলি উল্লেখ করে। গঙ্গার যে ঘাটে মহাপ্রভু স্নান করতেন সেই ঘাটের ওপর দিয়ে কীর্তন মিছিল গেল মাধাইয়ের ঘাটে। জগাই-মাধাই দুই ভাই, তার একজন হলেন মাধাই। মহাপ্রভু-নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করার পর দুই পাষণ্ডী ভাইয়ের হৃদয় পরিবর্তন ঘটেছিল। সাধন-ভজন-পরায়ণতার কথা ছেড়েই দিলাম। সেই থেকে দুই ভাইয়ের অন্যতম মাধাই বিশেষ একটি গঙ্গা-ঘাট পরিষ্কার রাখত, কোদাল দিয়ে মাটি কেটে সেই ঘাটটিকে সে স্নানপুণ্যার্থী মানুষের গমনযোগ্য করে তুলত। সেই থেকে সেই ঘাটটির নামই হয়ে গেল 'মাধাইয়ের ঘাট'। নগর সংকীর্তন মাধাই-এর ঘাট হয়ে এসে পড়ল বারকোনা ঘাটে—এ ঘাটের আধুনিক নাম বারগোরা বা বারগোলা ঘাট। সেখান থেকে নগরিয়া ঘাট হয়ে কীর্তনের দল উপস্থিত হল গঙ্গানগর। এখনও পর্যন্ত এই সব স্থান-নাম অপরিবর্তিত আছে। গঙ্গানগর থেকে মহাপ্রভু চলে এলেন সিমুলিয়া—নবদ্বীপ থেকে উত্তরে সেটা মোটামুটি এক ক্রোশ। কাজির বাড়ি আর তেমন দূরে নয়। এখন কাজির বাড়ি গঙ্গার ওপারে মায়াপুরে। কিন্তু তখন গঙ্গা যেমন বইত, তাতে ওই জায়গা নবদ্বীপের পারেই ছিল।

সাধারণ মানুষ, যারা কীর্তনের মহাসমারোহে শামিল হয়েছিল, তারা, এমনকী সামান্য ভক্তেরাও এই একত্রিত শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মুহুর্মুহু কাজিকে মেরে ফেলার ডাক ছাড়ছিলেন। বার-বার চেঁচাচ্ছিলেন—'ধর ধর কোথা কাজি ভাগিয়া পলায়'। এই পরাক্রম হুংকার যতই সত্য হোক এসব একেবারেই সাধারণ মানুষের একত্র সমাবেশের শক্তিজাত হুংকার, এ বড়োই একদেশিক, বড়োই পরোক্ষ।

মহাপ্রভু যে-ভাবে, যে-রসে এই সংকীর্তন-সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তাতে এটুকু তিনি সহজেই বুঝে গিয়েছিলেন যে, এই বহুল জন-সমাবেশই কাজিকে ভয় পাইয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, এর জন্য তাঁকে হুংকার পরাক্রম দেখাতে হবে না। চরিতকার বৃন্দাবন দাস কিন্তু সরল সোজা মানুষ, তিনি এই বিচিত্র জন-সমাবেশ মহাপ্রভুর মুখ দিয়েও এমন কথা বার করেছেন, যা তাঁর ভাবোল্লাসী চরিত্রের সঙ্গে ঠিক মানায় না। বৃন্দাবন দাস নগর-সংকীর্তনে যাবার সময়েও মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞানহীন পরম ভক্তিভাব বর্ণনা করছেন, অন্যদিকে সেই তিনিই কাজির ঘরে এসে তাঁর ঘর-বাড়ি-বাগান তছনছ করার আদেশ দিচ্ছেন, অথবা তার বাড়ি পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন—এমনটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

বৃন্দাবন দাসের বয়ান অনুযায়ী, প্রথমত এমন বৃহৎ জনসমাবেশের খবর শুনে মুসলমান কাজি তাঁর আপন পদাধিকার-স্মৃতিতে প্রচুর তর্জন-গর্জন করেছিলেন। অনুচরকে বলেছিলেন—জেনে এসো এত গীত-বাদ্যের ধ্বনি কীসের জন্য, এটা কি বিয়ের বরযাত্রী যাচ্ছে, নাকি ভূতের কীর্তন? কারই বা এত সাহস যে, আমার কথা অতিক্রম করে এত 'হিন্দুয়ানি' দেখাচ্ছে? কাজির অনুচর সংকীর্তন-সমারোহ দেখে ভয় পেয়েছিল, এমনকী সে নিজের মাথার পাগড়ি ফেলে দিয়ে হিন্দু সাজারও চেষ্টা করেছিল সাময়িকভাবে। সব দেখে এসে সে কাজিকে পালিয়ে যাবার অনুরোধ করেছিল। মশাল-জ্বালা সেই বিরাট কীর্তন-সমারোহের বর্ণনা দিয়ে কাজির অনুচর বলেছিল—লোকজন এমন অনুগতভাবে নিমাই পণ্ডিতের পিছন পিছন আসছে, এতই তাদের সমারোহ-ভাব যে, রাজা আসলেও লোকে এমন করে না। সব চেয়ে বড়ো কথা—আমরা যেসব নগরবাসীকে হিন্দুয়ানি-কীর্তনের দায়ে মারধোর করেছিলাম, তাঁরা এখন 'কাজি মার' 'কাজি মার' বলে ধেয়ে আসছে, আর এখানে যে হিন্দুর ভূতটি আছে, সে হল সেই নিমাই পণ্ডিত, এগুলো সব তারই কাজ—সেই সে হিন্দুর ভূত এ তাহার কার্য্য।

তবু এমন হুঁশিয়ারির মধ্যেও অনুচরের বর্ণনায় মহাপ্রভুর যে মুখচ্ছবি আছে, সেখানেও কীর্তনের মধ্যে তিনি একবার ভাবোল্লাসে কেঁদে ভাসাচ্ছেন, কখনও বা আছাড় খাচ্ছেন মাটিতে। আমরা নগর-সংকীর্তন চলাকালীন সময়েও প্রভুকে কেমন বিবিক্ত দেখছি। যেখানে নবদ্বীপের নগরিয়া সব হরিধ্বনি আর কৃষ্ণনাম করছেন, সেখানে মহাপ্রভু আপন বিবিক্ত মনে ধ্রুপদী সঙ্গীতের সুর ধরেছেন কৃষ্ণ স্মরণ সরসতায়—

তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
সারঙ্গধর! তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।।

বৃন্দাবন দাস বলেছেন—'চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্তন।' যিনি এই ধ্রুপদী কীর্তন গাইছেন আপন রসে, তিনিই কৃষ্ণস্মরণে মাটিতে আছাড় খাবেন, অথবা তাঁর চোখ দিয়ে বইবে বিরহীর বিধুর নয়নধারা—এমনকী কাজির অনুচরও তাতে অবাক হয়ে এসে বলবে—'বামনা আছাড় যত খায়' 'বামনা এতেক কান্দে কেনে'। কিন্তু সেই মানুষটাই হঠাৎ ভাব পরিবর্তন করে বলবেন—কাজি-বেটা কোথায় গেল? তার মাথা কেটে ফেলব। কাজির বাড়ি ভাঙ, বাড়িতে আগুন দাও—এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এসব কথা মহাপ্রভুর মুখ দিয়ে বেরনোর কথা নয়। এমন কঠিন নির্দেশ তাঁর এখনকার পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সযৌক্তিক হয়ে ওঠে না। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় কাজি প্রথমে অনেক তর্জন-গর্জন করে বলেছিলেন—আমাকে অতিক্রম করে হিন্দুয়ানি করলে তার জাতি মারব আমি—

এবা নহে মোর লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আমি সভার নগরে।।

যখন বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার চলছে এবং মুসলমান কাজির হাতেও যথেষ্ট অধিকার আছে, সেখানে এমন তর্জন-গর্জন অসত্য নাও হতে পারে। ইতস্তত বলাৎকৃত ধর্মান্তর করার কাজও সে যুগে অসত্য ছিল না, কিন্তু বঙ্গদেশের মুসলমান শাসনের ভাবটা তখন এমন তালেই চলছিল যে, কাজি মুখে যতই তর্জন-গর্জন করুন, তিনি আপন ধর্মবোধে বেহুঁশ হয়েছিলেন এমনটাও হবার সম্ভাবনা কম। আবার পিছনে জন-সমারোহ আছে বলেই মহাপ্রভুর মতো ব্যক্তিত্ব হঠাৎই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে কাজির ঘর-দোর ভেঙে ফেলতে বলবেন অথবা তাঁর বাড়ি পুড়িয়ে দিতে বলবেন—এমনটাও হবার কথা নয়। অন্তত সেটা বিপরীত মনে হয়, প্রভুর স্বভাবের বিপরীত। বৃন্দাবন দাসের কাজি প্রথমে অনেক তর্জনগর্জন করে প্রাণভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলেন সানুচরে, সপরিবারে—

শুনিয়া কম্পিত কাজি গণ সহে ধায়।
সর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়।।

কিন্তু বঙ্গের শাসনাধিকার যেমন ছিল, তাতে প্রশাসকের দায়িত্ব সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে কাজি ভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবেন, এমনটা বোধহয় ইচ্ছাপূরণের কাহিনি হয়ে যাবে। বরঞ্চ এ বাবদে চৈতন্য চরিতামৃত-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রুত বিবরণ

অনেক বেশি বিশ্বাস্য এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। একটা বিশাল জনসমারোহের সার্বিক এবং সর্বকালিক চরিত্রই এমন হয়, যেখানে বিভিন্ন এবং বিচিত্র স্বভাবের মানুষ থাকেন। এমন সমারোহে যিনি নেতৃত্ব দেন, তাঁর উদ্দেশ্য এবং তদ্ভাব-ভাবিত জনের অধিকাংশের উদ্দেশ্য এক রকম হলেও সমস্ত সাধারণ মানুষের ওপর নেতার কর্তৃত্ব এবং নিয়ম সম্পূর্ণ কাজ করে না। অন্তত একাংশে তো কাজ করেই না, কেননা তাদের সমারোহে যোগ দেওয়াটাই অনেকটা হুজুগে যোগ দেওয়ার মতো। প্রথম প্রতিরুদ্ধ হয়ে নেতা ব্যক্তি যে প্রথম হুংকারটি ছাড়েন, সাধারণ অনর্থকারী হুজুগে মানুষ ভাবেন—সেই হুংকারটাই বোধহয় সব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেতা যে সামগ্রিক রাষ্ট্র এবং সমাজের পরিস্থিতি অনুসারেই সিদ্ধান্ত নেন—সেটা অনর্থকারী সাধারণকে কে বোঝাবে!

এখানেও তো মহাপ্রভু তাঁর সংকীর্তনে কাজি সাহেবের প্রতিরোধ দেখে প্রথমে হুংকার ছেড়েছিলেন—দেখি কোন কাজি আজি করে নিবারণ।। আজি সংহারিব আমি সকল যবন। কিন্তু বাস্তবে এটা উদ্দেশ্য বাধিত হওয়ার প্রথম হুংকার, এই হুংকারের মধ্যে সত্য নেই। প্রতিরোধ হিসেবে মহাপ্রভু যেটা করেছেন সেটা ওই বৃহৎ জনসমাবেশ—যেটা গৌণভাবে আয়োজিত হলেও বিরুদ্ধ পক্ষের কাছে সেটা ত্রাসজনক প্রতিবাদ। কিন্তু মুখ্যত আজই মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনের গোপন ভজন-কুটির থেকে নেমে এলেন সবার সামনে। বলেছিলেন—নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন। দেখি কোন কাজি আসি করে নিবারণ। যে মহাপ্রভু এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন, তিনি আজ এই বৃহৎ জনসমাবেশে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, নবদ্বীপবাসীর কাছে এ ছিল চরম সার্থকতার দিন। কাজেই ভক্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে অন্যান্য অনেক মানুষই জুটে গিয়েছিলেন সেদিনের কীর্তন রঙ্গে। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন সে কথা। বলেছেন—যে যে জায়গায় মহাপ্রভু তাঁর কীর্তন সমাবেশ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছিলেন, সেখানে সেখানেই 'গৃহবৃত্ত পরিহরি শুনি লোকে ধায়'। বিশেষত এই বিশাল নগর-সংকীর্তনের মধ্যেও মহাপ্রভুর ভক্তিভাব স্ফূর্ত সাত্ত্বিকভাবগুলি এমনই প্রকট ছিল যে—

সে কম্প সে ঘর্ম সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্তবৃত্তি করয়ে নাচিতে।।

কাজেই এই কীর্তন সমাবেশের মধ্যে এমন মানুষও যথেষ্টই ছিলেন, যারা মহাপ্রভুর সেই প্রথম প্রতিরোধ-হুংকারটুকুই শেষ মনে রেখেছে। মহাপ্রভুর

সংকীর্তন-সমাবেশ যখন কাজির বাড়ির সামনে এসে পৌঁছুল, তখন এই আবেগপ্রবণ হুজুগে মানুষগুলির প্রকৃত স্বরূপ প্রকট হয়ে পড়ল এবং এই অবস্থায় এক বিশাল সমাবেশ-পুষ্ট মানুষের কী মনস্তত্ত্ব হতে পারে তা সবচেয়ে ভালো ধরেছেন চৈতন্যচরিতামৃত-এর কবি। তিনি বলেছেন—'কাজি কিংবা যবন ধ্বংস করব' বলে প্রভু যে প্রথম প্রতিরোধ-শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, সেটাই বুঝি বৃহৎ নেতৃত্বের প্রশ্রয়—যেমনটি অহরহ দেখবেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—নেতারা কেমন কঠিন শব্দ উচ্চারণ করে সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তোলেন। মহাপ্রভু কোনো রাজনৈতিক নেতা নন, কিন্তু বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তখন তাঁর প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর কথা লোকে মানছে এবং তাঁর মতো এক মান্য ব্যক্তিত্ব যখন অন্যধর্মী শাসক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করে বিশাল জন-সমাবেশ সহ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হচ্ছেন, তখন এতদিনের শাসন-ত্রস্ত মানুষ একটা নতুন বল পেয়ে যায়। তখন শান্ত সভ্যতার বদলে অনর্থ অ-ব্যাপার ঘটতে থাকে। যার ফলে কাজির ফল-ফুলের বাগানও কিছু নষ্ট হয়েছে এবং সাধারণ অনর্থপ্রিয় মানুষ সাময়িক জনসমাবেশের বলে বেশ তর্জনগর্জনও করতে আরম্ভ করল। চরিতামৃতকার তাদের মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করে বলেছেন—

তর্জন গর্জন করি করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল।।

অসাধারণ এই শব্দের প্রয়োগ—প্রশ্রয় পাগল—অর্থাৎ সামান্য প্রশ্রয় পেলে যারা পাগলের মতো আচরণ করে। যেহেতু একবার চৈতন্য বলেছিলেন—ধ্বংস করব কাজিকে, সেই প্রশ্রয়টুকু শাসকের শাসন-পীড়িত হৃদয়ে এমনভাবেই ক্রিয়া করেছে, যাতে একটা প্রতিশোধের ভাব চলে এসেছে। তারা উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শক্তি এবং ব্যক্তিত্বকে মাথায় রেখেও বলা যায়, তিনিও সাময়িকভাবে এই সমস্ত মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। কেননা যে-কোনো উল্লাসের প্রাথমিক প্রকাশের সময়ে যেমনটি হয় হয়তো সেটাকেই সাধারণ মানুষ প্রশ্রয় বলে ধরে নিয়েছে।

চৈতন্য চরিতামৃত-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ এমনই এক পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব যে, তিনি যখন পূর্বর্তন জীবনীকার বৃন্দাবন দাসকে অতিক্রম করেন, তখন এমনভাবেই করেন, যাতে তাঁর এতটুকু মর্যাদাহানি না হয়। রাজনৈতিক নিপীড়ন হেতু সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিক্ষোভটুকু বৃন্দাবন দাসের জবানীতে প্রকাশ পেয়েছে অথবা

যা হয়তো নিতান্তই বৃন্দাবন দাসের একান্ত কল্পিত ভাবনা—সেটাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মানতে না চাইলে ছোটো করে লিখেছেন—'বিস্তারিত বর্ণিলা ইহা বৃন্দাবন দাস'। কিন্তু এর পরেই কবিরাজ নিজে যেমন শুনেছেন, তেমনটি বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে—এই জায়গায় তিনি পূর্বের জীবনীকারের সঙ্গে একমত নন।

এখানেও তাই ঘটেছে। এটাই পরম বাস্তব যে, মহাপ্রভুর মতো ব্যক্তিত্ব বিরুদ্ধধর্মী শাসকের ঘর-বাড়ি ভেঙে পুড়িয়ে দেবার আদেশ দেবেন—এমনটা হতেই পারে না এবং শাসক সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিনিধিও সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবেন, তাও হতে পারে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, তখনকার সুলতানি শাসনে হুসেন শাহের আমলে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক এমন ক্রূর পর্যায়ে অবশিষ্ট হয়নি, যাতে কোনো পক্ষই ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন। হ্যাঁ, ভিন্নধর্মী শাসকের প্রতিনিধি যাঁরা, তাঁদের নিজস্ব চরিত্র অনুসারে শাসনের দিক থেকে কোথাও কোনো অতিরেক বা বাড়াবাড়ি হয়ে থাকতেই পারে, কিন্তু সেই বাড়াবাড়ির প্রতিরোধটাও তেমন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে—এটা মহাপ্রভু চৈতন্যের বিশাল মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায় না। চৈতন্যচরিতামৃত-র ভাষায়—'উদ্ধত লোক ভাঙে কাজির পুষ্প বন'। কিন্তু এইটুকুই, তারপরেই মহাপ্রভু কাজির বাড়ির দুয়ারে এসে বসেছেন এবং ভব্য সভ্য সুজন মানুষকে দিয়ে কাজিকে ডেকে পাঠিয়েছেন—ভদ্র লোক পাঠাইয়া কাজি বোলাইলা। কাজি মোটেই ভেক বা ইঁদুরের মতো ভয়ে পালিয়ে যাননি।

কাজি মহাপ্রভুর ব্যক্তিত্ব অনুধাবন করেই আপন দোষ বুঝেছেন। চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলন যে কোনো রাজনৈতিক উত্থান নয়, অথবা তাঁর কীর্তন-প্রচার যে ভিন্নধর্মী শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিন্দুয়ানির জাগরণ নয়—এটা কাজি বুঝেছিলেন বলেই চৈতন্যের কাছে এসেছেন মাথা নীচু করে। কাজি সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু তাঁকে যথোচিত সম্মান দিয়ে বসিয়েছেন এবং কথা আরম্ভ করেছেন। প্রতিশোধের সমস্ত ভাবনা ছেড়ে, সপরিহাসে, লঘু ভাষায়। প্রভু বলেছেন—আমি তোমার বাড়িতে এসেছি সকলকে নিয়ে, আমি তোমার অভ্যাগত, সেখানে আমাকে দেখে তুমি ঘরে গিয়ে লুকোলে—এ কোথাকার ধর্ম? আমার ধর্ম, তোমার ধর্ম—কোনোটাতেই তো এমন বলে না। অতিথি বলে কথা। কাজি বললেন—কারণ, তাঁর কাছে এই রকমই খবর ছিল, তাই সেই খেয়ালেই কাজি বললেন—তুমি তো ক্রুদ্ধ হয়ে এমন জনসমাবেশ ঘটিয়ে আমার বাড়ি এলে, তাই

তোমার ক্রোধটুকু যাতে আগে শান্ত হয়, সেইজন্যেই ঘরে দুয়োর দিয়ে বসেছিলাম। এখন তুমি শান্ত হয়েছ, ভব্য-সুজনকে পাঠিয়েছ আমায় ডাকতে। তাই আমিও এসেছি তোমার কাছে। আমার একথা ভেবে ভালো লাগছে যে তোমার মতো এক অতিথি আজ আমার ঘরে এসেছে।

মুসলমান কাজি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রতিনিধি হলেও এবং শাসকের বাহুবল, অস্ত্রবল তাঁর হাতের মধ্যে থাকলেও এমন বৃহৎ জনসমাবেশ দেখে কাজি মনে-মনে অবশ্যই একটু ভয় পেয়েছেন। মহাপ্রভু যে নগর-সংকীর্তন নিয়ে এসেছেন, সেটাকে হরিনামের 'স্লোগান' বলতে আমার আপত্তি আছে, তবে এটা তিনি অবশ্যই বুঝেছিলেন যে, নিরস্ত্র, শাসিত মানুষকে যদি প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হয়, তবে সকলের একত্র হওয়াটা খুব জরুরি এবং একটা বৃহৎ সমাবেশ যদি পায়ে পায়ে বিরুদ্ধ শাসকের বাড়ির সামনে অত্যন্ত ভব্য হয়েও দাঁড়ায়, তবুও তার মনে-মনে ভয় হতে বাধ্য। আমরা কাজিকে এখন তথাকথিত 'হিন্দুর ভূত' মহাপ্রভুর সঙ্গে কেমন একটা ভাব জমাতে দেখছি এবং চৈতন্যচরিতামৃত-কারের এই বয়ান খুব স্বাভাবিক মনে হয়।

কাজি বললেন—বাছা! তোমার যিনি দাদু, তোমার মায়ের পিতাঠাকুর—নীলাম্বর চক্রবর্তী, তিনি গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা হন। আর একথা মনে রেখো—রক্তের সম্বন্ধে যত চাচা-কাকা আছে, তার থেকে গাঁয়ে যাকে চাচা বলে মেনেছি, সে সম্বন্ধটা অনেক বড়ো। আর সেদিক থেকে দেখতে গেলে তুমি হলে আমার ভাগনে। তা বাছা! ভাগনে যদি তেমন রেগে যায়, তখন মামারা সেটা মেনেই নেয়, সহ্য করে। আবার অন্যদিকে মামাও যদি একটা ভুল করে ফেলে, তখন ভাগনেও সেটা তেমন করে ধরে না, সেটা ভুলে যেতে হয়—

ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।।

গ্রাম-সম্বন্ধে সরসতা উল্লেখ করে কাজি চৈতন্যের সঙ্গে যেভাবে মামা-ভাগনের সম্পর্ক পাতিয়ে নিলেন, তাতে একদিকে যেমন এটা প্রমাণ হল যে, এই বৃহৎ জনসমাবেশের মুখে কাজি চৈতন্যের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চাইছেন, অন্যদিকে এটাও কিন্তু পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, মহাপ্রভুর সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কও একটা বোঝাবুঝির জায়গাতেই অবস্থিত ছিল। অন্তত সেটা বিপদসীমার ওপরে চলে যায়নি। যদিও চাপা উত্তেজনা একটা অবশ্যই ছিল এবং কখন কী ঘটবে, সেটা

সংশয়াতীত ছিল না কোনো মতেই। কাজি এবং চৈতন্য একসঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন—দূরে দাঁড়ানো নদীয়ার নগরিয়া, কীর্তনীয়ারা সেসব বুঝতে পারছিল না বটে, কিন্তু ভরসা পাচ্ছিল যথেষ্ট।

চৈতন্যের সঙ্গে কাজির কথোপকথনে চৈতন্যচরিতামৃত-কার যেভাবে উপস্থাপনা করেছেন, সেটা যদি তাঁর কল্পিত উচ্চারণও হয়, তবু বলতে হবে যে, শাসক মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্ত আচরণের মধ্যে যে বিষয়টি তৎকালীন হিন্দু সমাজকে সবচেয়ে বেশি আহত করত, সেটা বোধহয় গোমাংস-ভক্ষণ। এ বিষয়ে যে যুক্তি এখনও দেওয়া হয় এবং গো-মাংসভোজী হিন্দুরাও যে যুক্তি উল্লেখ করে থাকেন, সেটা সেই পুরাতন যুক্তি—বৈদিক যুগে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না এবং শ্রৌতযজ্ঞে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ গোবধে অংশগ্রহণ করতেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে গোমাংস ভক্ষণের জন্য যে ক্ষোভটুকু প্রকাশ পেয়েছে, তার বিরুদ্ধে কাজি সেই শ্রৌতযজ্ঞে গোবধের যুক্তিই উল্লেখ করেছেন। চৈতন্য অবশ্যই একথা মানেননি। ইতিহাসের অনুক্রমে হিন্দুদের মধ্যে গোবধ যে অতি-প্রাচীন কালেই এক সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—তার কারণ লৌকিকভাবে দেখতে গেলে গোরুর মাংসের চেয়ে গোরুর দুধের সম্বন্ধে অধিক প্রয়োজনীয়তা-বোধ এবং হয়তো এই প্রয়োজন-বোধ থেকেই গোহত্যা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হতে থাকে উপনিষদ-পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র এবং মহাভারত-রামায়ণের মধ্যে।

চৈতন্য চরিতামৃত-র কবিও একটি পুরাণ-বাক্যই উদ্ধার করেছেন মহাপ্রভুর যুক্তির সপক্ষে, যদিও মহাপ্রভু সেটা কাজির সম্মুখে ব্যবহার করেছিলেন কিনা, তা জানা নেই। তবে ব্যবহার না করলেও শাসক মুসলমানদের এই গোবধের ভাবনাটি সম্বন্ধে তৎকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ কীরকম ছিল, তা প্রমাণ হয়ে যায় মহাপ্রভুর মুখে এই পুরাণ-বাক্য বসিয়ে দেওয়ায়। অন্যদিকে গোহত্যাকারীর চরম পাপ-স্পর্শ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর সতর্কবাণীর প্রতিযুক্তিতে কাজি যে বলেছেন—আমার পরম্পরা-গত শাস্ত্র তোমার শাস্ত্রের থেকে আধুনিক এবং জাতি-বৃত্তির অনুরোধে এই শাস্ত্র আমাকে মানতে হয়—এটাও পরকীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে তৎকালীন মুসলমান শাসকের সহিষ্ণুতা-বোধের পরিচয় দেয়। চরিতামৃত-কার বুঝিয়ে দিয়েছেন—এই নিয়ে তর্ক চলে না, যার যার শাস্ত্র, তার তার কাছে চরম প্রমাণ-বহ—

কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি।।

কাজির সঙ্গে মহাপ্রভুর কথা-প্রসঙ্গ আমরা একটু বেশিই আলোচনা করছি, এবং তা এই কারণে করছি যে, এই কথোপকথন থেকে তৎকালীন সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ খানিকটা প্রকট হয়ে ওঠে। কাজি যখন ঘনিষ্ঠ হয়েই কথা বলতে আরম্ভ করলেন মহাপ্রভুর সঙ্গে, তখন ততোধিক ঘনিষ্ঠতায় তিনি কাজিকে 'মামা'-সম্বোধন করে বললেন—এবার একটা সত্যি কথা বল দেখি, মামা! সেদিন তুমি আমাদের কীর্তন-রঙ্গে বাধা দিয়ে আমাদের মৃদঙ্গ ভেঙে দিয়ে এলে, কিন্তু তার পরেও তো নগর-সংকীর্তন অনেক হয়েছে, অনেক চলছেও নবদ্বীপে, কই তুমি তো আর বাধা দাওনি—

তুমি কাজি হিন্দু ধর্ম বাধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি।।

এই প্রশ্নের উত্তরে কাজি প্রথমে কিছু অলৌকিক বৃত্তান্তের কথা বলেছেন, কিন্তু তার পরেই আসল কথাটি বেরিয়ে এসেছে। কাজি বলেছেন—তাঁর স্বপ্নে নাকি নৃসিংহদেব এসে তাঁকে মারধর করেছেন এবং কাজি পেয়াদা পাঠিয়ে কীর্তন নিষেধ করতে গেলে সেই পেয়াদার সুরক্ষিত দাঁড়িটি পুড়ে গেছে। কাজি এবার ভয় পেয়ে পেয়াদাদের আদেশ দিয়েছেন—কীর্তনের বিঘ্ন না ঘটাতে। এই কাহিনি বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। কিন্তু কাহিনির ব্যবচ্ছেদ ঘটালে উল্টো টানে এটাও বোঝা যায় যে, কীর্তনের মৃদঙ্গ ভাঙার পিছনেও যেমন কাজির কাছে পূর্ব প্ররোচনা ছিল, তেমনই পুনরায় বাধা-সৃষ্টি না করার ক্ষেত্রেও তাঁর রাজনৈতিক শুভ-কৌশলের বুদ্ধি ছিল। কাজির নিজের মুখেই সেকথা বেরিয়েছে যদিও একটু অন্যভাবে, তবু লৌকিক দিক থেকে বিচার করলে সেকথা সত্য বলেও মনে হয়।

কাজি বলেছিলেন—নগরে নগরে যখন কীর্তন-প্রচার বেড়ে চলছিল উত্তরোত্তর, তখন স্বজাতীয় মুসলমান-জনেরা অনেকেই এসে আমাকে সচেতন করে দিয়ে বলেছেন—নবদ্বীপে কিন্তু হিন্দুধর্মের বাড়াবাড়ি চলছে, বড়ো বেশি কীর্তনের ধুম দেখছি আজকাল—

নগরে হিন্দুর ধর্ম বাড়িল অপার।
হরি হরি ধ্বনি বই নাহি শুনি আর।।

এটা অবশ্যই ঠিক যে, ধর্মপালন বলতে এতদিন নবদ্বীপে যা চলেছে, তার দুটি নির্দিষ্ট ভাগ ছিল। পণ্ডিত-অভিজাতরা বেদ-বেদান্ত, ধ্যান-জপ, সন্ধ্যা-আহ্নিক-গঙ্গাস্নানের সঙ্গে স্মার্ত ক্রিয়াকলাপগুলি চালিয়ে যেতেন, আর সাধারণ মানুষ যারা বৈদান্তিক ভাবনা বুঝতেন না, তাঁরা মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি-মনসার গীত গাইতেন। কিন্তু ধর্মপালনের এই বিষয়গুলি, বিশেষত আচরণ-প্রক্রিয়ার জায়গাটা এতই ব্যক্তিগত, অতএব পরম্পরা বিচ্ছিন্ন ছিল যে, ধর্ম নিয়ে সার্বিকভাবে একত্র হওয়াটা কখনোই ঘটেনি। এখন সেটা ঘটছে। নবদ্বীপের নগরিয়ারা মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করতে যায়, তাদের হাতে কোনো মহার্ঘ্য উপায়ন লাগে না—কেহো বা নূতন দ্রব্য কারো হাতে কলা। কেহো ঘৃত, কেহো দধি, কেহো দিব্য মালা। মহাপ্রভু এঁদের সবার কাছে আশ্বাস দিয়েছেন যে, ধর্ম বলতে বিরাট কিছু পালনীয় আচার নেই, শুধু হরিনাম করো এবং তার প্রক্রিয়াটা কী—দশ পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া। কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া।।

এই যে অনাড়ম্বর আরম্ভ—এর মধ্যে আর কিছু না থাক একটা অদ্ভুত উৎসাহ ছিল। অতএব মহাপ্রভু যখন নিজে তাঁর কীর্তনধ্বনি নিয়ে পথের মাঝে এসে দাঁড়ালেন—'ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতি দ্বারে'—সেদিন ওই দশ-পাঁচ আর দশ-পাঁচের এক-একটা পরিবার মিলে-মিশে এক বিরাট কীর্তন সমারোহ তৈরি করে ফেলল এবং সেই সমারোহ দেখেই কাজির লোক কাজির কাছে নালিশ করেছে যে, 'নগরে হিন্দুর ধর্ম বাঢ়িল অপার'। শুধু এই নয়, কাজি নিজেই তাঁর একান্ত কথোপকথনের মধ্যে মহাপ্রভুকে জানিয়েছেন যে, অনুগত সহচরেরা শুধু এটাকে হিন্দুধর্মের বাড়াবাড়ি বলেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা এই ঘটনার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াটাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। বলেছে—এই যে হিন্দুরা এত হরি-হরি বলে কোলাহল সৃষ্টি করেছে, এটাকে কোনো বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক উত্থান বলবেন কিনা ভেবে দেখুন। অন্তত যেটা ঘটছে, সেটা অন্য কোনো আকার গ্রহণ করলে কাজির সমস্যা আছে। তারা ভয় দেখিয়ে কাজিকে সাবধান করেছে—

হরি-হরি বলি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসা শুনিলে তোমার করিবেক ফল।।

নিজের স্বধর্মী, সগন্ধ মানুষেরা ছাড়াও আর আছেন সেই সব মানুষেরা—যাঁরা চিরকাল থাকেন—যাঁরা যেকোনো রাজনৈতিক পরিবর্তনেই পরবর্তী শাসকের অনুগত চাটুকারে পরিণত হন—কাজি একান্তে জানিয়েছেন মহাপ্রভুকে যে, তাঁরাও এসে

নালিশ করে গেছেন তাঁর কাছে। কাজি এসব কথা বড়ো গলায় বলতে চাননি। মহাপ্রভুকে তিনি বলেছিলেন—তুমি একটু সরে এসো, আমি সব বলছি, কেন সেদিন নবদ্বীপের রাস্তায় গিয়ে আমার লোকজন তোমাদের কীর্তনের মৃদঙ্গ ভেঙে দিয়ে এসেছে, আমি বলছি তোমাকে, তুমি একটু সরে এসো একান্তে—নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন। মহাপ্রভু সেদিন প্রকৃষ্ট জননেতার মতোই সমস্ত স্পষ্টতা জনসমক্ষে বজায় রেখে বলেছিলেন—স্ফুট করি কহ তুম না করিহ ভয়। প্রভু বলে—এ-লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।

কাজি বলেছিলেন—হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে এসে তাঁকে সব জানিয়ে তোমার নাম ধরে বলেছে—ওই যে ওই নিমাই পণ্ডিত, সেই আজ হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করে দিয়েছে। এই যে একটা কীর্তন চালাচ্ছে দিন-রাত, এটাকে তো কোনোদিন হিন্দুধর্মের কোনো আচরণ-প্রক্রিয়া বলে শুনিনি। হ্যাঁ, নৃত্য-গীত-বাদ্য এসব মাঝে মাঝে শুনি বটে, তবে সেটা ওই মঙ্গলচণ্ডী কিংবা মনসা জাগানোর জন্য শুনেছি। কিন্তু এ কী হল—নাচছে, চেঁচাচ্ছে, বাজনা বাজাচ্ছে—'মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি।'

এই হিন্দুরা নিমাই পণ্ডিতের হঠাৎ পরিবর্তনটাও ভালোভাবে নেননি। বলে গেছেন—পণ্ডিত আগে লোকটা ভালোই ছিল, কিন্তু 'গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত'। এই বিপরীত ভাব তারাই বা কাজিকে কী বোঝাবেন! তিনি যে অখিল-রসামৃত-মূর্তি কৃষ্ণের ভাবনা-সুখে একবার হাসেন, একবার কাঁদেন, একবার মাটিতে গড়াগড়ি যান—এ-ভাব যারা বোঝেনি, তারা কী বোঝাবে কাজিকে! তারা শুধু এইটুকু কাজিকে বোঝাতে পেরেছে যে, নিমাই পণ্ডিত হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করে দিয়েছে। কতকগুলো উল্টোপাল্টা লোক তার দলে এসে জুটেছে, যত সব নীচ-মূর্খ ভাটের দল দিন-রাত কৃষ্ণ-নাম করছে, এর ফল হবে সর্বনাশ—

কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ রাড়বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়।।

শাসক কাজির কাছে তাঁরা বলে গেছেন যাতে তিনি নিমাই পণ্ডিতকে ডেকে এনে যথোচিত শাসন করে দেন—নিমাই বোলাইয়া তারে করহ তর্জন, এবং এই শাসনকাণ্ডে হিন্দু সমাজপতিরা কাজির পিছনে থাকবেন।

কাজি কাজির বুদ্ধিমতো প্রথমেই নেতাকে ডেকে পাঠাননি। তিনি প্রথমে ভাব বুঝতে চেয়েছেন কীর্তনে বাধা সৃষ্টি করে, মৃদঙ্গ-খোল ভেঙে দিয়ে। কিন্তু আজ যখন বিরাট কীর্তন-সমারোহ নিয়ে নিমাই পণ্ডিত নিজেই এসেছেন তাঁর দ্বারে, কাজি

তখন এটা স্পষ্ট বুঝে গেছেন—এটা কোনো রাজনৈতিক হিন্দু-জাগরণ নয়, প্রধানত ধর্মীয় ভাবনাই এখানে প্রধান কারণ এবং রাজনীতির সঙ্গে এর কোনো স্পষ্ট যোগাযোগ নেই। তিনি পালিয়েও যাননি, বরঞ্চ নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে দু'দণ্ড বসে তাঁর সরসা ভক্তির ভাবটুকু বুঝে নিয়েছেন। তাঁকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে বলেছেন—হরিনাম সংকীর্তনে আর এতটুকু বাধা আসবে না প্রশাসনের তরফ থেকে। মহাপ্রভু উঠে এসেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ কীর্তনের মহা-সমারোহে এবং সেখানে তাঁর আনন্দ-উৎসার এমনই ছিল যে, স্বয়ং কাজিও চলে এসেছিলেন তাঁর পিছন পিছন—সঙ্গে চলি আইসে কাজি উল্লসিত মন।

৫

কাজির সঙ্গে মহাপ্রভুর এই সাক্ষাৎকারের বিষয়টি আমরা সামান্য একটু বিস্তারিতভাবে বললাম এই কারণে, যেহেতু এই ঘটনা থেকে দুটি তত্ত্ব খুব পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসে। এক, মহাপ্রভু যে তত্ত্বদর্শন জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন, সেটাকে তিনি সর্বসাধারণের হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। জাতিবর্ণের সমস্ত উচ্চতা থেকে বঞ্চিত যেসব মানুষেরা মহাপ্রভুর ধর্ম আত্মসাৎ করেছিল—সেটা সমাজের বড়ো মানুষেরা ভালো চোখে না দেখলেও এ প্রশ্নটা থেকেই যায় যে, কেমন করে এক বিরাট তত্ত্ব-নিগূঢ় দর্শনকে তিনি সর্ব-সাধারণের উপযোগী করে তুললেন? এর পিছনে রহস্যটা কী? অনেকেই আমাকে বলেছেন এবং অনেকেই সভা-সমিতিতে এমন সহজবোধিনী বক্তৃতা দিয়ে বলেন—চৈতন্য যে সমাজে জন্মেছিলেন, তখন হিন্দু-মুসলমানের উদার সহাবস্থান চলছিল। সুলতান হুসেন শাহ বহুতর হিন্দুকে নিজের মন্ত্রীসভায় ঠাঁই দিয়ে নিজের উদার চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিশেষত তখন মরমিয়া সুফি-সাধকেরা বঙ্গদেশে ধর্মসাধনার এক উদার ধারা তৈরি করেছিলেন এবং সেই মরমিয়া সুফিদের মরমী স্পর্শ লেগেছিল চৈতন্যের ধর্মে; অর্থাৎ চৈতন্য-জন্মের পূর্ব-পটভূমিতে যে উদারতা ছিল, তাই চৈতন্যকে উদার করেছে।

আমরা সবিনয় জানাচ্ছি—সভা-সমিতিতে এই অতি সরলীকৃত প্রাণঢালা বক্তৃতার সব কথা আমরা মানতে পারি না। পারি না, তার কারণ—এগুলি অল্পশ্রুত মানুষের গলায় গলা-মেলানো কথা, যা কণ্ঠ-পরম্পরায় হাওয়ায় উড়িয়ে-দেওয়া গানের মতো শোনায়। ব্যাপারটা খুব 'ক্যাটিগরিক্যালি' বলতে গেলে এইভাবে বলা যায় যে, মহাপ্রভু চৈতন্য হিন্দু সমাজেরই এমন একটা 'প্ল্যাটফর্ম' ব্যবহার করেছেন, যেখানে উদারতার বীজ কিছু থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সে বীজও খুব কঠিন আবরণে নিহিত ছিল। অন্যদিকে হুসেন-শাহী যুগের যে উদার প্রশ্রয়টুকু তিনি পেয়েছেন, সেটা হুসেন শাহের প্রয়োজনেই তৈরি, সেই সমাপতনটুকু তাঁর কাজে লেগেছে মাত্র। সর্বশেষ কথা হল, চৈতন্যের এই উদার ধর্ম একান্তভাবে চৈতন্যেরই সৃষ্টি। এখানে সুফিদের বিন্দুমাত্রও প্রভাব নেই। আমি জানি—এই সব কটি প্রস্তাব এই সামান্য

পরিসরে কিছু বোঝানো সম্ভব নয়, তবু তার সূত্রমাত্র উচ্চারণ না করলে আমার প্রবন্ধের ত্রুটি থেকে যাবে।

কথাটা হুসেন শাহকে দিয়েই শুরু করি। হুসেন শাহকে অনেক ঐতিহাসিক বাংলার 'আকবর' নামে চিহ্নিত করেছেন। হয়তো তাঁর মন্ত্রীসভায় বহুতর হিন্দুদের দেখে অথবা তাঁর আমলে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে যথেষ্ট স্থিরতা ছিল বলেই ঐতিহাসিকদের এমন মত সৃষ্টি হয়েছে। জিজ্ঞাসা তবু থেকেই যায়। জিজ্ঞাসা হয়—আচ্ছা! তখনকার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এখনকার রাজনীতি এবং সমাজের নিরিখে কিন্তু বিচার করা যায় না। বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার কায়েম হবার পর শাসিত হিন্দুরা শাসকের বিরুদ্ধে বিরাট বিক্ষোভ করেছে—এমন ঘটনা রাজা গণেশের আমলের পরে আর একটাও প্রায় হয়নি। অন্যদিকে তখনকার রাজনৈতিক পটভূমিকায় একপক্ষ শাসক, অন্যপক্ষ শাসিত।

সুলতান হুসেন শাহের যে নানান উদারতা, বিশেষত রাজকার্যে হিন্দুদের নিয়োগের মতো আপাত উদারতাও কোনোভাবে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বা মাহমুদ শাহী বংশের কুলতিলক রুকনুদ্দিন বারবক শাহেব সঙ্গে তুলনীয় নয়। রুকনুদ্দিন বারবক শাহ-ই বাংলার প্রথম সুলতান, যিনি রাজকার্যে বহুতর হিন্দু মন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন এবং রাজকার্যের বাইরেও বহুতর হিন্দুর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এখানে তাঁর উদারতাই বেশি কাজ করেছে এবং সেই উদারতা নানাভাবেই প্রমাণ করা যায়। কিন্তু রুকনুদ্দিনের পরম্পরায় যাঁরা ভাবেন সৈয়দ হুসেন শাহও একই রকম উদার ছিলেন, তাঁরা ভুল করবেন। বরঞ্চ বলা উচিত—হুসেন শাহ প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন এবং যে রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং কৌশল তাঁকে খুব সাধারণ জায়গা থেকে সুলতানে পরিণত করেছিল, সেই রাজনৈতিক বুদ্ধিই তাঁকে রাজকার্যে হিন্দু মন্ত্রী নিয়োগ করতে শিখিয়েছিল নিজের প্রয়োজনে।

বাংলায় ইলিয়াস শাহী, মাহমুদ শাহী এবং হাবশী রাজত্বের ইতিহাস যদি খেয়াল থাকে, তবে মানতেই হবে যে, হুসেন শাহ তাঁর পূর্ববর্তী রাজবংশের ক্রিয়াকলাপ থেকে অদ্ভুত প্রয়োজনীয় একটি শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং সেই শিক্ষাই তাঁর কাছে রাজকার্যে হিন্দু-মন্ত্রীর নিয়োগবার্তা পৌঁছে দিয়েছে। ইলিয়াস শাহী বা মাহমুদ শাহী সুলতানদের মধ্যে সেই রুকনুদ্দিন বারবক শাহ-ই কিন্তু বহু হাবশী অনুচর আমদানি করেছিলেন। এই হাবশীরা তাঁর আমলেই বহুতর রাজকার্যে নিযুক্ত হয়েছে এবং প্রাসাদের প্রহরী হিসেবেও তাদের নিযুক্তি ঘটেছে বহুতর ক্ষেত্রে। বারবক শাহের

পরে যাঁরা বাংলার সুলতান-পদে অধিষ্ঠিত হন, তাঁরা অনেকেই সুলতান হবার সময় হাবশীদের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং অনেকে হাবশীদের প্রতিপক্ষ হিসেবেও ভাবতে শুরু করেন। একটা সময় আসে যখন এই দাসভাবাপন্ন হাবশীরাই মূলস্রোতের রাজাদের সরিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেরাই রাজা হয়ে বসেন। চার কি পাঁচ বছর এই হাবশী রাজত্ব চলে এবং হুসেন শাহ শেষ হাবশী রাজা মুজাফ্‌ফর শাহকে হত্যা করেই বাংলার সুলতান হয়ে বসেন।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, সিংহাসনে বসার পর থেকেই হুসেন শাহ হাবশীদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে আরম্ভ করেন। হাবশীদের রাজকার্যে নিয়োগ করার যে কুফল শেষ ইলিয়াস শাহী রাজারা পেয়েছিলেন, সেই কুফল থেকেই হুসেন শাহ হিন্দুদের রাজকার্যে নিয়োগ করার শিক্ষা গ্রহণ করেন—কারণ অবশ্যই সেই মুঘল বাবরের বাণী—সিংহাসনে-বসা যে-কোনো সুলতান-আমির-ওয়াজিরদের কাছেই বাঙালি বশ্যতা স্বীকার করে, তারা ever obedient to any changing Sultan coming to power by whatever means, তাদের রাজভক্তি এতটাই। আসলে হুসেন শাহেরও সেই রাজনৈতিক বুদ্ধি বা 'পোলিটিক্যাল অ্যাকুইমেন' ছিল, যাতে আপন স্বজনদেরও তিনি মন্ত্রীপদে বহাল করেননি, হাবশী দাসদের তো দূরের কথা। অতএব রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক স্বার্থেই বিশিষ্টবুদ্ধি হিন্দুদের তিনি আপন শাসনকার্যে নিয়োগ করেছেন। শাসনের বহিরঙ্গে যখন হুসেন শাহ এই প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিলেন, সেখানে যখন-তখন পরমতে অসহিষ্ণু হয়ে হিন্দু-সমাজের ওপর তিনি প্রত্যক্ষ অত্যাচার চালাবেন—এত নির্বোধও তিনি ছিলেন না।

বস্তুত মুসলমান শাসক হিসেবে শাসিত হিন্দু-সমাজের যে চরিত্র হুসেন শাহের কাছে কাম্য হবার কথা, সে চরিত্রটা পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং তা হয়ে গিয়েছিল হুসেন শাহের অনেক আগেই—তাঁর পূর্ব পূর্ব সুলতানদের সময়ে। ইতিহাসের ইঙ্গিত যদি মনে রাখেন, তাহলে দেখবেন—এই শ্যাম বঙ্গদেশে আমরা দু-দুটো বহিরাগতের শাসন পেয়েছি—মুসলমান শাসন এবং ইংরেজ শাসন। দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু নিজস্ব ধর্ম-ঘোষণা এবং প্রচারের ধরনটা কিন্তু একই। অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রেই বহিরাগতের রাজনৈতিক শাসন আরম্ভ হওয়ার পর ধর্মের শাসন, ধর্মান্তকরণ আরও দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হতে থাকে সমাজের মধ্যে। অন্যদিকে হিন্দু-সমাজের ধর্মীয় সংস্কারগুলিও এমনভাবে জাতিবর্ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল,

যাতে দরিদ্র এবং নিম্নবর্ণের মানুষগুলিকে ধর্মান্তরিত করাও অনেক সহজ ছিল। তা ছাড়া হিন্দুধর্মের নিজস্ব সংরক্ষণশীলতা এবং গোঁড়ামিও নিতান্ত প্রত্যক্ষভাবেই অন্য ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলেছিল।

বঙ্গদেশে মুসলমান সুলতানদের রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে ইসলাম ধর্মের প্রভাবও বাড়তে থাকে। দলে দলে সুফি সাধকেরাও আসতে থাকেন আপন সাধন প্রচারের জন্য। চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দের শেষ পদে বসে মির সইয়দ আশরফ জাহাঙ্গির সিম্‌নানি-র মতো প্রসিদ্ধ সুফি সাধক লিখেছেন—বঙ্গদেশে এমন গ্রাম অথবা শহর আর একটিও নেই, যেখানে পবিত্র সুফি সাধকেরা আসেননি অথবা অবস্থান করছেন না। তার মানে রাজার শাসন এবং ধর্মের অনুশাসন একই সঙ্গে চলছে। ইলিয়াস শাহী সুলতানরা যখন বঙ্গদেশে রাজত্ব করছেন, তখন সুফি-দরবেশরা স্বধর্ম প্রচারের সুযোগ পেয়েছেন যথেষ্ট। সেই রাজশাসনের ওপর দরবেশদের প্রভাব খুব কম ছিল না এবং সব সময় যে তাঁরা খুব মরমিয়া সাধক ছিলেন, রাজনৈতিক কোনো ব্যাপারে কখনও মাথা ঘামাতেন না, তাও নয়।

মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে একশো বছরেরও বেশি সময় জুড়ে ইলিয়াস শাহী, মাহমুদ্ শাহী এবং হাবশী রাজত্ব চলেছে বাংলাদেশে। ইলিয়াস শাহী রাজাদের মধ্যে স্বয়ং ইলিয়াস শাহ তো বটেই এবং আরও দু-একজন—হয়তো বা রাজনৈতিক কারণেই যথেষ্ট হিন্দু-বিরোধী ছিলেন। হিন্দুদের যে তাঁরা অনেক সময় প্রয়োজনে রাজকার্যে বহাল করেননি তা নয়, তবে রাজকার্যে হিন্দুদের এই কদর দরবেশ-সুফিরাই পছন্দ করেননি। ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ বহু হিন্দু নিয়োগ করেছিলেন রাজকার্যে, কিন্তু সুফি দরবেশরা এই নিয়োগ পছন্দ করেননি। বিহারের মুজাফ্‌ফর শাম্‌স্ বলখির মতো পণ্ডিত দরবেশ, যাঁকে গিয়াসুদ্দিন যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন, সেই তিনিও কিন্তু একটি বিশ্বস্ত চিঠিতে সুলতানকে লিখেছেন—তোমাদের শ্রেণির বাইরের কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন কোরো না। কাফের এবং অপরিচিত লোকদের বিশ্বস্ত কর্মচারী বা মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা মুসলমানদের উচিত নয় এবং কাজের সুবিধে হলেও তা অনুচিত। হ্যাঁ, কাফেরদের কিছু কাজ দেওয়াই যেতে পারে, কিন্তু তাদের 'ওয়ালি' (প্রধান তত্ত্বাবধায়কের কাজ) নিযুক্ত করা ঠিক নয়, কারণ তা করলে তারা মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করবে।

মুজাফ্‌ফর শাম্‌স্‌ বলখির এক বিরাট চিঠির অংশমাত্র আমরা দেখিয়েছি এবং এই চিঠি আবিষ্কার করেছিলেন সৈয়দ হাসান আসকারি যিনি বলখি-কে সুফি সাধক হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। এই চিঠিটি ১৯৫৬ সালের ইতিহাস সম্মেলনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আসকারি সাহেব মন্তব্য করেছেন—শাম্‌স্‌ বলখি-র এই চিঠি পাবার কিছুদিন পরেই হিন্দু মন্ত্রী রাজা গণেশের হাতে এই ইলিয়াস শাহী সুলতানের যা পরিণতি ঘটেছিল, তাতে মুজাফ্‌ফর শাম্‌স্‌ বলখি-র ওই সতর্কবাণী একেবারে দৈববাণী বলে মনে হয়—The warning given by the saint of Bihar of Ghayasuddin Azara Shah appears to be rather prophetic. তার মানে আসকারি-সাহেবের মতো একজন প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিকও মনে করেন যে, বিধর্মী কাফের হিন্দুদের রাজকার্যে নিয়োগ করাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু এটাও তো ভাবা দরকার ছিল যে, প্রয়োজন এবং বাধ্যতা ছাড়া প্রায় কোনো মুসলমান রাজাই হিন্দুদের রাজকার্যে নিয়োগ করেননি, যদিও সেই ভাবনাটাও দরবেশ বলখি-র সুপরামর্শের অন্তর্গত ছিল, কেননা তিনি লিখেছিলেন যে, প্রয়োজন বা সুবিধের কারণেও হিন্দুদের কোনো গুরুতর কাজে নিযুক্ত করা উচিত নয়, তাতে বিদ্রোহ বা গোলযোগের সম্ভানা থেকে যায়।

আমাদের বক্তব্য হল—পণ্ডিতজনেরাই জানিয়েছেন যে, গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ তাঁর শাসনের প্রথম কল্পে বহুতর হিন্দুকেই রাজকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু সুফি দরবেশদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত এক সময় সম্ভবত সব হিন্দুকেই তিনি রাজকার্য থেকে সরিয়ে দেন। এতে অন্যরা ক্ষুব্ধ হলেও কেউই কিছু করতে পারেননি, কিন্তু রাজা গণেশ—যিনি সম্ভবত আজম শাহের মন্ত্রীর কাজ করেছিলেন কোনো সময়—সেই গণেশ যে একদিন গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের বংশধরদের রাজত্ব টলিয়ে দিয়ে নিজে সিংহাসন দখল করেছিলেন, তার কারণ কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা নয়। তার কারণ রাজা গণেশের নিজস্ব শক্তি এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শেষ ইলিয়াস শাহী সুলতানদের অক্ষমতা এবং দুর্বলতা। না হয় দরবেশ বলখির দৈববাণী ফলেই গেল এবং আমরাও রাজা গণেশের উত্থান-কাহিনির রাজনৈতিক নিদান নিয়ে ভাবনা-বিস্তার নাই ঘটালাম এখানে, কিন্তু একজন সুফি-সাধক—যাঁদের সর্বত্রই প্রায় 'মরমিয়া' উপাধি জুটেছে—সেই সুফি-সাধকের পরমতসহিষ্ণুতা কতটুকু! বলখি-র চিঠিখানা পুরো উদ্ধার করতে পারলে দেখতেন—হিন্দু-সমাজের প্রতি যে কোনো উদারতার চিহ্নকেই ঈশ্বরকে অবজ্ঞার প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বলখি।

যাঁরা চৈতন্যের ওপরে সুফি-প্রভাব নিয়ে বেশি বক্তৃতা দেন, তারা পড়েছেন এবং শুনেছেন অনেক বেশি, কিন্তু বুঝেছেন কম। বাংলার সুলতানি শাসনে একবার, মাত্র একবারই রাজা গণেশের মতো ভয়ংকর বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে শাসক-মুসলমানদের, কিন্তু তাঁর এই বিরোধিতাই অনেক বিখ্যাত সুফি-দরবেশদের তথাকথিত মরমিয়া চরিত্র উন্মোচন করে দিয়েছে। রাজা গণেশ খুব সম্ভবত গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের মিত্র এবং সেবকের মধ্যেই পরিগণিত ছিলেন কিন্তু মুজাফ্‌ফর শাম্‌স্‌ বলখি-র প্ররোচনায় স্থানচ্যুত হয়ে আপন সামরিক ক্ষমতায় তিনি সুলতানকে রাজ্যচ্যুত করে হত্যা করান এবং তাঁর বংশধরদের এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে রাজ্য দখল করেন।

খ্রিস্টীয় তেরো শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে আঠেরো শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান শাসনের মধ্যে মাত্র একবারই এ-রকম অসাধারণ উত্থান সম্ভব হয়েছিল এবং তা সম্ভব হয়েছিল রাজা গণেশের জন্যই। তাঁর রাজত্বকাল বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কারণ তাঁর ছেলে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন রাজ্যের লোভে এবং পিতার বিরুদ্ধ-পক্ষীয় মুসলমান শাসককে টাকা খাইয়েই তিনি রাজ্য লাভ করেছিলেন। তবু সমস্ত ঘটনার মধ্যে এটাই উজ্জ্বল সংবাদ হয়ে ওঠে, যখন শুনি—গণেশ রাজা হবার পর যখন একটু প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছেন, তখন বাংলার মুসলমান আমির-ওমরাহরা কিছুই করতে পারেননি এবং গণেশকে শাসন করার জন্য গৌড়-মিথিলা পেরিয়ে জৌনপুর থেকে সুলতান ইব্রাহিম শর্কিকে ডেকে আনতে হয়েছিল। এবং বাংলার এই উদ্যমী কাফের-কে ধ্বংস করার যে আহ্বান ইব্রাহিম শর্কির কাছে গিয়েছিল, সে আহ্বানও করেছিলেন একজন দরবেশ তথা সুফি-সাধক নূর কুৎব্‌ আলম।

আমরা পূর্বে যে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ-র কথা বলেছি, উক্ত সুফি সাধক নূর কুৎব্‌ আলম তাঁর সহপাঠী ছিলেন। রাজা গণেশের রাজ্য-শাসন যতখানি না তাঁকে ক্রুদ্ধ করেছিল, তার চেয়ে বেশি আঘাত করেছিল সুফি দরবেশের ওপরে গণেশের অত্যাচার। বস্তুত গণেশ খুব ভোলেভালে মানুষ ছিলেন না। যে কোনো কারণেই হোক, তাঁর এটা মনে হয়েছিল যে, মুসলমান শাসকের চেয়েও দরবেশরা ভয়ংকর—তারা প্রত্যক্ষত রাজ্যশাসন করেন না বটে, কিন্তু শাসককে তাঁরা প্রভাবিত করেন। বিশেষত সমাজের একটা বৃহত্তর স্তরে ধর্মান্তকরণ সংঘটনা করে পরোক্ষভাবে এঁরা রাজাকে সাহায্য করেন। আমরা মহাপ্রভুর সমসাময়িক হুসেন

শাহের রাজবৃত্তি অনুসন্ধান করতে গিয়ে সুফিদের প্রসঙ্গে এসে বলেছিলাম যে, হুসেন শাহের অভীষ্ট কাজ সুফি দরবেশরাই করে দিয়েছিলেন, ফলত তাঁকে আলাদা করে ইসলামের প্রসার ঘটাতে পরিশ্রম করতে হয়নি।

বস্তুত শুরু থেকেই তাই হয়েছে, এবং রাজা গণেশ এটা মর্মে-মর্মে অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁর সবচেয়ে বেশি ক্রোধ ছিল দরবেশ সুফিদের ওপরেই। একটা নিমিত্ত ধরেই ক্রোধ চরমে ওঠে এবং একদিন সেই ঘটনানিমিত্ত ঘটল—যার বিবরণ আছে রিয়াজ-উস-সালাতিনে। সেদিন এক দরবেশ বদর-উল-ইসলাম এসেছিলেন রাজা গণেশের সভায়। গণেশ তখন রাজসভায় বসেছিলেন। বদর-উল-ইসলাম সভায় এসে রাজাকে কোনো অভিবাদন না করেই বসে পড়লেন অতিথির নির্দিষ্ট আসনে। গণেশ দরবেশকে এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করতে বদর-উল-ইসলাম বললেন— শিক্ষিত লোক বিধর্মীকে অভিবাদন করে না। কথাটা শুনে ভয়ংকর রাগ হলেও গণেশ সেদিন তাঁকে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু অনুরূপ অপমান আর একদিন যখন ঘটল, তখন তিনি তাঁকেই শুধু হত্যা করেই স্তব্ধ হলেন না, পাণ্ডুয়ার অন্যান্য বহু দরবেশ এবং উলেমাকেও তিনি জলে ডুবিয়ে মারার আদেশ দেন।

আমরা গণেশের এই আচরণ সমর্থন করি না, যেমন সমর্থন করি না এখনকার দিনের বাবরি মসজিদ এবং রামমন্দির নিয়ে অহেতুক এবং প্রতিশোধমূলক সংঘর্ষ। কিন্তু ঘটনা হল—একটি ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ আচরণ আরও একটি দুর্দমনীয় ক্রোধাগ্নির জন্ম দেয় এবং সেই অগ্নি-সৃষ্টিতে পীর-দরবেশ-সুফিরাও শামিল হন, ঠিক এখন যেমন হিন্দু সাধু-মহান্তদের রাজনীতিতে শামিল হতে দেখেছি। যাই হোক, রাজা গণেশের এই দমন-নীতির ফলেই হোক অথবা মুসলমানদের পূর্বভুক্ত বা পূর্বশাসিত ভূমিখণ্ডের ওপর একজন হিন্দু রাজার আধিপত্যের কারণেই হোক, দরবেশ নূর কুৎব্ আলম আর সহ্য করতে না পেরে চিঠি লিখলেন জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কিকে—যাতে তিনি গৌড়বঙ্গকে বিধর্মী হিন্দুদের হাত থেকে রক্ষা করেন। ইব্রাহিম শর্কি দরবেশ নূর কুৎব্ আলমের মর্যাদা জানতেন, তবুও হঠাৎ বাংলা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেবার আগে জৌনপুরের আর এক দরবেশের কাছে কুৎব্ আলমের চিঠিটি পাঠিয়ে দিলেন এবং বাংলা আক্রমণের ব্যাপারে তাঁর মত চাইলেন।

জৌনপুরের এই দরবেশের নাম আশরফ্ সিমনানি। ইনি পূর্বোক্ত কুৎব্ আলমের পিতার শিষ্য। গুরুপুত্রের চিঠি দেখে তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন। কুৎব্

আলম এবং আশরফ্ সিমনানি—দুজনেই রাজা গণেশের নাম ঠিকমতো উচ্চারণ করতে না পেরে তাঁকে ডেকেছেন কাফের কান্‌স বা কানস্ রায়। নুর কুৎব্ আলমের বক্তব্য ছিল—প্রায় তিনশো বছর মুসলমান-শাসনের পর বাংলায় আবার কাফেরদের কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে এবং কানস্ রায় ইসলাম এবং প্রকৃত শিক্ষার জ্যোতি নিভিয়ে দিয়েছেন। ইব্রাহিম শর্কির উচিত কাজ হল, এখনই তাঁর প্রবল সৈন্য নিয়ে বাংলা আক্রমণ করা এবং ধর্মের সাহায্যে এগিয়ে আসা। কুৎব্ আলম মনে করেন—তৈমুরলঙও যে দিল্লির মতো জনাজীর্ণ শহর অতর্কিত আক্রমণে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, তার পিছনে নাকি ধর্মের ফতোয়াই আসল কারণ ছিল। অতএব ইব্রাহিমের উচিত আর এক ঘণ্টাও যেন তিনি সিংহাসনে বসে না থেকে বিধর্মীকে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলেন।

নুর কুৎব্ আলমের চিঠিতে আরও অনেক উত্তেজনার কথা আছে এবং তাঁর চিঠি পেয়ে দ্বিগুণ উত্তেজনায় আশরফ্ সিমনানি ইব্রাহিম শর্কিকে অবিলম্বে বাংলা আক্রমণের পরামর্শ দিয়ে বললেন—ধার্মিক মুসলমান সুলতানের এই তো কাজের সময়। কেননা বাংলার ছোটো-বড়ো সমস্ত শহরে দরবেশদের ছড়াছড়ি। অনেক দরবেশই এতদিনে পরলোকগমন করেছেন, কিন্তু এখনও যা আছেন তার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

বাংলাদেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর কালে এবং হুসেন শাহের রাজত্বকালে পীর-সুফি-দরবেশদের কতদূর আনাগোনা এবং সন্নিবেশ ছিল এবং সুলতান-আমিরদের ওপর তাঁদের প্রভাব কতটা ছিল, সেই প্রসঙ্গে আমরা আশরফ্ সিমনানি, নুর কুৎব্ আলম এবং ইব্রাহিম শর্কির কথায় এসেছিলাম। হ্যাঁ, ইব্রাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ করে কাফের কানস্ অর্থাৎ গণেশকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। কিন্তু রাজা গণেশও অসাধারণ কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে তেমন কোনো যুদ্ধই করেননি। মাঝখানে ছিল অন্য খেলা। গণেশের ছেলে যদুসেন ইব্রাহিম শর্কির প্রলোভনে ধর্মান্তরিত হয়ে জালালুদ্দিন নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। কাফের কানসের উপযুক্ত শাস্তি না হওয়ায় দরবেশ আশরফ্ সিমনানি মোটেই খুশি হননি এবং জানিয়ে রাখি—ইব্রাহিম শর্কি চলে যেতেই রাজা গণেশ আবার রাজ্য দখল করেছিলেন। তবে তাঁর রাজত্বকালও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পুত্র জালালুদ্দিন আবারও সুলতান হয়ে বসেন।

নিজের রাজত্বকালে রাজা গণেশ মুসলমান দরবেশদের ওপর যত অত্যাচার

করছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাঁর পুত্র জালালুদ্দিন হিন্দুদের ওপর তার চেয়ে অনেক বেশি অত্যাচার করেছিলেন এবং জোর করে ধর্মান্তরিত করাটা তাঁর ক্রীড়া-কৌতুকের অন্তর্গত ছিল। জালালুদ্দিনের রাজত্বকাল শেষ হলে বাংলাতে পুনরায় উচ্ছিন্ন ইলিয়াস শাহী বংশের সূচনা হয়, চলতে থাকে মাহমুদ শাহী বংশের শাসন-পরম্পরা—যার অবশেষে আসে হাবশি রাজত্ব এবং তারপর সৈয়দ হুসেন শাহ। আমরা বলেছিলাম—হুসেন শাহ যে রাজকার্যে বহুতর হিন্দু মন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন, তার কারণ যতখানি না সর্বংসহা উদারতা তার চেয়ে অনেক বেশি হল বাস্তব প্রয়োজন—যে প্রয়োজন এক সময় জালালুদ্দিনের মতো ভয়ংকর হিন্দুবিদ্বেষীকেও হিন্দু মন্ত্রী নিয়োগ করতে বাধ্য করেছিল। হুসেন শাহের এই রাজনৈতিক কৌশলের অন্তরালে তাঁর অভীপ্সিত ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং ধর্মান্তরকরণের কাজটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন পীর-সুফি-দরবেশরাই। সামগ্রিকভাবে শাসকদের এই কৌশল ধরা পড়েছে এখনকার ঐতিহাসিকের লেখাতেও। তিনি লিখছেন—Generally speakings, they did not take much interest in the spread of Islam in Bengal but rather promoted the interests of Muslims and protected them. It was the patronage they offered to the Sufis that they could immigrate to Bengal and preach Islam.

আমরা দেখেছি—পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দের প্রথম পাদেই এ-দেশের গ্রামে শহরে সুফি-দরবেশদের বহুতর সন্নিবেশ ঘটে গিয়েছিল, কিন্তু রাজশাসনের সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্তি এবং ধর্মান্তকরণের প্রতি অতিরিক্ত আবেশ তাঁদের এতটাই নিবিষ্ট রেখেছিল যে, তাঁদের সেই তথাকথিত মরমিয়া চরিত্র সামগ্রিক হিন্দু সমাজকে কতটা প্রভাবিত করেছিল সেই সময়—সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়। বিশেষত চৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি কবে কার সঙ্গে কথা বলেছেন, কোন্ বাজারে গিয়ে কার মোচা-থোড় ছিনিয়ে নিয়েছেন, কার বাড়িতে গিয়ে শীতল জল পান করেছেন—যাঁর প্রতিটি তুচ্ছ ক্রিয়াকর্মও চরিতকারদের বয়ানে ধরা পড়েছে, সেখানে একজন সুফি-সাধকের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হতে দেখিনি, একজন মুসলমান দরবেশের মরমিয়া অনুবাদও তাঁকে গ্রহণ করতে দেখিনি। সেখানে কেন এবং কোথা থেকে এই প্রচার সদর্থক হয়ে ওঠে যে, তাঁর ওপরের সুফিদের প্রভাব ছিল এতটাই যাতে তাঁর একান্ত উদার ধর্মমত প্রভাবিত হয়েছিল? তার ওপরে বঙ্গে সুলতানি অধিকারে নূর কুৎব্ আলম, আশরফ্ সিমনানি বা মুজফ্ফর বলখি-র মতো মাননীয় সুফিদের যে চরিত্র আমাদের কাছে ধরা পড়েছে এবং আশরফ্ সিমনানির চিঠিতে যেসব

দরবেশ গোষ্ঠীর নাম আছে—সোহরওয়ার্দি, রুহানি, আলাইয়া এবং খলিদিয়া—সেই সব গোষ্ঠীর একজনের সঙ্গেও মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদদের কারও পরিচয় হতে দেখিনি। সেখানে কেনই বা এক অন্য ধর্ম—যে ধর্ম অনীপ্সিত শাসক গোষ্ঠীর আনুকূল্যে বাইরে থেকে চাপানো—সেই ধর্মের দ্বারা মহাপ্রভু প্রভাবিত হতে যাবেন?

হ্যাঁ এ কথা মানি, অবশ্যই মানি যে, সতত তরবারি উঁচিয়ে অথবা ক্রোধরক্ত মুখে রাজার অনুশাসন চাপিয়ে দিয়ে সুফি সাধকেরা সততই এমন এমন ভাব প্রকাশ করেননি যেন ধর্মান্তর গ্রহণ না করলে বিষম বিপদ হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মানতে হবে যে, রাজার প্রশাসন এবং উদ্যত দণ্ডের ভয়টুকু যেখানে জিয়ানো থাকে, সেখানে শুধু সুফি-সাধকদের মরমিয়া টানেই সবাই ধর্মান্তরিত হননি, ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের ঘটনাও সেখানে যথেষ্টই ঘটেছে এবং অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই যে, এমন ঘটাটাই খুব স্বাভাবিক। ভিনধর্মী শাসক সম্প্রদায় যখন আপন ধর্ম নিয়ে একটা নতুন সমাজের ওপর চেপে বসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই বলপ্রয়োগের ঘটনা কিছু ঘটবেই। তাছাড়া হুসেন শাহের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় সুবুদ্ধি রায় বা রামচন্দ্র খান যেভাবে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হন, ইতিহাস তার সাক্ষী দেয়, কেননা হুসেন শাহের মতো বড়ো মানুষ সেখানে জড়িত এবং তিনি জড়িত বলেই তেমন ঘটনা নথিভুক্ত হয়। কিন্তু এমন দুটি ঐতিহাসিক ধর্মান্তরের ঘটনা বাদ দিলে আরও যে আটানব্বুইটা ধর্মান্তরের ঘটনা ঘটে বা ঘটেছিল, ইতিহাস তা মনে রাখে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, সেই আটানব্বুইটা ঘটনার মধ্যে অনেক ঘটনাই কিন্তু বলাৎকৃত নয়। সেখানে ধর্মান্তর ঘটেছে হিন্দু-সমাজের আভ্যন্তরীণ কারণে এবং ঠিক সেইখানেই চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা এসে পড়বে।

মনে রাখা দরকার, সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরা, যাঁরা স্বভাবতই সংখ্যায় অনেক বেশি, তাঁরা যেহেতু অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণে হিন্দু-সমাজের মধ্যেই বিপর্যস্ত ছিলেন, ফলে তাঁদের মধ্যে ধর্মান্তরের প্রবণতা এমনিতেই ছিল। লক্ষণীয়, ইসলাম ধর্মেই হোক অথবা খ্রিস্টধর্মে—এমনকী পুরাতন হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও—দেখা গেছে যে, সমাজের কারণে বা অর্থনৈতিক কারণে বহু মানুষ যখন ধর্মান্তর গ্রহণ করেছেন, তার প্যাটার্নটা সব সময় একই রকম হয়। বাংলার মধ্যযুগের সামাজিক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, স্বচ্ছন্দ ধর্মান্তর গ্রহণের পিছনে কারণ

হিসেবে সমকালীন সুলতানি শাসনের ভয় অথবা সুফি সাধকদের উদ্যম যতখানি দায়ী, তার থেকে অনেক বেশি দায়ী তৎকালীন হিন্দু-সমাজের আভ্যন্তরীণ গঠন। হিন্দু-সমাজের উচ্চকোটির মানুষ যাঁরা, বিশেষত ব্রাহ্মণ সমাজ—তাঁরা তাঁদের ধর্ম-কর্ম-আচার এবং বিশ্বাস কখনোই এমন স্তরে পৌঁছে দিতে পারেননি যাতে নিম্নকোটির মানুষেরাও ভাবতে পারেন যে, এটা আমারও ধর্ম অথবা এ-ধর্ম আমরাও বুঝি কিংবা অনুভব করি। আবার যদি বা এমনও হয়েছে যে, সেই ধর্ম সেই দর্শন কেউ বুঝেও থেকে থাকেন, তবু সামাজিক দিক থেকে তাঁর এমন উপায় ছিল না, যাতে তিনি সমাজের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য আচার আত্মসাৎ করতে পারেন। ফলে সমাজের একটা বড়ো অংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে যতই ভয়-মিশ্র ভাবনায় বহিরঙ্গে শ্রদ্ধা করে থাকুন, তাঁরা এটাকে একান্ত আপনার বলে ভাবতে পারেননি।

সমাজের এই রন্ধ্রপথেই বৌদ্ধ-জৈনরা যেমন এককালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপালিত সমাজকে কেড়ে নিয়েছিলেন, সেই রন্ধ্রপথেই কিন্তু ইসলাম এবং আরও পরবর্তীকালে খ্রিস্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ইসলামের সাধক সুফিরা এবং তাঁদের স্থাপক সুলতানেরা হিন্দুধর্মের এই দুর্বলতার অংশটা বুঝে নিয়েই সাধারণ মানুষের বঞ্চিত অভিমানকে আন্দোলিত করেছেন ইসলামের ধর্মাচারের সমতা প্রচার করে, নিজেদের 'বেরাদারি' স্থাপন করে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ভূমিদেব ব্রাহ্মণদের কাছে যাঁরা আজ্ঞা-পালনের অধিকার ছাড়া আর কিছুই পাননি, তাঁদের কাছে ভিন্নধর্মীদের রাজনৈতিক শাসন তেমন কোনো দুর্ভাবনাই বয়ে আনেনি, বরঞ্চ ইসলামের ঘোষিত সামাজিক সমতা তাঁদের প্ররোচিত করেছে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে। পণ্ডিত জেমস্ ওয়াইজ, যিনি পূর্ববঙ্গের জাতি, বর্ণ, ব্যবসা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, তিনি আরও ভালো করে বলেছিলেন— নিম্নবর্ণের যে হিন্দু এককালে উচ্চবর্ণের সামাজিক উৎপীড়ন অথবা বৈষম্যের ঘোষণা সহ্য করেছে, তারা যখন ধর্মান্তর গ্রহণ করল, তখন তাদের পিছনে ইসলাম ধর্মের পুষ্টি এবং মুসলমান শাসনের রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক মদত থাকায় তারা তাদের পূর্বের উৎপীড়ক বর্ণশ্রেষ্ঠ প্রভুদেরও খানিকটা চাপে রাখার সুযোগ পেত। এমনকী সময়-সুযোগ বুঝে এই মানসিক আরামটুকু নিম্নবর্গের মানুষেরা অনেকেই বেশ উপভোগ করেছেন।

ওই যে সামাজিক বঞ্চনার রন্ধ্রপথের কথাটুকু বললাম, মহাপ্রভু চৈতন্য কিন্তু সচেতনভাবে সেই রন্ধ্রপথ খুঁজে সেখানে প্রবেশ করেননি। তিনি সেই রন্ধ্র আপন ধর্মের মধুরতার প্রলেপ দিয়ে বুজিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের পণ্ডিত ঐতিহাসিক

মমতাজুর রহমান লিখেছেন—ইসলামে যে বিশাল পরিমাণ ধর্মান্তর ঘটছিল, চৈতন্য-ধর্মের উত্থানের পর সেই প্রবণতা অনেকটাই কমে যায়। তার কারণ অবশ্যই চৈতন্যধর্মের অন্তর্গত উদারতা এবং সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহিরঙ্গ আচারের অবহ্রাসন এবং শিথিলায়ন। চৈতন্যদেবের সবচেয়ে বড়ো শক্তি হল—তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে থেকেই সেই ধর্মের উদারতার জায়গাগুলি স্পষ্টভাবে খুঁজে বার করেছেন এবং আর সুস্পষ্টভাবে তা প্রচার করেছেন। আর ঠিক এইখানেই মুসলমান সুফিদের সমস্ত প্রভাবের কথা এক্কেবারে নিরাকৃত হয়ে যায়। কেননা ধর্মমতের প্রবক্তা হিসেবে চৈতন্যদেব নতুন কোনও আবিষ্কারক নন বটে, কিন্তু ভীষণ রকমের একজন সংস্কারক বটে—ভীষণ রকমের সংস্কারক এইজন্যই যে, তাঁকে প্রায় আবিষ্কারক বলে মনে হয়। সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, চৈতন্যের প্রধান পরিচয়—তিনি এক বিশিষ্ট ধর্মের প্রবক্তা এবং সেই ধর্মের প্রচারে তাঁকে যে সাহসের পরিচয় দিতে হয়েছিল, সেখানে তিনি একা। যেহেতু তিনি প্রথমত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণপুরুষ, তার পরে অন্য কিছু, তাই প্রথমত সেই ধর্ম এবং দর্শনের নিরিখেই তাঁকে বিচার করতে হবে, কেননা তাঁর সমাজ-সংস্কারের ভূমিকাটুকু সেই ধর্ম-দর্শনের গৌণ ফল মাত্র। ঠিক এই দৃষ্টিতে যদি দেখা যায়, তবে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, চৈতন্যদেব তাঁর সমসাময়িক কালের ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কার অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন, যা রামচন্দ্রের মতো অবতার-প্রমাণ নরচন্দ্রমাও পারেননি। আবার একদিকে ভগবান বুদ্ধের চেয়েও তিনি বড়ো, কেননা, বুদ্ধ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পূর্ণ পরম্পরা এবং সংস্কারের মধ্যে লালিত হয়েও আপন পরম্পরাগত ধর্ম তিনি মানেননি, 'অখিল-ধর্মমূল' বেদকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু চৈতন্য তাঁর নিজের ধর্ম-দর্শনের পরম্পরার প্রতিপক্ষে পৃথক কোনো ধর্মমত গঠন করেননি, এবং নিজের পরম্পরাগত বেদ-উপনিষৎ-পুরাণ থেকেই তিনি তাঁর— উদার ধর্মের মর্ম সংগ্রহ করেছেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও ঠিক এইখানেই জানাতে হবে যে, তাঁর ওপরে কোনো ধরনের সুফি-প্রভাবের প্রশ্নই আসে না। কেননা, যেসব ধর্মীয় উদারতার কথা তিনি বলেছেন—সেগুলি বেদমূলক পুরাণগুলির মধ্যেই পাওয়া যাবে এবং সেগুলি সুফি-সাধনার পর্যায় থেকে অনেক অনেক প্রাচীন।

কী করেছিলেন চৈতন্য, যাতে তাঁর উদার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রবণতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল? কী করেছিলেন চৈতন্য, যাতে বাংলার সমাজ

এবং সংস্কার সমস্ত সংকীর্ণতা ছেড়ে এক নতুন প্রগতির পথে বাহিত হয়েছিল? এক কিংবা দুই কথায় বলা যায়—তিনি নতুন এক আরাধ্য দেবতা দিয়েছিলেন বাঙালিকে এবং সেই সাধ্যের সাধন হিসেবে দিয়েছিলেন ভক্তিকে। তিনি উপহার দিয়েছেন কৃষ্ণকে এবং কৃষ্ণভক্তিকে। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের জটিলতার সঙ্গে দেবতার সংখ্যাও ছিল বহু। যার ফলে শতেক দেবতার কাছে শতরকম ঐহিক ফল চাইতে চাইতে ক্লান্ত ঋষির মনে এই ভাবনার উদয় হয়েছিল যে, কতবার কত ঘৃতাহুতি দিয়ে আর কত দেবতাকে তুষ্ট করব—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ। এই রকম একটা জটিলতার পরেই কিন্তু ব্রহ্মবাদী ঋষিদের সৃষ্টি হয়, যাঁরা অদ্বয় ব্রহ্মের কথা বোঝাতে লাগলেন বিচিত্র কঠিন দার্শনিকতায়। তিনি অণুর থেকেও ছোটো এবং বৃহতের চেয়েও বৃহৎ, তিনি এটাও নন, তিনি ওটাও নন, অথচ তিনি সব, তিনি সর্বব্যাপ্ত—এই যে চরম, পরম দার্শনিকতা—এই কঠিন প্রতিপাদ্য কিন্তু সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়নি, তাঁদের অন্তরে প্রবেশ করা তো দূরের কথা। পুনশ্চ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার জন্য যে সর্বোপরি-বিনিমুক্ত জ্ঞানযোগের কথা বলা হয়েছে, তাও তো একজন সাধারণ মানুষের কাছে একেবারেই বোধগম্য ছিল না। তাহলে অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করার জন্য সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভের ঊর্ধ্বে উঠে জ্ঞানসাধনা করা, সেও কোনো সাধারণের বোধগম্য বস্তু নয়।

ঠিক এ রকম একটা জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে চৈতন্য এমন এক ভগবানের কথা শোনালেন যাঁর মধ্যে বৈদিক দেবতার রূপটুকু ধরা পড়ে, আবার উপনিষদের ব্রহ্মের যে অনির্বচনীয়তা তাও শাস্ত্রানুসারে তাঁর মধ্যে নিহিত হয়েছে। উপনিষদের পরের কালে আদি পুরাণগুলির মধ্যেই কৃষ্ণের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেদ-উপনিষদের সমস্ত মর্ম তাঁর মধ্যে আধান করে। বারবার বলা হয়েছে—সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু হল কৃষ্ণ এবং উপনিষদিক ব্রহ্মের তিনি মূর্তিমান বিগ্রহ। এইরকম একটা ভগবান সাধারণের বোধগম্য হয়ে ওঠেন—এক কথায় তিনি যাজ্ঞবল্ক্য-শ্বেতকেতুর মতো দার্শনিকের ধ্যানগম্য জ্যোতিঃস্বরূপ নন, তিনি খোলাবেচা শ্রীধর, যবন হরিদাস অথবা মুকুন্দ দত্তের অনুভবযোগ্য এবং বোধগম্য ভগবান।

এই কৃষ্ণ ভগবানকে পাওয়াও যায় খুব সহজে। যাগ-যজ্ঞের বালাই নেই, ধ্যান-জ্ঞানের বালাই নেই, শুধু তাঁর নাম করলেই তাঁকে পাওয়া যায়, তাঁকে ভক্তি করলেই তিনি সদয় হন। এই তত্ত্বটা বোঝানোর জন্য চৈতন্যকে বেদ-উপনিষদের দ্বারস্থ হতে হয়নি। গীতা-ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেই তিনি

কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তি—অর্থাৎ সাধ্য এবং সাধনের সহজ প্রতিপত্তি ঘটাতে পেরেছেন। তার মধ্যে আবার ছিল মহাপ্রভুর নিজস্ব ভগবদনুভূতি—যা তাঁর সন্ন্যাস-পরবর্তী সময় থেকে তাঁর তিরোভাব-কাল পর্যন্ত তাকে আপ্লুত রেখেছে এবং যা আমি আরও একশো পাতা লিখলেও এই সংকীর্ণ পরিসরে কিছুতেই বোঝাতে পারব না। শুধু এইটুকু বলি যে, ভক্তি জিনিসটাকেও তিনি আর সাধারণ শরণাগতির পর্যায়ে রাখেননি, তিনি সেটাকে রসায়িত করে ভক্তি-রসায়ন করে তুললেন। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান যে ভক্তমনের মাধুরীতে পুত্রভাবে, সখাভাবে, দয়িত প্রিয়ের মতো মানুষের কাছে নেমে আসতে পারেন—এই রসায়নটুকু যেমন চৈতন্যের সন্ন্যাসোত্তর জীবনে সার্বিক অনুষঙ্গ, তেমনই সাধারণ মানুষের কাছেও এই রস-ভাবের আবেদন ভগবানের ওপর তাঁদের অধিকার-বোধ জাগ্রত করেছে।

আমি যে এই প্রবন্ধের প্রথমে সেই শিব-ভক্তের রসায়িত ভক্তির প্রসঙ্গ তুলেছিলাম, তা সুফি-সাধকদের আগমনের পূর্ববর্তী শ্লোক-ভাবনা। আবার চৈতন্য মহাপ্রভুকে যেভাবে কৃষ্ণভক্তিকে রসায়িত করেছেন, তাও সুফি-ভাবুকদের বহু পূর্ববর্তী পৌরাণিক ভাব—যা বেদ-উপনিষদের পরম্পরায় শাস্ত্র হিসেবে পুরাণগুলির অন্তর্বর্তী হয়েছে, বিশেষত ভাগবত-পুরাণ এবং আরও প্রাচীন বিষ্ণু পুরাণ-এ এই রসময়ী কৃষ্ণভক্তির প্রথম বিস্তার। মহাপ্রভু তাঁর আত্মানুভবেই বুঝেছিলেন—এই ভক্তি মানুষের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে, ফলে সমস্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদকে তিনি এই পৌরাণিকী ভক্তির প্রচার-নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন—সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন। তার মানে, বেদ-উপনিষদের তাত্ত্বিকতা নয়, বরঞ্চ তৎকালীন লোকধর্মী পুরাণগুলির প্রমাণে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তির সরসতা প্রচার করে একদিকে তিনি জাতিবর্ণ-দীর্ণ সমাজের অন্তরে প্রবেশ করেছেন, তেমনই অন্যদিকে প্রশাসনিক সুরক্ষায় চলা ইসলাম-ধর্মে সাধারণের ধর্মান্তর গ্রহণের প্রবণতাও রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এমন মানুষই মানুষের প্রাণের মানুষ এবং ভগবান বলে চিহ্নিত হন যুগে যুগে।

৬

নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের অন্তর্গৃহে যে কীর্তন আরম্ভ হয়েছিল, তা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র বঙ্গদেশে। যেসব ভক্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নবদ্বীপে এসে পৌঁছেছিলেন, তাঁরা নিজের অনুভবের সঙ্গে মহাপ্রভুর অনুভব পৌঁছে দিয়েছিলেন নিজের নিজের দেশে। কিন্তু মহাপ্রভুর নিজের অনুভব-সিদ্ধি এতটাই যে, তা শুধু বঙ্গদেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকার মতো নিশ্চল ছিল না। নিজের অন্তরের মধ্যে যে কৃষ্ণপ্রেম তিনি অনুভব করছিলেন, সে প্রেম দীন-হীন সকল জনের মধ্যে সঞ্চারিত হোক, এমন এক উচ্ছল ভাব তাঁকে ঘরছাড়া করে দিল। নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস নিয়ে সেই কৃষ্ণচৈতন্য হলেন—পুরুষোত্তম কৃষ্ণের সম্বন্ধে চৈতন্য জাগরণের জন্য।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর চৈতন্য যেমন-যেমন কাজ করেছেন, যেমন ভাবে চলেছেন এবং তাতে যত মানুষের হৃদয় পরিবর্তন ঘটেছে, তা আমার স্বাত্মানুভবে ব্যাখ্যা করতে গেলে বৃহৎ পরিসর লাগবে। তবু প্রভুর এই সন্ন্যাস-ধর্মের মধ্যেও অদ্ভুত যেসব বৈশিষ্ট্যগুলি আমার পরম্পরাগত অনুভবে ঋদ্ধ হয়ে আছে, তার কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। আসলে মহাপ্রভুর ধর্মটাই এমন যে, এখানে প্রচণ্ড ত্যাগ-বৈরাগ্যের মধ্যেও এক গভীর ভালোবাসাবাসির অবসর রয়ে গেছে এবং তা রয়ে গেছে হয়তো এই কারণেই যে, চৈতন্যধর্মের সাধ্য-সাধন সবটাই ভালোবাসা নিয়ে—অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার। চিত্র ভাব, গুণ, চিত্র ব্যবহার।।

প্রভু যে সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, এই সন্ন্যাসের কথাও তাঁর দুই-তিন জন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া কেউ জানল না। অদ্ভুত লাগে শুনলে—সন্ন্যাসী হবার জন্য যখন তাঁর মাথা ন্যাড়া করা হচ্ছে, তখন সেই ন্যাড়া মাথা দেখেও মানুষ কাঁদছে। ভাবছে, এমন আজানুলম্বিত গৌরবর্ণ শরীরে চাঁচর কেশগুলি কাটা গেল—কী না জানি হয়ে গেল। সন্ন্যাসের পর প্রভুর কোনো বাহ্যজ্ঞান ছিল না। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি এতই অধীর যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের লীলাভূমি দেখবার জন্য তাঁর মন-প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে। পর পর তিন দিন তিনি আকুল হয়ে ছুটছেন—কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ্ কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ্। তাঁর সঙ্গে আছেন তাঁর বাল্যসঙ্গী মুকুন্দ দত্ত, চন্দ্রশেখর

আচার্য এবং নিত্যানন্দ প্রভু। চৈতন্য একে-তাকে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করছেন, কিন্তু কী অদ্ভুত বিচিত্র চৈতন্যসঙ্গীদের ভালোবাসার ব্যবহার—তাঁরা বুঝতে পারছেন যে, প্রভুর যে দশা তাতে এইরকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় বৃন্দাবনের পথ ধরলে কখন যে কী হবে কে জানে। নিত্যানন্দ প্রভু অদ্ভুত কৌশলে সন্ন্যাসী কৃষ্ণচৈতন্যকে পথ ভাঁড়িয়ে নিয়ে চলেছেন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাসভবনে। চন্দ্রশেখরকে আগে পাঠিয়ে দিলেন নিত্যানন্দ যাতে অদ্বৈত নৌকা নিয়ে তৈরি থাকেন।

হঠাৎ অদ্বৈতকে দেখে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন—এই তো তোমার সঙ্গে বৃন্দাবন যাব। কিন্তু বৃন্দাবন যাবার পথে আগে তো যমুনা-দর্শন করতে হবে। বাহ্যজ্ঞানহীন চৈতন্য প্রবাহিণী ভাগীরথী-গঙ্গা দেখেই ভাবলেন বুঝি—সেই যমুনা প্রবাহিণী। অদ্বৈতের নৌকা যখন শান্তিপুরের পথ ধরল তারও বেশ খানিক পরে প্রভু বুঝলেন যে নিত্যানন্দ তাঁকে বঞ্চনা করে নিয়ে এসেছেন অদ্বৈতের ঘরে। অদ্বৈত বিনয় করে বলেছিলেন—এক মুষ্টি অন্ন রান্না হয়েছে বাড়িতে, সঙ্গে সামান্য শাক-শুক্তো-ডাল। এটুকু খেয়ে তুমি যাবার জোগাড় কোরো। কিন্তু প্রভুকে এমন বঞ্চনার পিছনে তাঁর ভক্তদের ভাবনা ছিল আরও গভীর। নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে দিয়ে অদ্বৈতগৃহে খবর পাঠিয়ে তাঁকে চলে যেতে বলেছিলেন নবদ্বীপে, যাতে জননী শচীমাতা একবার তাঁর পুত্রকে দেখতে পান। গৃহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা আসেনি, কেননা সন্ন্যাসের পর স্ত্রীকে আর দেখা চলে না।

অদ্বৈতও মিথ্যা বলেছেন—শাক-শুক্তোর জায়গায় যেমন আয়োজন হয়েছে, তাকে মহোৎসব বলাই ভালো এবং বৃদ্ধ অদ্বৈতের বায়না হল—তিনি নিজে পরিবেশন করে প্রভুকে খাওয়াবেন। আমি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মহান তত্ত্বগুলি ছেড়ে এইসব সামান্য ঘটনার উল্লেখ করছি, তার কারণ এই ধর্মের মধ্যে প্রচণ্ড বৈরাগ্যের যে কী অদ্ভুত মমতা আছে, তা নিজে অনুভব করেছি বলেই এইসব ছোট্ট ঘটনা আমার কাছে অনেক বড়ো। আমার মনে আছে—একবার নবদ্বীপের হরিবোল কুটিরে নিষ্কিঞ্চন বাবাজি মুকুন্দ দাসজি আমাদের প্রসাদ পাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মুকুন্দ দাসজি বিখ্যাত হরিদাস দাসের ছোটো ভাই। হরিদাস দাস সারা জীবন ধরে রূপ গোস্বামী এবং অন্যান্য তত্ত্ববেত্তাদের গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান। আর মুকুন্দ দাসজি তাঁর দাদার সম্পাদিত গ্রন্থগুলি বিশাল ঝোলায় পুরে বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং বৈষ্ণব সুজনের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতেন। যতটুকু লাভ হত, তাই দিয়ে আবার

গ্রন্থ ছাপা হত। শীর্ণদেহে ঝোলাবাহী মুকুন্দ দাসজি বলতেন—এই আমার সেবা। গুরুস্থানীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গ্রন্থ প্রচার করা।

সেই মুকুন্দ দাসজি নিজে সারা দিন রান্না করে আমাদের যত ব্যঞ্জনে প্রসাদ খাইয়েছিলেন তা যদি জানতে পারতেন আপনারা, তাহলে অদ্বৈত আচার্যের এই সেবাধর্মটুকুও বুঝতে পারবেন। আপনারা ভাবতে পারবেন না—এই সেবাধর্মের মধ্যে অন্তরঙ্গতা এবং আবেগ এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, যাতে ঝগড়া লেগে যাওয়াটাও অসম্ভব নয়। প্রভু বললেন—আরে সন্ন্যাসী হয়ে কেউ এত ব্যঞ্জনে খায় নাকি। অদ্বৈত বললেন—তোমার ওই সন্ন্যাসের ঢঙ্ রাখো। তোমার মতো সন্ন্যাসী আমি অনেক দেখেছি। তুমি খাও। মহাপ্রভুকে খেতে হল, কেননা না খেলে বৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য আত্মহত্যার ভয়ও দেখাতে পারেন। আসলে ভক্তের দিক থেকে এই অন্তরঙ্গতা এবং প্রভুর দিক থেকেও এই ভক্তবাৎসল্য—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণটুকু এখানে—সন্ন্যাসীর ধর্ম শুধু এইখানেই অতিক্রান্ত হয়, অন্যত্র নয়। আচার্য অদ্বৈতের ঘরে সন্ধ্যায় কীর্তন আরম্ভ হল। মুকুন্দ দত্ত গান ধরলেন—কি কহব রে সখি আনন্দ-ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর। প্রভু বাহ্যজ্ঞান হারালেন কৃষ্ণ-গীতি শুনে।

পরের দিন সকালে অদ্বৈত-গৃহে তখনও কীর্তন চলছে, জননী শচীদেবী উপস্থিত হলেন চন্দ্রশেখর আচার্যের তত্ত্বাবধানে। শচীর সঙ্গে—নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ। আসলে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল। তিনি বুঝেছিলেন— মহাপ্রভুকে আর ধরে রাখা যাবে না এবং যেভাবে তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন তাতে মায়ের মন পাগল হয়ে গেছে। তাঁর বড়োছেলে বিশ্বরূপ কবেই সংসার ছেড়ে চলে গেছে, এ ছেলেও গেল। তা ছাড়া মহাপ্রভু এমনই আকস্মিক সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, যাতে দুঃখিনী শচীদেবী পাগলপারা হয়ে গেছেন পুত্রশোকে। বলতে পারেন—সন্ন্যাসী হয়ে এত-শত ভাবার দরকার কী, মায়া-মমত্ব এসব তো সন্ন্যাসীর বর্জ্য বৃত্তি। আরও আশ্চর্য হল নিত্যানন্দ প্রভুর স্বভাব। তিনি অবধূতবৃত্তি মানুষ, পরিধানের কাপড়টির ওপরেও তাঁর মমত্ব নেই। তিনি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমন উল্টে দিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছেন নবদ্বীপের পাশের গাঁয়ে শান্তিপুরে। আমি এইসব ছোট্ট ছোট্ট ব্যবহার ব্যাখ্যা করার জন্যই এইসব প্রসঙ্গ তুলছি। মহাপ্রভু তো সন্ন্যাস নিয়েছেন, জগৎ-সংসারের প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি নেই, তবু স্নেহময়ী জননীকে দেখামাত্র কোনো এক অদ্ভুত অপরাধ-বোধে দণ্ডবৎ কাঁদতে

লাগলেন। মাথায় সেই লালিত চাঁচর কেশ নেই, মাথা ন্যাড়া দেখে জননীর বুক ফেটে গেল।

অনেক কাঁদলেন শচীদেবী। পুত্রের কাছে তাঁর একটাই আতুর নিবেদন—নিমাই যেন সন্ন্যাসী হয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের মতো একেবারে হারিয়ে না যান। মহাপ্রভু অদ্ভুত সুন্দর করে বললেন—এ শরীর আমার নয়, 'তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে'। আমি কখনও উদাসীন হব না তোমার প্রতি। তুমি আমাকে যেখানে থাকতে বলবে সেখানেই থাকব। শচীদেবীও তেমন এক জননী, তিনি সন্ন্যাসী পুত্রের অমর্যাদা করে নবদ্বীপে বা শান্তিপুরেই তাঁকে থাকতে বলবেন, এমন নয়। প্রভু নিজেও ভক্তদের ডেকে বললেন—তোমাদের ছেড়ে অথবা মাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। কিন্তু এও তো সন্নাসীর ধর্ম নয় যে, জন্মস্থানে বাস করব। বরঞ্চ 'সেই যুক্তি কর যাতে রহে দুই ধর্ম।' সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করে শচীমাতা বললেন—নিমাই নীলাচল পুরীতে বাস করুক—সেখানে সকলের যাতায়াত আছে, আমি ছেলের খবর পাব, তাতেই আমি বেঁচে থাকব। মহাপ্রভু মায়ের কথা মেনে নিয়েছেন।

পৃথিবীতে বোধহয় আর কোনো সন্ন্যাসীর মুখে এমন কথা শোনা যাবে না। মহাপ্রভু বলেছেন—আমি তোমাদের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকতে পারব না। হয়তো একথা সন্ন্যাসীর কঠিন মমত্বহীন স্বভাবের সঙ্গে মেলে না, কিন্তু তাই বলে এটা ভাবারও কোনো কারণ নেই যে সন্ন্যাসীর অপেক্ষিত শম-দমের সাধন মহাপ্রভুর ছিল না। ত্যাগ-বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাসীর আচার এতটাই কঠিনভাবে তিনি পালন করতেন যে, তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাতে কষ্ট পেত মনে মনে। আবার এত কাঠিন্য সত্ত্বেও কোথাও কোথাও যে তিনি ছেড়ে দেন, সেখানে তাঁর নিজের থেকেও অন্য অন্তরঙ্গ জনের দুঃখ-কষ্ট-আনন্দের কারণটুকু তাঁর কাছে বড়ো হয়ে ওঠে। অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হলে এমন পাগলপারা স্বভাবই তার হত না যে, তাকে ভুলিয়ে উলটো দিকে নিয়ে আসা যেত। কিংবা যদি বা তিনি আসতেন, হঠাৎই নিজের জননীকে দেখে তিনি বলে উঠতে পারতেন—কে কার পুত্র, কে কার জননী—কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ।

চৈতন্যের ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। আসলে তাঁর ধর্মের চরিত্রের মধ্যেই এমন এক অনন্ত মধুর মমত্ব আছে—যেখানে শাস্ত্র-পুস্তক-বাহিত আচারগুলি বড়ো গৌণ হয়ে যায়। একটা উদাহরণ দিই। কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর সন্ন্যাসীর

চিহ্ন হিসেবে গুরুর কাছে থেকে তিনি ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেছিলেন। শাস্ত্র বলে—শরীর, মন এবং বাক্য এই তিন ইন্দ্রিয়'কে চরম সংযত রাখার জন্য সন্ন্যাসীকে ত্রিদণ্ডী হতে হয়। কিন্তু পুরী যাবার পথে আঠারো নালায় মহাপ্রভুর দণ্ড ভেঙে দিলেন নিত্যানন্দ। আসলে কৃষ্ণপ্রেমে যিনি মাঝে-মাঝেই বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়েন, তাঁর পক্ষে সদা-সর্বদা এমন দণ্ড-ধারণ করে চলাটা কষ্টকর এবং তা মহাপ্রভুর শারীরিক বিপত্তি ঘটাতে পারে ভেবেই নিত্যানন্দ তিন খণ্ড করে ভেঙে ফেললেন সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ড। অন্যদিকে মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর দণ্ডভঙ্গে নিত্যানন্দের ওপর বাইরে একটা রাগ দেখালেন বটে, কিন্তু সে রাগ জিইয়ে রাখতে পারলেন না অন্তরের মধ্যে। হয়তো স্মরণে এল ভাগবত পুরাণ-এর কথাও। ভাগবত বলেছে—বাক্যের দণ্ড মৌন, দেহের দণ্ড সকাম কর্মগুলি ত্যাগ করা এবং চিত্তের দণ্ড প্রাণায়াম—এই তিন দণ্ড যাঁর মনের মধ্যে নেই, তাঁর বাঁশের দণ্ড বেয়ে চললে কী লাভ হবে!

আসলে এটাও কথা নয়। জীব গোস্বামী তাঁর সন্দর্ভ-গ্রন্থে বলেছেন—ভগবান, ভক্তি আর ভক্ত হচ্ছে ঘুড়ির মতো—সুতোর এক দিক ধরে আছেন ভক্ত, ভগবান আছেন সুতোর ওপ্রান্তে ঘুড়ির মতো আর মাঝখানে আছে ভক্তির সুতোটি। ভক্তি বস্তুটাই এমন যেখানে একটা পারস্পরিক গ্রন্থি আছে—এখানে এক ভক্ত আর এক ভক্তকে বেঁধে রাখে, কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না। যিনি কৃষ্ণপ্রেমের সাধনা করছেন তাঁর বৈরাগ্য তো ভালোবাসার বন্ধনহীন হতে পারে না। অতএব সব ত্যাগ করার পরেও মহাপ্রভু ভক্তের ভক্তি এবং ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা উপেক্ষা করতে পারেন না। সন্ন্যাসীর কাঠিন্য উল্লঙ্ঘন করেও মহাপ্রভু ভালোবাসার গ্রন্থিটুকু স্বীকার করেন। এর ফল হয় এইরকম—জননী যখন বলেন—যতদিন নিমাই অদ্বৈতের গৃহে থাকবে, আমি তাকে রেঁধে খাওয়াব। প্রভু জননীর বাৎসল্য স্বীকার করেন। আবার একবার বিদায় নেবার মুহূর্তেও যদি অদ্বৈত আচার্য বলেন—'আর দিন দুই চারি রহ কৃপা তো করিয়া'—প্রভু সেটা ফেলতে পারেন না। তিনি অদ্বৈত-গৃহে থেকে যান আরও দু-চার দিন। যবন হরিদাস তাঁর কাছে বিনয় করে বললেন—তুমি নীলাচল শ্রীক্ষেত্রে থাকবে, সেখানে আমি কী করে যাব? প্রভু তাঁকেও ফেলতে পারেন না। বলেন—আমি জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করব তোমার জন্য, আমি যেখানে যাব, সেখানে তোমায় আমি নিয়ে যাব।

ভক্তির জগতের মধ্যে এই মাখামাখিটা আছেই। এখানে ত্যাগ-বৈরাগ্য অবশ্যই থাকতে হবে, সেটা সাধনের অঙ্গ। কিন্তু একই সাধনের অংশভাগী যাঁরা, তারা কেউ

একে অপরের প্রতি মমত্বহীন নন। সমস্ত ভক্তদের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে মহাপ্রভু ছত্রভোগের পথ দিয়ে নীলাচল যাত্রা করলেন। সঙ্গে রইলেন চার অন্তরঙ্গ ভক্ত—নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং, আর জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত এবং আবাল্য সঙ্গী মুকুন্দ।

প্রভু রেমুণায় এলেন ক্ষীরচোরা গোপীনাথের স্থানে—তাঁর পরমগুরু মাধবেন্দ্রপুরীর সেবিত বিগ্রহ দেখলেন প্রাণ ভরে। স্মরণে এল মাধবেন্দ্রপুরীর শেষ কৃত শ্লোক—অয়ি দীন-দ্রয়ার্দ্রনাথ—কৃষ্ণপ্রেমে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন চৈতন্যদেব। রেমুণা থেকে যাজপুর, সেখান থেকে কটক—যেখানে সাক্ষী-গোপাল আছেন। সাক্ষীগোপালের বিচিত্র উপাখ্যান এখানে শোনানো গেল না। মনে দুঃখ রইল তার জন্য। গোপাল-দর্শন করে মহাপ্রভু ভুবনেশ্বর, আঠারো-নালা হয়ে পুরীতে পৌঁছলেন। জগন্নাথ দর্শন করার জন্য প্রভুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেছে ততক্ষণে—চার অনুসঙ্গী ভক্তদের পিছনে রেখে তিনি জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করবেন। দূর থেকে জগন্নাথকে দেখে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বিভ্রম ঘটল তাঁর। একান্ত অনুভবের আনন্দে তিনি ছুটলেন দয়িত শ্যামল কিশোরকে আলিঙ্গন করার জন্য। কিন্তু সে বিগ্রহস্থান পর্যন্ত আর যাওয়া হল না। প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন ভুঁয়ে।

আমার সহৃদয় পাঠককুল। মহাপ্রভুর এই প্রেমমূর্ছার ঘটনা বারবার যদি উচ্চারণ করি, তাহলে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, মহাপ্রভুর এই কৃষ্ণপ্রেম-রসায়িত সাত্ত্বিক বিকারগুলি আপনাদের ভালো করে বোঝাতেও পারব না আমি। যদি হরিস্মরণে সরস না হয়ে ওঠে মন, যদি কৃষ্ণের ললিত-কলা-বিলাসে ভক্তিপূত আবেশ এবং কৌতূহল না থাকে, তবে কী করে বোঝাব মহাপ্রভুর এই ভাব। আপনারা ইতিহাস বুঝবেন, আপনারা এটা ভালো বুঝবেন যে, কীভাবে সংকীর্তনের ছত্রচ্ছায়ায় দীন-হীন-নীচ-ধনী একত্রে সম্মিলিত হয়, এমনকী আপনারা এটাও বুঝবেন যে, চৈতন্যের মতো 'কালচারাল স্পেশিয়ালিস্ট' বা 'কালচারাল মিডিয়েটর' একবার জন্মালে সমাজের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আসে; কিন্তু জগন্নাথ-দেবকে দেখে প্রভুর রাধিকা-মনের মধ্যে শ্যামল-কিশোরের আহ্বান আসে কী করে—এই মধুর ভাব আমি কী করে বোঝাব!

একবার রূপ গোস্বামীর কথা ভাবুন। তিনি বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর বিগ্রহ-সেবা করতেন। শোনা যায়—আউরঙ্গজেবের আমলে রাজভয়ে সে মূর্তি রাতারাতি বৃন্দাবন থেকে জয়পুর নিয়ে যাওয়া হয়। আমি রাজস্থানে জয়পুরে নেমেই

গোবিন্দজীর দর্শন করতে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম—এক আধুনিকা বিবাহিতা সুন্দরী মহিলা, তিনি লাজ-লজ্জা ত্যাগ করে গোবিন্দজীর সামনে নৃত্য প্রদর্শন করছেন। এ কোনো মঞ্চনৃত্য নয়, গোবিন্দজীর আরতি হচ্ছে, অন্যেরা দর্শন করছে, কেউ ফুল ছুঁড়ছে, কেউ গোলাপ জল ছুঁড়ছে, আর ইনি সবার মধ্যে সামান্য একটু জায়গা বার করে, সুন্দর অঙ্গবিভ্রমে নৃত্য দেখাচ্ছেন—কাকে? না, গোবিন্দজীকে। রূপ গোস্বামী বলেছিলেন—সখা আমার! তোমার যদি সংসার-ধর্মে মতি থাকে, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্রের ওপর প্রগাঢ় প্রীতি থাকে, তাহলে যেন আমার এই গোবিন্দজীর বিগ্রহ দেখতে এসো না। কেননা, তাঁকে দেখলেই ছুটে যাবে ঘর-সংসারের নেশা, ছুটে যাবে ইহজগতের সমস্ত তৃষা—মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ।

প্রস্তরময়ী গোবিন্দমূর্তির মধ্যে সৌন্দর্য-মাধুর্যের যে প্রাণ রূপ গোস্বামী দেখেছিলেন, সে প্রাণ, সেই মধুরা ভক্তি আমার আছে? নইলে, কই আমিও তো তাঁকে দেখে এলুম, আমার তো তেমন হল না। এমনকী তেমনও কি হল, যাতে লাজ-লজ্জা ভুলে স্ত্রী-সত্তায় প্রাণারাম শ্যামলসুন্দরকে নাচ দেখাতে পারি? আসলে আমরা এই ভাব-জগতের ধারে-কাছেও নেই, যাতে সেই রূপ গোস্বামীর রস-ভাব বুঝতে পারি, আর ঠিক সেই কারণেই শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেখে বা রেমুণায় গোপীনাথ দেখে মহাপ্রভু যে কেন এমন বারবার মূর্চ্ছা যান তা বুঝতে পারি না। কিন্তু যিনি বোঝেন, তিনি ঠিক বোঝেন। যেমন এই রূপ গোস্বামী—তিনি কিন্তু মহাপ্রভুর অন্তরের গূঢ় রসভাবটুকুও বোঝেন। বোঝেন, কেননা মহাপ্রভুর হৃদয়ে যে ভাব আছে, সে ভাব তাঁরও অন্তরে আছে বলেই সমান অনুভবে তিনি মহাপ্রভুকে বুঝতে পারেন, কিন্তু আমি পারি না বা আপনাদেরও তা বোঝাতে পারব না। তবু ভাব বোঝাবুঝির এই ব্যাপারটা যদি আপনাদের বোঝাতে পারি, তাহলে অন্তত বলতে পারব—কেন আমি আপনাদের বোঝাতে পারি না মহাপ্রভুর ভাব।

আমি এই প্রবন্ধের ছোট্ট পরিসরে কোথাও জানাতে পারলুম না, কীভাবে মহাপ্রভু হুসেন শাহর দরবার থেকে রূপ-সনাতনের মতো দুই রাজমন্ত্রীকে আপন ভাব-জগতে এনে স্থাপন করলেন, কিন্তু তার আগেই রূপের ভাব-গ্রন্থিমোচনের সংবাদ দিচ্ছি। ঘটনা হল—সেবারও জগন্নাথের রথোৎসব চলছে। গৌড়দেশ থেকে অগণিত ভক্ত এসেছেন সচল মহাপ্রভুর সঙ্গে অচল জগন্নাথ মহাপ্রভুর দর্শন করবেন বলে। ততদিনে রূপ-সনাতন রাজকার্য ছেড়ে চলে এসেছেন মহাপ্রভুর

কাছে—তাঁরা বৃন্দাবনে চলে যাবেন কিছু দিন পরে। চলে এসেছেন যবন হরিদাস, নবদ্বীপ ছেড়ে। এখন তিনি পাকাপাকি নীলাচলবাসী। যাইহোক, উড়িয়া, গৌড়িয়া—প্রভুর যত ভক্ত আজ নেমে এসেছেন রথের সামনে। প্রভু জগন্নাথ রথোপরি স্থাপিত হয়েছেন, সমস্ত জনারণ্যের মাঝখানে শুধু জয়কার-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—জয় জগন্নাথ! জয় মহাপ্রভু নীলাচল নাথ!

আমি এক কথায় দুই কথা বলব। এক কথা হল—মহাপ্রভু জননী শচীদেবীর উপরোধে নীলাচলক্ষেত্রে রয়ে গেলেন, পরে তিনি বৃন্দাবনে গেছেন বটে, কিন্তু স্থায়ী আবাস শ্রীক্ষেত্র। দ্বিতীয় কথা হল—পুরীতে থাকার ফলে তাঁর মধ্যে সেই চিরন্তন বিরহ-দশা রয়েই গেল। ভাবটা এই—জগন্নাথের মধ্যে সেই শ্যামল-সুন্দরকে পেলাম বটে, কিন্তু বৃন্দাবনের মধুর রমণ-বসতিতে তাঁকে পেলাম না। যাইহোক, রথাগ্রে উড়িয়া-গৌড়িয়াদের সংকীর্তন চলছে। হঠাৎই চৈতন্যদেব একটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করলেন সকলের সামনে। বলে নেওয়া ভালো—মধুর যে ছন্দোময়ী বাণী মহাপ্রভুর মুখ থেকে নির্গত হল, তার ভাব-রস সবটাই একেবারে প্রাকৃত সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেমের বিষয়। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের বিশিষ্ট ভাবুকেরা এই শ্লোক বারংবার উদাহরণ হিসেবে দিয়েছেন ব্যঞ্জনা-বৃত্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখানোর জন্য। সকলেই অবাক হয়ে গেল—মহাপ্রভু কৃষ্ণের কীর্তন অথবা তাঁর লীলাবিষয়ক মধুরালাপ বাদ দিয়ে কেন জগন্নাথের সামনে এমন এক জর্জর প্রাকৃত শ্লোক উচ্চারণ করলেন? এত কথার পর সেই শ্লোকের অর্থ না বললেই নয় এবং আরও বলা দরকার যে, এই শ্লোক লিখেছেন সংস্কৃতের এক বিখ্যাত মহিলা কবি।

প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমিকের দেখা হয়েছে বহুকাল পরে, কিন্তু যেখানে দেখা হয়েছে, সে জায়গাটা প্রেমিকার ভালো লাগছে না—এমন একটা জায়গা যেখানে প্রেমের সার্থক উদ্দীপন ঘটে না। প্রেমিকা বলছে—সেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল। আমার প্রথম যৌবনে যিনি আমার কুমারীত্ব হরণ করেছিলেন, যিনি আমাকে অশেষে-বিশেষে কামনা করেছেন, আমার সেই কুমারীত্ব-হরণ-করা বর আমার সামনেই উপস্থিত, আছে সেই চৈত্রের রজনীও—বসন্ত রজনীর কোকিলালাপ-বাচাল যত উপকরণ, তাও ঠিকই আছে, সেই উন্মীলিত মালতীফুলের হাওয়া ভেসে আসছে প্রৌঢ়পুষ্প কদম্বের রেণু গায়ে মেখে। এমনকী আমিও তো সেই আমিই আছি। কিন্তু এ কেমন বুকের মধ্যে উথালি-পাথালি লাগে আমার—সেই যে সেই রেবা নদীর তীরে বেতসী-লতার কুঞ্জভবনে তাঁর সঙ্গে যে আমার দেখা হত, প্রেমের

সেইসব প্রথম আকুলতার অভিসন্ধিগুলি আমার সেই লজ্জা-কুঞ্জে ফেলে এসেছি, সেই রেবার তীরে বেতস-গৃহখানির জন্য আমার মন কেমন করে। ইচ্ছে করে সেইখানে ফিরে যাই আবার।

জগন্নাথের রথের সামনে সমস্ত ভক্তদের মধ্যে যখন এক দৈবভাব উদ্দীপিত হচ্ছে, সেই সময়ে এমন এক প্রাকৃত নায়িকার প্রেমাকুল বর্ণনা সবাইকে অবাক করে দিল। একবার নয়, দুবার নয়—এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়েন বারবার। কেউ যার অর্থ বুঝল না, অন্তত চৈতন্যদেব কেন এই সময়ে এমন শ্লোক পড়লেন, তার অন্তর্গূঢ় রহস্যটা একজনই মাত্র বুঝতে পারলেন। তিনি হলেন পুরীতে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী স্বরূপ-দামোদর। মহাপ্রভুর অন্তরের এই আর্তি কেন, সেটা স্বরূপ বুঝলেন বটে, কিন্তু কাউকে বললেন না। হুসেন শাহের মন্ত্রী দবির খাস রূপও কিন্তু সেবার পুরীতে এসেছিলেন মহাপ্রভুর কাছে। সেই রথযাত্রায় তিনিও ছিলেন প্রভুর কাছাকাছি। তিনিও শ্লোক শুনে স্বস্থানে ফিরে গেছেন।

রূপ, সনাতন আর যবন হরিদাস—এই তিনজন জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করতেন না। বহুকাল মুসলমান সুলতানদের রাজকর্ম করেছেন সেইজন্য রূপ-সনাতন নিজেদের বড়ো হীন এবং ম্লেচ্ছ বলে ভাবতেন, আর হরিদাসের দীনতা ছিল প্রশ্নাতীত। এঁরা জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করতেন না বলে মহাপ্রভু নিজেই এই তিনজনের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন প্রতিদিন। সেই রথযাত্রার পরের দিন জগন্নাথের প্রাতঃকালীন উপল-ভোগ দর্শন করে মহাপ্রভু এসেছেন ওই তিনজনের সঙ্গে দেখা করতে। এসে দেখলেন—রূপ গেছেন সমুদ্র-স্নান করতে। হঠাৎই ওপর দিকে নজর পড়তে শ্রীরূপের ঘরের চালের ওপর তালপাতায় লেখা একটি সংস্কৃত শ্লোক দেখতে পেলেন মহাপ্রভু। সে-যুগে বহু কসরত করে লেখার কালি তৈরি করতে হত এবং তালপাতায় লেখার পর তা শুকোতে দিতে হত। তা ঘরের চালে শ্লোক শুকোতে দিয়ে রূপ স্নানে গেছেন আর তখনই মহাপ্রভুর নজরে এল রূপের অপূর্ব হস্তাক্ষর—শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাতি।

রূপের লেখা শ্লোক পড়ে মহাপ্রভু একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর অন্তরের মধ্যে সেই কৃষ্ণপ্রেমের আকুল ভাব জাগল, তিনি আবিষ্ট হয়ে রইলেন। স্নানশেষে রূপ ফিরে এসেই দণ্ডবৎ প্রণাম করে লুটিয়ে পড়লেন মহাপ্রভুর পায়ে। প্রভু তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—কেউ যে-কথা বুঝতে পারল না—মোর মনের কথা তুই জানিলি কেমনে? আনন্দে মহাপ্রভু সেই শ্লোক-পাতি নিয়ে চললেন

স্বরূপ-দামোদরকে দেখানোর জন্য। রূপ যে শ্লোক লিখেছেন সেটাও এক রমণীর বয়ান, কিন্তু সেটা প্রেমময়ী রাধার কথা, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। পুরাণে প্রমাণ আছে—রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের একবার দেখা হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রও বটে। যুদ্ধ লাগলেই দুই বিবাদী ক্ষত্রিয় শিবির এখানে উপস্থিত হতেন ভালো করে যুদ্ধ করার জন্য। বিখ্যাত পানিপথ—যেখানে অন্তত তিন-তিনটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয়েছে—সেই পানিপথও কিন্তু কুরুক্ষেত্রের পরিসরের মধ্যেই। তার মানে কুরুক্ষেত্র মানেই যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র মানেই যুযুৎসু ক্ষত্রিয়ের আনাগোনা। আর এই রকম একটা বিপরীত জায়গায় রাধার সঙ্গে দেখা হয়েছে কৃষ্ণের। রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত অনুবাদে ব্যাপারটা রাধার আকুলতায় ধরা পড়েছে। তিনি সহচরী সখীদের বলছেন—

সেই প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে, সখী! কিন্তু দেখা হল এই কুরুক্ষেত্রে। অথচ সেই কৃষ্ণ তো কৃষ্ণই আছেন, আমিও সেই আমিই আছি। এমনকী আমাদের মধ্যে যে সেই মধুর মিলন তাও ঘটেছে, এই কুরুক্ষেত্রে। কিন্তু তবু, তবু সেই যমুনা-পুলিন-বনে মধুর মুরলীর পঞ্চম তান যা আমার মনের মধ্যে হু-হু করে উঠত, সেই যমুনা-পুলিনে যদি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হত আমার, তাঁর জন্যে অন্তরে আমার দুঃখ রয়ে গেল।

ধরে নেওয়া যাক, রূপকৃত এই শ্লোকটি পুরাতন এক প্রাকৃত শ্লোকের কৃষ্ণলীলায় রূপান্তর করা বৈষ্ণবীয় অনুবাদ। কিন্তু এখানে যেটা বড় হয়ে উঠেছে, সেটা হল হৃদয় বোঝার ব্যাপার। মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমসিক্ত হৃদয়টি এমন করে কে বুঝতে পেরেছে। মহাপ্রভুর হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে কৃষ্ণপ্রেমে, হৃদয়ের মধ্যেও সেই চিরবিরহকাতর রাধাভাব। অথচ মায়ের ইচ্ছার মূল্য দিতে গিয়ে সন্ন্যাসীর স্বাধীনতা গ্রহণ করে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে থাকতে পারলেন না। নীলাচলক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মধ্যেও তিনি তাঁর শ্যামল-কিশোরকে দেখতে পান বটে, কিন্তু তাত্ত্বিকতার দিক থেকে সেই দর্শনে ভেদ না থাকলেও কৃষ্ণের স্বপদ-রমণ বৃন্দাবনের মধ্যেই রাধা যেমন তাঁকে পেতে চান, মহাপ্রভুর ভাবও তেমনই। পুরীতে জগন্নাথকে যখনই দেখেন, প্রভু ভাবেন যেন কুরুক্ষেত্রে দেখা হয়েছে কৃষ্ণের সঙ্গে। কবিরাজ কৃষ্ণদাসের অনবদ্য পয়ারে ভাবটা এই রকম দাঁড়ায়—

সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।।

ইঁহা লোকারণ্য হাতী ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পবন ভৃঙ্গ পিক নাদ শুনি।।
ইঁহা রাজবেশ সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের গণ।
তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন।।
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সে সুখ সমুদ্রের ইঁহা নাহি এক কণ।।

আমরা এই প্রসঙ্গে এসেছিলাম ভাব বোঝাবুঝির প্রসঙ্গে। প্রভু এক-একটি জায়গায় যান, আর কৃষ্ণের বিগ্রহ দেখেই মূর্ছিত হয়ে পড়েন—সেই মূর্ছার কারণ বোঝাতে এত কথার অবতারণা। তবু জানি কিছুই বোঝাতে পারিনি। প্রথম বার জগন্নাথ দর্শনের পর চৈতন্য যখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন, তখন সেখানে তাঁর কাছের মানুষ কেউ ছিলেন না। তাঁর মূর্ছিত শরীরের ওপর প্রথম যাঁর নজর পড়ল, তিনি দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক এবং মনে-প্রাণে অদ্বৈতবাদী সার্বভৌম ভট্টাচার্য। নবদ্বীপ থেকে বহুকাল আগে এসে তিনি এখানে বসতি করেছেন এবং ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করেন তিনি। সন্ন্যাসীকে মূর্ছিত দেখে তিনি তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন মহাপ্রভুকে। প্রথমে তিনি মহাপ্রভুকে অদ্বৈত-বেদান্ত বোঝানোর বিফল চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে এই তরুণ সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব তাঁকে মেনে নিতে হয় এবং তিনি সর্বথা মহাপ্রভুর ভাব স্বীকার করে নেন। শেষকালে সমস্ত বিদ্যার অহংকার ত্যাগ করে তিনি লেখেন—আমি সারা জীবন ন্যায়-মীমাংসা, সাংখ্য-যোগ-বেদান্ত নিয়ে অনেক তর্কযুক্তি সাজিয়েছি, কিন্তু সবার ওপরে, সবচেয়ে বেশি শক্তি দেখতে পেলাম সেই কৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনির মধ্যে—কিন্তু স্ফুরণ-মাধুরী-ধারা কাচন নন্দনসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি।

প্রথমবার পুরীতে যাবার পর বেশি দিন মহাপ্রভু সেখানে থাকেননি। তিনি দক্ষিণ ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন। মুখে বলেছিলেন—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপকে খোঁজার জন্য দক্ষিণ-দেশে যাবেন তিনি, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য বোধহয় অন্য কিছু। হয়তো চিরাচরিত সন্ন্যাসীর মধু-মন্ত্র কানে বেজেছিল একবার—চলতে থাকো, চলতে থাকো, চলতে-চলতেই অমৃত-মধুর সন্ধান পাবে—চরন্ বৈ মধু বিন্দেত। হয়তো এটাও একটা খুব বড়ো কারণ—যেহেতু শাস্ত্রকারদের প্রবাদ আছে যে, দাক্ষিণাত্যেই ভক্তিধর্মের উদ্ভবস্থান। সুতরাং আপন অনুরাগময়ী ভক্তির তাত্ত্বিক অবস্থান বুঝে নিতে হয়তো দক্ষিণ-গমন একবার প্রত্যাশিত ছিল মহাপ্রভুর কাছে। আর বোধহয়

ইচ্ছে ছিল একাকী হবার। নবদ্বীপে যা ঘটেছে, পুরীতেও সেই অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁকে সদা সর্বদা ঘিরে রাখেন, তাঁদের ভক্তির বাঁধন, প্রভুর জন্য তাঁদের নিরন্তর দুশ্চিন্তার আন্তরিকতা প্রভু এড়াতে পারেন না। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে তিনি সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, ফাল্গুন-চৈত্র পুরীতেই কাটল, বৈশাখের প্রথমেই ভক্তদের কাছে প্রকাশ করলেন যে, তিনি দক্ষিণে যাবেন এবং একটু হুংকার দিয়েই বললেন—'একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব।'

কথাটা শুনে ভক্তদের মাথায় বাজ পড়ল। নিত্যানন্দ পাল্টা হুমকি দিয়ে বললেন—'ঐছে কৈছে হয়?' তোমার একা যাওয়া হবে না। অন্তত দুই-এক জন যাক তোমার সঙ্গে, নইলে আমিই যাই—দক্ষিণ-দেশের আমি সব জায়গা চিনি। কিন্তু চৈতন্য এবার মানলেন না কারও কথা। ভক্তদের অন্তরঙ্গতা তিনি বোঝেন—কেউ তাঁর কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যে তিনি দিনে তিন বার স্নান করবেন প্রখর শীতেও, একটুও ভালো-মন্দ খাবেন না, আবার কেউ তাঁর ওপরে শিক্ষাদণ্ডও ধরে আছেন, বলছেন—এটা কোরো না, ওটা কোরো না। এত ভালোবাসায় চৈতন্যের মন আঁকুপাঁকু করছে। তিনি একা যেতে চান। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল—কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ-যুবক মহাপ্রভুর জন্য কৌপীন, বহির্বাস আর জলপাত্র বয়ে যাবেন তাঁর সঙ্গে, কেননা এটাও ঠিক যে মাঝে মাঝেই তাঁর জ্ঞান থাকে না। সঙ্গে একজন অন্তত না থাকলে প্রভুর জীবনহানির আশঙ্কা থেকে যায়।

মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের বিবরণ এখানে দেব না, কেননা সে বিবরণ বিশদ, বিচিত্র এবং মধুর। এখানে একটা কথাই শুধু বলব যে—প্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের পরম প্রাপ্তি হলেন রামানন্দ রায়। রামানন্দ শূদ্র জাতি, রাজসেবা করেন, কিন্তু তাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং প্রেমভক্তির কথা এতটাই প্রচারিত ছিল যে, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো বিদগ্ধ পণ্ডিতও তাঁকে মান্য করতেন। মহাপ্রভুকে তিনিই বলে দিয়েছিলেন যাতে এই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার অবশ্যই হয়। কেননা রামানন্দের মতো প্রেমী ভক্তের সঙ্গ পেলে মহাপ্রভুর আনন্দ হবে। রামানন্দ-মিলনে প্রভু এতটাই উৎফুল্ল হয়েছিলেন যে, রামানন্দ তাঁকে আরও দিন দশেক তাঁর বাড়িতে থেকে যেতে বললে, প্রভু বলেছিলেন—

দশ দিনের কা কথা যাবত আমি জীব।
তাবত তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব।।

নীলাচলে তুমি আমি থাকিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে।।

চৈতন্যদেব আরও সুদূর দক্ষিণে যাত্রা করার পরেই রামানন্দ নীলাচলে যাবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ব্যক্তি হিসেবে রামানন্দ যেমন চৈতন্য-জীবনে পরম প্রাপ্তি, তেমনই বড় প্রাপ্তি দুখানি গ্রন্থ—এক, ব্রহ্মসংহিতা; দুই, লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত। এর আগে বঙ্গদেশে এই দুই গ্রন্থের তেমন পরিচয় জানা ছিল না। এই দুটি গ্রন্থ চৈতন্যের প্রেমভক্তি আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। মহাপ্রভু এই দুটি রসগ্রন্থ এনে রামানন্দের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, কেননা এই গ্রন্থ আস্বাদনের যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে রামানন্দ ছাড়া আর কাউকে তিনি ভাবতে পারেননি। শুধু রামানন্দের জন্য সুদীর্ঘ দক্ষিণ পথ ভ্রমণ করে আবারও তিনি রামানন্দের কাছে ফিরে এসেছিলেন। দক্ষিণাদেশের রাজকার্য ছেড়ে আসতে রামানন্দের কিছু সময় লেগেছিল। তাছাড়া এক রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজ্যে প্রবেশ করতেও সেকালে অনুমতি লাগত। ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর নাম শোনামাত্রই অনুমতি-পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন রামানন্দের কাছে। রামানন্দ চৈতন্যদেবকে আগে পাঠিয়ে দিলেন নীলাচলে, শেষে সর্বত্যাগ করে চলে এলেন মহাপ্রভুর কাছে।

অনেক ঘটনা ঘটেছে এর পরে। দুই বৎসর পুরীতে থাকার পর চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাবার মন করেছেন এবং বৃন্দাবন গেছেন গৌড়দেশ হয়ে। সার্বভৌমকে প্রভু বলেছিলেন—গৌড়দেশে আমার দুটি আশ্রয় আছে—আমার মা এবং মা-গঙ্গা—গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়। জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়। সবার সঙ্গেই দেখা হয়েছিল গৌড়দেশে, কিন্তু সেবারেও বৃন্দাবন যাওয়া হয়নি তাঁর, গেছেন তার পরের বছর। এই সমস্ত গমনাগমনের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হল, পাঁচজন বিরাট ব্যক্তিত্বের ওপর মহাপ্রভুর প্রসন্নতা। রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস—এই পাঁচ জনের সঙ্গে পরে জুটেছিলেন শ্রীজীব—সব মিলে বৃন্দাবনের এই ছয় গোস্বামী মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ ভক্তি আন্দোলনের তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছিলেন।

বার বার এই কথাই মনে হয়—চৈতন্যদেব নিজে এক ছত্র লিখলেন না। কিন্তু মর্মে মর্মে কৃষ্ণভক্তির যে রসগ্রন্থি তাঁর অন্তরের মধ্যে পাকিয়ে বসেছিল, কী ভীষণ ব্যক্তিত্ব থাকলে সেই রসগ্রন্থি দিয়ে অন্য সমস্ত মানুষকে একত্র বেঁধে ফেলা যায়।

সেই ব্যক্তিত্ব শৌর্য-বীর্য, ধনুক-বাণ দিয়ে তৈরি হয়নি, তাঁর আপন অন্তরজাত প্রেমেই সে ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছিল। চব্বিশ বছরে তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন, সন্ন্যাসের পর ছয় বৎসর শুধু এই গমনাগমন চলেছে—নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ, বৃন্দাবন। এই ছয় বৎসরের প্রচারেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে তাঁর প্রবর্তিত ভক্তির স্তম্ভ স্থাপিত হয়ে গেছে—বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামী আর গৌড়ে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীনিবাস। পুরীতে রইলেন তিনি নিজে।

শেষ আঠারো বছরের মধ্যেও শেষ বারো বছরের কথা আমি লিখে শেষ করতে পারব না। প্রভুর শেষ লীলার কথা মনে হলেই আমার সেই ধ্রুবপদ মনে আসে—'প্রভু কহে পড় শ্লোক।' শেষ জীবন-সঙ্গী রামানন্দ রায় আর স্বরূপ দামোদর—তাঁদের কাছে প্রভুর দিনরাত দিব্যোন্মাদী বিরহ-বিলাপগুলি আমি কাকে বোঝাব, কেমন করেই বা বোঝাব! বিদ্বান মানুষ 'ফিলসফি' বোঝেন, বোঝান—চৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের সঙ্গে বিভিন্ন বৈষ্ণব আচার্যের মতবাদ প্রকট করেন—কিন্তু যেটা রসতত্ত্বের জায়গা সেখানে চৈতন্যের অখণ্ড বিলাপরাশির তাৎপর্য কেমন করে বোঝাব আমি! কেমন করে বোঝাব—একান্ত মধুর শৃঙ্গারের মধ্যেও দাস্যভাব কেমন করে আলোড়িত করে মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকাকে অথবা মহাপ্রভুকে। অন্যজনে বলেছেন—এগুলি মহাপ্রভুর বিকার, কেউ বা মৃগীরোগ বলেও বুঝিয়েছেন এইসব ভাব-বিকারকে। তবু দেখেছি, শিক্ষিত মানুষের চেয়েও অশিক্ষিত দীন-হীন মানুষই বোধহয় তাঁকে অনেক বেশি বোঝেন। তাঁর অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব বোঝেন না, রসরাজ-মহাভাবের স্বরূপ বোঝেন না, কিন্তু একত্রে প্রভুর কীর্তনরঙ্গ বোঝেন, অথবা একান্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় মহাপ্রভুর ভাববিলাসটুকু বুঝি তাঁরা মনের মধ্যে অনুভব করেন।

আসল কথা কী, মহাপ্রভুর সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকাটা আপনাদের পক্ষে বোঝা অনেক সহজ, কেননা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে এমন উদার আন্দোলন সাধারণের মধ্যে যেভাবে আস্থা জাগায়, সেটা ইতিহাস এবং সমাজনীতির ছকে সুন্দর ব্যাখ্যা করা যায়। আমার মতে—মহাপ্রভুর ভাবিত দর্শন ব্যাখ্যা করাও সহজ, কেননা পুরাতন বৈষ্ণব দর্শন যত—দ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এগুলির পরম্পরায় মহাপ্রভুর দর্শন ব্যাখ্যা করা যায়—যদিও সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব এবং ক্ষমতা অনেক বেশি। কেননা সেকালে নিজস্ব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদ্‌গীতা-র ওপরে টীকা লিখতে হত। মহাপ্রভু নিজেও তা

লেখেননি, অন্য পার্ষদ ভক্তদের ওপরেও তাঁর এই নির্দেশ ছিল না। ভাগবত পুরাণ-কেই তিনি গায়ত্রীর ভাষ্য বলে মনে করতেন, অতএব শুধু সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবৎকালে তিনি প্রস্থান-ত্রয়ের টীকা-ভাষ্য রচনার অসরস চেষ্টা করেননি। কিন্তু তাতে তাঁর দর্শন বোঝার অন্তরায় হয় না। তাঁর পার্ষদদের লেখা থেকেই তাঁর দার্শনিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু সব কিছুর ওপরে বুঝি চৈতন্যের রসতত্ত্বের ভাবনা। চিরন্তন ঐতিহ্যবাহী রসশাস্ত্র তাঁর আমলে পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং সেই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল সাধারণ মানুষের প্রাণের মধ্যে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—ইত্যাদি যেসব রস মানুষের স্বভাব এবং বৃত্তির মধ্যে আছে, সেই রসকে কৃষ্ণভক্তির কেন্দ্রে স্থাপনা করে মহাপ্রভু মানুষের শাশ্বত রসবৃত্তিগুলিকেই এমনভাবে জাগ্রত করে দিয়েছেন, যাতে করে সাধারণ মানুষও পরম ঈশ্বরকে ভালোবাসার গণ্ডির মধ্যে পেয়ে গেছে। মহাপ্রভুর এই রসতাত্ত্বিক জাগরণ যতটাই কঠিন, ততটাই সহজ—বিশ্বাসে তা সহজ, তর্কে বহু দূর। এই রস-ভাব বোঝার জন্য সমমনস্ক ভাবুক-রসিক দরকার। মহাপ্রভুর যেমন রামানন্দ রায়, স্বরূপ-দামোদর, তেমনই পরবর্তীকালেও যুগে যুগে এই সমমনস্কের পরম্পরা আছে। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর পদে লিখেছিলেন—

সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস।।

অর্থাৎ যেমন ভাব যে বুঝতে গেলে তেমন সঙ্গী চাই। আমি বলেছিলাম—কেমন করে বোঝাব—মহাপ্রভুর সেই অন্ত্যলীলার রহস্যের কথা। কখনও নৃত্য, কখনও গীত, কখনও অশ্রু-কম্প-পুলকে মাটিতে পড়ে যাওয়া, আর কখনও—'স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি গীতগোবিন্দের গীতি/শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ।' এই তাঁর অন্ত্যলীলা। তাঁর তিরোভাব বা তথাকথিত অন্তর্ধান নিয়ে আমার এতটুকু ভাবনা নেই। কেউ বলেন—পান্ডারা তাঁকে মেরে ফেলেছে, কেউ জয়ানন্দের দোহাই দিয়ে বলেন—তাঁর সেপটিক হয়ে গিয়েছিল, কেউ বলেন—তিনি জগন্নাথে বিলীন হয়ে গেছেন। এই জায়গাটা গবেষণা আর তর্কে, প্রতিযুক্তিতে এতই জটিল হয়ে গেছে যে, আর বিচার করতেও ভালো লাগে না। আর তাঁর জীবনের শিক্ষা থেকে ভালো বলে যেটা বুঝেছিলাম, সেটাও এখন বিলুপ্তপ্রায়। খোল-করতাল-যোগে যে সংকীর্তন-ধ্বনি এককালে আমাদের মাতিয়ে রাখত, সেই কীর্তন ব্যাপারটাই তো নষ্ট হয়ে গেছে। যাঁরা এককালে রামদাস বাবাজির কীর্তন শুনেছেন, তাঁর পরম্পরায়

হরিদাস-নির্যাণ শ্রবণ করেছেন, তাঁরা এখন কোথায়? এমনকী এদিনের নন্দকিশোর দাসের কীর্তন-ঘরানাও লুপ্ত হয়ে গেল। কী করে আর মহাপ্রভুর অন্ত্যজীবনের ভাব প্রকাশ করব ভাষায়!

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কথা বলার শেষে আমার নিজের অনুভবের কথা কিছু বলতেই হবে। আপনারা বলবেন—এ তো বেশ মজার কথা, আপনি এক মহাজীবনের সত্য উদ্‌ঘাটন করার প্রতিজ্ঞা করে শেষে নিজের কথা গাইতে আরম্ভ করলেন? সত্যিই দিনকাল বড়ো খারাপ পড়েছে, সুযোগ পেলেই মানুষ এখন নিজের কাঁসি-করতাল বাজায়। আমি বলি—দেখুন, আমি একটু অহংকারী মানুষই বটে, আমি অধিকারী-ভেদে বিশ্বাস করি। চৈতন্যের কথা বলার অধিকারটুকু আমার আছে কিনা সেটা আগে বিচার করে দেখুন, তবে তো আমার মুখে চৈতন্য-কথার সামান্য ফলশ্রুতি ঘটতে পারে। আপনারা বলবেন—এই তো সেই পুরাতন সংস্কার গর্‌গর্‌ করছে তোমার ভিতরে। এই তো সেই গোষ্ঠীতন্ত্র, এই তো সেই সাম্প্রদায়িকতা—নইলে চৈতন্যের মতো সর্বজনীন দিব্য পুরুষের কথা শুনব, সেখানে আবার অধিকারীর প্রশ্ন আসে কেন? চৈতন্য তো সবার জন্য, তাঁর ধর্মমতও সর্বসাধারণের উপজীবন, তবে কেন এই অধিকারী-ভেদ, কেন এই সংরক্ষণশীলতা?

এসব কথায় আমার দুটি কথা থাক। আমি বলি—দেখুন, বামপন্থী মার্কসবাদও তো সবার জন্য। কিন্তু মার্কস্-এঙ্গেলস পড়েই বা কজন, আর পড়তে পারেই বা কজন! কিন্তু অনেক বামপন্থী নেতাকেই আমি উজ্জীবিত হতে দেখেছি তত্ত্ববেত্তা মার্কসিস্টের সঙ্গলাভের মাধ্যমে। আবার কাউকে দেখেছি—তিনি তেমন তত্ত্ববাদী নন, মার্কস-এঙ্গেলস তেমন পড়েননি, কিন্তু ছাত্রাবস্থা থেকেই শুনে-শুনে, অনুভব করে, আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়ে, অতঃপর খানিকটা পড়াশুনো করে, অবশেষে মহত্তর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে পুরোপুরি বামপন্থী নেতা হয়ে গেলেন। বাস্তব সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে মার্কস-এঙ্গেলসের গ্রন্থগুলি যত উপকারী, এমনকী তত্ত্ববেত্তা তাত্ত্বিক নেতাও না যত উপকারী, তার থেকে অনেক বেশি উপযোগী কিন্তু ওই তৃণমূল স্তর থেকে উঠে-আসা অভিজ্ঞ, মানুষের দুঃখে সমদুঃখী নেতা।

ব্যাপারটা আমার ক্ষেত্রেও একই রকম। চৈতন্য-জীবনের আকর গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত-এ বলা হয়েছে—'এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র।।' অনেকেই জানেন—ভাগবত পুরাণ চৈতন্যপন্থীর কাছে বেদ,

ঠিক যেমন বামপন্থীর কাছে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। কিন্তু ভাগবত সকলে পড়েন না, পড়তে পারেনও না। তাহলে বিকল্প কী? বিকল্প—ভক্তিরসপাত্র, অর্থাৎ সেই রসের রসিক। ভক্তিরস যিনি বোঝেন, ভক্তি ব্যাপারটা তাঁর কাছে আর শুধুমাত্র নিয়ম-আচার-ব্রত নয়, ভক্তি তাঁর কাছে রস হয়ে উঠেছে। বিদ্যা, ধর্ম, সমাজনীতি এবং রাজনীতির আদর্শ বিশেষ পাত্র, বন্ধু, গুরুর মনন এবং উপদেশ-পরামর্শে রসায়িত হয়ে ওঠে। আমার মনের মধ্যে, আমার আশৈশব সমস্ত কর্মের মধ্যে এই রসায়ন ঘটেছে কত বার, কত রকম ভাবে, তা এই স্বল্পপরিসরে তেমন করে বোঝানো যাবে না। কিন্তু একটু-আধটু সেকথা না বললে আপনারা বুঝতেও পারবেন না যে, কেমন করে আমার অধিকার জন্মেছে চৈতন্যের জীবন নিয়ে কথা বলার।

আমার পিতাঠাকুর পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং সেই সূত্রেই হাজারো চৈতন্যপন্থী মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। পিতাঠাকুর নিজেও মানুষটা ছিলেন অদ্ভুত। সে-যুগে সাহেব-সুবো মাস্টারদের কাছে ইংরেজির সাম্মানিক স্নাতকতা লাভ করেও তিনি প্রথম যৌবনটা কাটিয়ে দিলেন গুরুসেবা করে; তারপর গ্রামের ইস্কুলে হেডমাস্টারি করে জীবিকা নির্বাহ করলেন জীবনের উত্তরকাল পর্যন্ত। গৃহস্থ যদি সন্ন্যাসী হয়, তাঁর ভাব ছিল সেইরকম। সকালবেলায় ঠাকুর ঘরে নিত্যক্রিয়া চলার কালে তাঁর মুখে অজস্র সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি শুনতে পেতাম, যার মধ্যে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য রঘুনাথ দাস অথবা রূপ গোস্বামীর আর্তি ভেসে আসত কানে—স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্—'উৎকলপতি গজপতি-প্রতি, কৃপামৃতবর্ষী গৌরহরি। আর কি আপন, কমলচরণ, দেখাবেন মোরে করুণা করি?' সারাদিন ইস্কুল, ভাই, জ্ঞাতি—শরিকদের ছেলেদের ইংরেজি পড়ানো চলত রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত, তারপর তাঁর হাতে উঠত ভাগবত-শাস্ত্র। কত রাত অবধি তাঁর পড়াশুনো চলত—ছোটোবেলায় তার ঠাহর পাইনি।

একথা অনস্বীকার্য যে, এই কঠিন পরিবেশের মধ্যে আমার প্রবেশ ছিল না; কিন্তু পূর্ববঙ্গের পাবনা থেকে কলকাতায় এসে স্থিত হবার পর আমার সাত-আট বছর বয়স থেকে আমি প্রায়ই পিতাঠাকুরের সঙ্গ ছাড়তুম না। এর অন্যতম কারণ ছিল—মহাপ্রসাদ। বিভিন্ন মন্দির, আখড়া এবং গৃহস্থবাড়িতে তাঁর সঙ্গে যেতাম। দিন-রাত, এমনকী দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সংকীর্তন চলত, আর সেই তখন থেকেই বিধি-নিয়ম-ক্লিষ্টা ভক্তিবৃত্তি আমার কাছে একটু একটু রসায়িত হয়ে

উঠতে লাগল। মনে আছে—এক আশ্রমে একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে প্রায় জনা কুড়ি লোক ইধার-উধার ব্যাঁকা-ত্যাঁড়া হয়ে শুয়ে আছি, তার মধ্যে ঘুমোচ্ছিও। তেমনই এক রাতের গভীরে বেহাগের সুরে নাম-কীর্তন ভেসে এল কানে। তখনই উঠে গিয়ে কীর্তনে যোগ দিলাম। দেখলাম—পিতাঠাকুর বসে আছেন কীর্তনমঞ্চের বাইরে। তিনি কোনোদিন কীর্তন গাইতে পারতেন না, কিন্তু শুনতেন এমন নিরসলভাবে, সেটা অদ্ভুত লাগত। আর শুনবেনই না কেন! ভালো গাইয়েদের মুখে গভীর রাতের মৃদু মৃদঙ্গ-করতালের সঙ্গতে নিছক কৃষ্ণনামও যে কত মধুর হয়ে উঠতে পারে, তা যারা উপভোগ করেননি, তাঁরা বুঝবেন কী করে! উত্তর কলকাতায় ১ নং মোহনবাগান লেনে গোবিন্দদাস মোহান্তের আশ্রমের এই দিনগুলি আমাকে চৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনামাধুর্য বুঝতে শিখিয়েছে। গোবিন্দদাস মোহান্তজি আজ স্বার্থপীড়িত মানুষের হাতে বিতাড়িত হয়ে অন্যত্র বাস করছেন। তাঁর আশ্রমটি এখনও আছে, কিন্তু সেই নবরাত্রি কীর্তনের আসর এখন আর বসে না।

পিতাঠাকুরের সঙ্গে, তাঁরই আত্মীয়তার আর এক প্রৌঢ়া জননীর সঙ্গে পরিচয় হল—সকলেই তাঁকে গোপালের মা বলে ডাকে। আগরপাড়ায় তাঁর গর্ভজাত সন্তান সুধীন-শিবনের নামে তাঁকে কেউ চিনত না, তিনি শুধুই গোপালের মা। তাঁর একটি বড়ো-সড়ো গোপালমূর্তি ছিল; যেখানেই তিনি যেতেন তাঁর কোলে গোপাল এবং হাতে গোপাল-সেবার সরঞ্জাম চলত সাথে-সাথে। আমার জীবনে অমন মধুর-চিকন গোপালমূর্তি আমি চোখে দেখিনি এবং যেটি আরও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতেন 'তাঁর মায়ের' সেবায়। পিতাঠাকুর বলতেন—তাঁর যশোমতী-ভাব। আমার দিক থেকে গোপালের মায়ের কদর আরও বেশি ছিল এই কারণে যে মহাপ্রভুর সেবায় কীর্তনান্তে খিচুড়ি, ডাল-ভাত-লাবড়াই ছিল প্রধান প্রসাদ, কিন্তু ব্রজ-রাজকি নন্দন নীলমণি এসব খান না। তিনি ক্ষীর, সর, ছানা-ননী খেয়ে বড়ো হয়েছেন বলে গোপালের মা যেখানে তাঁর বিগ্রহ নিয়ে আসতেন, সেখানেই রীতিমতো গব্য আয়োজন ঘটত, গোপালের মাও বালকদের অতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন।

তখন খাওয়া ছাড়া কিছু বুঝিনি, কিন্তু একটু বয়স হতে দেখেছি এবং বুঝেছি যে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মের বহিরঙ্গে আছে সর্বাশ্লেষী নামসংকীর্তন আর অন্তরঙ্গে আছে এই সেবাবৃত্তির আবেশ, যা এক-একটি মানুষকে মধুর-মধুরতর করে তুলেছে। নবদ্বীপে আমার সখা বুলবুল গোস্বামীর বাড়িতে তাঁর একান্ত সেবা ছিল। ঝুলনে, রাসে তাঁর রাধারানী আর অষ্টসখীর সঙ্গে নটরাজ কৃষ্ণের

লীলাকীর্তনে রাতের পর রাত অতিবাহিত হয়েছে আমার। তা চৈতন্য প্রবর্তিত রাগানুগা ভক্তির মধুর আস্বাদন জাগাত আমার মনে। পিতাঠাকুরের আর এক আশ্রিত ছিলেন বেলঘরিয়ার যতীন দাস নগর কলোনির চন্দ্রনাথ ঘোষ। জাতিতে গোয়ালা, বাড়িতে উৎসব হলেই সারা রাত জেগে দই ভরে নিয়ে আসতেন বাঁকে করে, হেঁটে। এই এক অদ্ভুত মানুষ—এঁর অভ্যেস ছিল ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে তিনি পাড়ায় পাড়ায় কীর্তন করে টহল দিতেন। শীতকালের প্রখর হিমের সময় পিতাঠাকুর যদি প্রশ্রয় দিয়ে বলতেন—এই শীতে আর বাইরে যেও না, চন্দ্রনাথ, তিনি বলতেন—গুরুর আদেশ, সকলে তো সময় পায় না, তাই সকাল সকাল সবাইকে নাম শুনিয়ে আসি। উৎসবের বাজার করা থেকে আরম্ভ করে দু-মনি কড়াই মাজার কাজ সকলের ভোজনান্তে পাত-কুড়োনোর কাজটি তিনি অন্য কাউকে করতে দিতেন না এবং করলে সেই মানুষটির সঙ্গে হাতাহাতি করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—এই আমার ভজন-সাধন। সন্ধ্যাবেলায় ভাগবত পাঠের আসরে সারা দিনের পরিশ্রমের পর তিনি বসে বসেই ঘুমিয়ে নিতেন, কিন্তু তাঁর রাত্রির কাজ শেষ হতে হতে বারোটা-একটা বেজে যেত, কিন্তু তাই বলে ভোর চারটেয় ওঠাটা বন্ধ হত না।

একদিকে এইসব সেবাব্রত আবিষ্ট সাধকদের দেখছি, আর একদিকে আছেন ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, বরাহনগরের কেদার পণ্ডিতমশাই। বিভিন্ন স্থানে এঁরা ভাগবত ইত্যাদি বৈষ্ণব-শাস্ত্র পাঠ করতেন। রাধাগোবিন্দ নাথ মশায় প্রধানত চৈতন্যলীলায় আবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মচারীজি এবং কেদার পণ্ডিতমশাই যে সম্মোহনী বাগ্মিতায় ভাগবত লীলা পরিবেশন করতেন, আমি সারা জীবনে তার তুলনা খুঁজে পাইনি। আর তাঁদের শেষ জীবনে দেখেছি দুই নন্দকিশোরকে। এক নন্দকিশোর কীর্তনীয়া। দ্বিতীয় নন্দকিশোর সত্তর বছর বয়সে ন্যায়শাস্ত্র শিখে যুক্তিতর্কে শান দিয়ে মহাপ্রভু চৈতন্যের ভক্তিরস স্থাপন করতেন শ্যামবাজারে।

তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত পাঠ করতে গিয়ে—প্রতিদিন একটি শ্লোকের কলি উচ্চারণ করতেন—কুঞ্জে কুঞ্জে বিহরতি ন কেনাপি সংলক্ষ্যতে সৌ—সেই একক শ্লোকপংক্তির ব্যাখ্যা চলত মাসের পর মাস—ওদিকে কেদার পণ্ডিতমশাই ভবানীপুরে পূর্ণ থিয়েটারের পিছনের একটি বাড়িতে ভাগবতের অবধূত শিক্ষা পাঠ করতেন বর্ষভোগ্য সপ্তাহ। আমি বলি—মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার গূঢ়

রহস্য যদি বুঝতে হয়, তবে এই সব ভক্তিরসপাত্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। দেখা হয়েওছে কিন্তু

সে-সব সঙ্গীর সঙ্গ যে কৈল বিলাস।
সে-সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস।।

আর সেই সব 'মুহুরহো' ভাবুক-রসিকদের সঙ্গহীন আমাকেও যদি আজ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তর্গূঢ় অন্ত্যলীলা-রহস্য বোঝাতে হয় তবে আজই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণ-স্পর্শ করে বসতে হবে ভাগবত-পাঠের বাস্যাসনে—যদি তাঁর কৃপায় তিনি স্ফূর্ত হন আমার মুখে। নইলে এমন ঢঙের প্রবন্ধ লিখে তাঁকে কিছুই প্রকাশ করা যায় না, যাবেও না।

—